শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্তিকা

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭

বর্ষ—২৭ সংখ্যা—১

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

মাতৃবাণী		১
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী		৪
নারীর শিক্ষা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৮
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	১২
প্রসঙ্গত	শ্রীমা	৩৩
পত্রের কথা	শ্রীমা	৩৭
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	৪০
ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে	শ্রীঅরবিন্দ	৫০
বিলাতের ডায়েরীর কয়েক পাতা	এ. বি. পুরাণী	৫৬
কঠিন ডানায় ওড়া	বীরবাহু	৬৪

বর্ত্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	৬০.০০	বার্ষিক	২০০.০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫.০০		১২০.০০
প্রতি সিকি পৃষ্ঠা	২৫.০০		৮০.০০
ভিতরের মলাট	১০০.০০		৩২০.০০
বাহিরের মলাট	১২৫.০০		৪০০.০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম—দেড় টাকা

Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Edited by : NOLINI KANTA GUPTA
Printed by : AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2
PRINTED IN INDIA

ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯৬৭

অন্ধকার যখন গাঢ়তর হয়ে
পৃথিবীর বুক পিষে ধরে,
মানুষের দেহগত মনই যখন একমাত্র প্রদীপ,
তখন রাত্রিতে চোরের মত হবে তার
গোপন পদক্ষেপ,
অলক্ষিতে প্রবেশ করবে সে ঘরের ভিতরে,
কণ্ঠাগত কণ্ঠ এক বলবে কথা,
অন্তর নেনে নেবে তাকে ;
শক্তি এক লুকিয়ে মনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে,
এক ইন্দ্রজাল, মাধুর্য্য এক, জীবনের বন্ধ দুয়ার খুলে ধরবে,
সৌন্দর্য্য বশীভূত করবে প্রতিরোধী জগৎকে,
পৃথিবীকে সহসা অধিকার করবে ঋতম্বর জ্যোতি,
ভগবানের গুপ্ত অভিসার হৃদয়কে
স্বর্গানন্দে অভিসিঞ্চিত করবে,
পৃথিবী অপ্রত্যাশিতভাবে পরিণত হবে দিব্যরূপে।

(সাবিত্রী ১-৪) —শ্রীঅরবিন্দ

মাতৃবাণী

(ছোটদের প্রশ্ন—মায়ের উত্তর)

১

প্রশ্ন : গণিত, ইতিহাস কিংবা বিজ্ঞান এ সব জিনিস তোমাকে পাওয়ার জন্যে কি রকমে সাহায্য করতে পারে ?

উত্তর : এরা সব সাহায্য করতে পারে নানা উপায়ে—

(১) সত্যের আলো গ্রহণ করবার সহ্য করবার সামর্থ্য লাভ করতে হলে দরকার মন-বুদ্ধিকে সবল করা, বৃহৎ করা, উদার করা। এ সব অর্জন করতে হলে উপরোক্ত বিদ্যাগুলি অতি সুন্দর উপায়।

(২) বিজ্ঞান—যদি গভীরভাবে অনুশীলন করা যায়, তোমাকে শিক্ষা দেবে বাহ্য রূপ সব অবাস্তব, তোমাকে নিয়ে যাবে এইভাবে আত্মার সত্যে।

(৩) স্থূল প্রকৃতির যাবতীয় রূপ ও গতি অনুশীলন করলে তুমি বিশ্বজননীর সংস্পর্শে আসবে, এরকমে তুমি আমারও বেশি কাছে আসবে।

২

প্রশ্ন ধনী হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর যে জিনিস বা যে সব জিনিস প্রয়োজন তার অধিকারী হওয়া অর্থ ধনী হওয়া। ধন হতে পারে স্থূল ও জড়বস্তু নিয়ে, ধন হতে পারে আন্তর গুণের, ধন হতে পারে মতিবুদ্ধির, আর ধন হতে পারে অধ্যাত্মের।

৩

প্রশ্ন : আমার কি আধ্যাত্মিক সিদ্ধি হবে ?

উত্তর : সকল মানুষেরই আধ্যাত্মিক সিদ্ধি আছে—কাছে হোক দূর হোক, প্রত্যেকের আপন আপন সংকল্প অনুসারে, তবে দরকার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

আর এক বছর পার হয়ে গেল, পিছনে রেখে গেল তার শিক্ষার ভার—কতক কঠিন কতক বেদনাকর।

এখন নূতন বছর আরম্ভ হ'ল, সে নিয়ে এসেছে প্রগতির সিদ্ধির সব সম্ভাবনা।

কিন্তু এই সব সম্ভাবনার পূর্ণ সুযোগ নিতে হ'লে পূর্বতন শিক্ষা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

সবচেয়ে প্রধান হ'ল এই কথা জানা যে সকল দুর্যোগই হ'ল অচেতনার ফল যদিও বাহ্যতঃ সে সকলের মুখ্য কারণ হ'ল একটা শৃঙ্খলাবিরোধী ভাব, শৃঙ্খলার প্রতি অবজ্ঞা।

আমাদের উপর ভার এখন প্রমাণ করার একটা নিয়মিত সুশৃঙ্খল চেষ্টার সহায়ে যে আমরা ঐকান্তিকভাবেই আকাঙ্ক্ষা করি অধিকতর সচেতন ও সত্যতর জীবন।

১৬।১২।৬৬

তারা জানে কি করা উচিত।

তারা জানে কি সকলে তা করা উচিত।

তারা জানে কি করা উচিত নয়।

তারা সব জানে।

সকল উপকরণের মধ্যে মনের আত্মগরিমাই হ'ল ভাগবত করুণার কাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রতিকূল।

১৬।১১।৬৬

খ্রীষ্টের এই নতুন জন্মোৎসব আমাদের জন্য হয় যেন একটা উর্ধ্বতর নূতন আলোকের আগমনী। ২৫।১২।৬৬

ভগবানের কাছে সর্বদাই যথা ইচ্ছা আমাদের প্রস্তাব উপস্থিত করতে পারি কিন্তু পরিশেষে একমাত্র তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

পূর্ণতা হ'ল আমাদের উর্ধ্বতন আস্পৃহা নিয়ে যা কিছু হয়ে উঠতে চাই।

৯।১০।৬৬

তুমি জান, সত্যকার ভালবাসা কি?

সত্যকার ভালবাসা শুধু একই। ভগবানের কাছ থেকে ভালবাসা, মানুষী জীবের মধ্যে যা পরিণত হয় ভগবানের প্রতি ভালবাসা।

বলা যেতে পারে ভগবানের প্রকৃতিই হ'ল প্রেম। ১৮।১১।৬৬

আমি সর্ব্বদাই উপরের দিকে তাকাই।

সৌন্দর্য্য, শান্তি, আলো সবই উপরে। তারা নীচে আসবার জন্যে প্রস্তুত। সুতরাং আস্পৃহা রাখবে, উপরের দিকে তাকাবে যাতে পৃথিবীর উপরে এ সকল জিনিস প্রকাশ করে ধরতে পার।

নীচের দিকে তাকাবে না, জগতের যত কুৎসিত জিনিসের দিকে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখ আবার সঙ্গে সঙ্গে যখনই মনটা তোমার খারাপ হয়।

সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির চেতনা, মৃত্যুর পরে শরীরের কি ঘটছে তার জন্য কোন কষ্ট অনুভব করে না, তবে জড় শরীরেও একটা নিজস্ব চেতনা আছে যাকে বলা যায় রূপগত চেতনা—দেহকোষসমষ্টি থেকে বের হয়ে যেতে তার কিছু সময়ের দরকার হয়। তার এই বহির্গমনই হ'ল সমস্ত শরীরের বিগলনের সূত্রপাত: বহির্গমনের পূর্ব্বে শরীরে কি ঘটে সে জন্যে তার একটা বোধ থাকতে পারে, এই কারণেই শেষ ক্রিয়ার জন্য অতিব্যস্ত না হওয়াই ভাল।*

---

* অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী

একাদশ পর্ব্ব

চিরন্তন দিন—অন্তরাত্মার স্বেচ্ছা নির্ব্বাসন—পরমা সিদ্ধি

প্রথম সর্গ

[সাবিত্রী বিজয়িনী—মৃত্যুর মৃত্যু ঘটেছে - মৃত্যু আর নাই—তা পরিবর্ত্তিত হয়ে ফিরে গিয়েছে তার আদি স্বরূপে—ভাগবত সত্তায়—পৃথিবীকে দিয়ে গিয়েছে চিরন্তন জীবন—কোন জগতে কোন চেতনায় এ অসম্ভব ঘটনা ঘটেছে ? এ পর্ব্বে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে—বলা হয়েছে সে বিস্ময় অমৃতময় আনন্দময় জগতের কথা—রূপ যেখানে রূপাতীত ভাগবত সৌন্দর্য্যের বলে]

অপরূপ সূর্য্য এক নীচে দৃষ্টিপাত করে
আনন্দময় গগন থেকে
সর্ব্বসিদ্ধির নীড় যত মৃত্যুহীন সুখসার জগতের পরে ;
শাশ্বতের স্মিতহাস্য তারা ব্যক্ত করে যাদুমন্ত্রে,
ধরে দেয় তার রভসের হৃৎস্পন্দ।
সাবিত্রীকে ঘিরে রয়েছে চিরন্তন দিন,
আদি-অন্ত কালের আলো দেখা দিল
সমস্ত প্রকৃতিকে পরিপ্লুত করল অক্ষয়ের উল্লাসে।
সাবিত্রীর দেহ রোমাঞ্চিত অনন্তের স্পর্শে,
অন্তরাত্মা তার অসীমের উৎসপাশে এসে দাঁড়াল।
অসীমের সীমান্বিত রূপায়ণে নিবাস এখন তার,
চিরকালের জন্যে চিরন্তন এক দৃষ্টির সম্মুখে।
শাশ্বত বহুগুণিত করে ধরেছে তার আত্মনিরীক্ষণ
অফুরন্ত তার বীর্য্য বিলাসকে রূপান্তরিত করেছে
এমন আনন্দে, লীলানগ্ন জীবেরা যা উপভোগ করতে পারে
অজ্ঞাত অতল গর্ভ হতে সঞ্জাত নিত্য নব রূপের মধ্যে।
অজ্ঞাত শিখর হ'তে প্রবাহিত অমর ধারা সকলের মধ্যে,
মৃত্যুজয়ী আবেগ-আপ্লুত হৃদয়-স্পন্দনের মধ্যে
অমলিন মাধুর্য্যের লীলা-প্রসারের মধ্যে।

উন্মুসিত হৃদয়ের, নয়নের সম্মুখে, মৃত্যুহীন
নীলিমা গহন এক নেমে এল, বিস্ময়ের
স্বপ্নপ্রসার মেঘশূন্য আকাশ থেকে
শুভ্র স্বচ্ছ প্রশান্তির তোরণ ধরে ধরে ;
সূর্যের আলো স্পর্শ করে গিয়ে
এমন চোখে অক্লেশে যা সহ্য করে যায়
সহ্য করে যায় পূর্ণালোকরশ্মির তীব্রতা অবধি
সেই চোখ যা দেখে রূপে রূপে অমর অনাবিল ঔজ্জ্বল্য।
গোধূলি আর কুয়াশা সে বাতাস থেকে নির্ব্বাসিত,
এমন ভাস্বর গগনে রাত্রিও অসম্ভব।
বৃহতের বুকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত
দেখা যায় অধ্যাত্মের প্রসার সব,
মহিমায় ভরা জন্ম তাদের।
সৃষ্টি সক্ষম এক শুদ্ধ সুষমা থেকে
সাকার চিন্তা সব বাঁধা রয়েছে সুসম পরিমাপের মধ্যে,
স্বর্গীয় শান্তির একটা স্বচ্ছন্দ তৃপ্তির জন্য।
অসীম এক ইন্দ্রিয়ানুভবের গভীর প্রয়োজনে
নিয়ে সে এসেছে প্রত্যুত্তর
রূপায়ণের প্রয়োজন তার, বিদেহী শিহরণের জন্য
বাসস্থান।
কাল-ধারায় এগিয়ে চলেছে বিশ্বশক্তি,
অন্তরাত্মার বিশালত্ব সব ধরেছে সমন্বয়ের ক্রম,
সুষমার আবর্ত্তনে আবর্ত্তনে যথাপরিমিত স্তরের পর স্তরে,
অন্তরে পোষণ করে রেখেছে বিশ্বগত
বস্তু রভসের মহোৎসব,
তার মধ্যে অফুরন্ত রূপ নিয়েছে
সর্ব্বভূতের চিন্ময় পুরুষ—
সে-সবের পরিকল্পনা দিয়েছেন সেই শিল্পী যিনি তাঁর
স্বপ্ন দিয়ে গড়েছেন লোকাবলি সব :
যাকিছু সৌন্দর্য, যা কিছু অত্যাশ্চর্য্য এখানে
মহাকালের যা কিছু জটিল বৈচিত্র্য
সকলেরই সারবস্তু ও উৎস হ'ল শাশ্বত পুরুষ :
তারা কেহ জড়ের তরল কুয়াশা থেকে নিশ্চিত নয়,

ইঙ্গিতে তারা বুঝিয়ে দেয় তাদের গভীরতা,
খুলে ধরে মহান স্তরে স্তরে তাদের শক্তিসামর্থ্য।
প্রচ্ছন্ন স্বর্গত্রয়ের অধোভাগে
দেখা দিল অনন্ত পৃথিবীসপ্তক তাদের মহিমা নিয়ে,
মৃত্যু আর সৃষ্টি হতে মুক্ত সিদ্ধদের নিবাস,
শোক এখানে কখনও আসে না, কোন বেদনা আসে না,
আত্মহারা অন্বেষু সন্ধান-ব্যস্ত সব জগৎ থেকে,
কোন পরিবর্তন তারা আনে না স্বর্গ-প্রকৃতির
অপরিবর্তনীয় সমতায়,
চিরন্তন প্রশান্তির ওজস্বান ভঙ্গিমায়,
অক্ষয় রত্নসের আপন অঙ্গ-বিন্যাসে।
প্রান্তর সব প্রসারিত যেন ভগবানের
বিশাল শক্তির বিস্তার,
চিন্তা পাখা নেলে উড়ে যায় স্বর্গের
বিপুল স্বস্তির মধ্যে,
ডুবে যায় অনন্তের সুনীল গভীরে।
পৃথ্বী-প্রকৃতি রূপান্তরিত, অনুভব করে শান্তির প্রশ্বাস,
বাতাস বয়ে যায় যেন তৃপ্তির মহাসাগর
অথবা অজ্ঞাত এক অধ্যাত্ম সুখ-শয্যা ;
বিপুল নিস্তব্ধতায় গ্রাস করেছে সকল ধ্বনি,
পূর্ণ আনন্দের কবলে সকল কণ্ঠ হারিয়ে গিয়েছে।
জড় বস্তু অবধি নিয়ে এল নিবিড় চিন্ময় স্পর্শ,
নিখিল শিহরিত একমাত্র ভগবানের আন্তর সান্নিধ্যে,
এ সকল পৃথিবীর নিম্নতমটি পর্য্যন্ত যেন স্বর্গ একখানা ;
সেখানে দিব্যবস্তুদের মহোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যে
পরিণত হয়েছে
পার্থিব দৃশ্যাবলীর দীপ্তি ও সৌন্দর্য্য ;
চিরন্তন গিরিমালা স্তরে স্তরে ভাস্বর হয়ে উঠে গিয়েছে,
তাদের অঙ্গরেখাবলি খোদাই হয়েছে যেন নীল একখানা
পাথরের উপরে,
তারা এঁকে দিয়েছে দীপ্ত মধ্যাহ্ন-আকাশের অঞ্চল-প্রান্ত,
উঠে গিয়েছে তারা মন্দিরের স্তূপীকৃত সোপানাবলির মত,
তাদের ধ্যাননগ্ন শিখরের ওপার হতে

শোনে তারা নীচে সুনীলিম তীর্থযাত্রী জনতার ক্রমআগমনী
শোনে এক মহান কণ্ঠের ক্রম উত্তরণ
যেন কালজয়ী কত সাগরের বিশাল
অভিসার গাথা।
পাহাড়ের বুক থেকে নেবে আসে এক স্রোতার দল,
চলে যায় ফুলের নিঃশ্বাসে সুরভিত শাখা-প্রশাখার পাশ দিয়ে
বেগে ধায় উল্লাসের দ্রুত পদক্ষেপে
যত মাধুর্য্য অতিক্রম করে।
আনন্দের নদ-নদী স্ফুরিত কলস্বনে
চলে দিবা ছন্দভঙ্গে, মধুকণ্ঠে বাসনারাজি তারা
মিশে যায় সহোদরা কত উল্লাসের ঘূর্ণিসঙ্গে,
তারপর, শান্তকণ্ঠ বাণীর ধীরপদে
প্রসারিত হয়ে
স্বপ্নের অনন্ত কত নদীমোহনা বেয়ে বেয়ে
চলে যায় অস্ফুট কানে কানে কথা কয়ে তরল শান্তির জলধি তলে।
ইন্দ্রিয়রিক্ত তীব্রানন্দের তীরে সমাগত,
চিন্তার চিরন্তন স্মৃতির প্রতিমা,
প্রস্তরে খোদিত যেন, আসীন জীবাত্মাদল
স্বপ্নমগ্ন ধ্বনি-স্রোতস্বিনী পারে—
জমাট আনন্দের চিরস্থির ভঙ্গিমা।

শারীর শিক্ষা

শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত

শারীর শিক্ষায় তিনটি ধারার কথা আমরা জানি। প্রথম শরীর হওয়া দরকার সুস্থ, দ্বিতীয় সবল, তৃতীয় সুদক্ষ। প্রথমতঃ সুস্থতা—শরীর হবে রোগমুক্ত অর্থাৎ শরীরের সব যন্ত্রগুলি চলবে নির্ব্বাধে নির্ব্বিঘ্নে—যেমন হৃৎপিণ্ডের বা রক্ত চলাচলের ক্রিয়া, ফুসফুসের বা নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া, পাকস্থলী প্রভৃতির আরণ-সারণ ক্রিয়া। তা ছাড়া শরীরের কোন অঙ্গে যদি কিছু ত্রুটি বা খুঁৎ থাকে, তাকেও সারিয়ে নিতে হবে, কোন অংশের আকারে প্রকারে যদি বৈষম্য বৈকল্য থাকে তবে তা শোধরাতে হবে, সমান ও স্বাভাবিক করে নিতে হবে। এই হেতু বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যায়ান আছে। কোন ডাক্তারের ঔষধেই এ পর্ব্ব সমাধান হয় না, ব্যায়ামীর সাহায্যও প্রয়োজন হয়। তবে আজকাল চিকিৎসকেরা পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যের জন্য আসন প্রাণায়ামের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। শরীর সুস্থ হলে প্রয়োজন তার সবল হওয়া, শক্তি সামর্থ্য অর্জন করা। এর জন্য আমরা আশ্রয় গ্রহণ করি যাকে বলে gymnastics, বিশেষ ব্যায়ামের। শারীর শিক্ষার তৃতীয় পর্ব্ব হ'ল শরীরকে কুশলী সুদক্ষ করা, বলা যেতে পারে এটি হ'ল শারীর সামর্থ্যের বা ক্ষমতার প্রয়োগ। অঙ্গ-সঞ্চালনার চাতুর্য্য সৌশর্য্য যার নাম আমরা দিয়েছি Callisthenics, agility-exercises। 'বড় বড়' খেলাকে (major games ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি) এই পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

এ সব কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আমি বলতে চাই আর এক কথা—একটু গভীরের কথা, শারীর শিক্ষার আর এক পর্ব্ব বা পর্য্যায়ের কথা—তা হ'ল—শরীর কেবল সুস্থ সবল সুদক্ষ নয়, তা হবে আবার সচেতন। শরীরের ক্রিয়াগুলি সাধারণত হয়ে থাকে এবং আমরা করে থাকি আমাদের অজ্ঞাতসারে—যন্ত্রের মত, কলের মত অচেতন-ভাবে। ব্যায়ামের উদ্দেশ্য হবে শরীরকে সকল করে তোলা সজাগভাবে সজ্ঞানে। এই রকম সচেতনভাবে যে অঙ্গক্রিয়া হয় তাতে ক্রিয়াটির উদ্দেশ্য শুধু সফল হয় না, সফল হয় পূর্ণতরভাবে সুষ্ঠুতরভাবে এবং স্বল্পতর সময়ে।

যা বলেছেন যে আমরা দৈনন্দিন কাজের জন্য সিঁড়ি বেয়ে যে ওঠানামা করি—তা সুন্দর ব্যায়ামে পরিণত করা যায়, যদি সে জিনিষটা করি অজ্ঞানে নয়, কলের মত নয়—সজ্ঞানে সচেতন হয়ে—আমি এ কাজ করছি এ বোধ বা জ্ঞান আমার থাকবে এবং পায়েরও জ্ঞান থাকবে যে সে করছে একাজ—এতে পায়ের সুন্দর exercise হয়।

এখন সচেতন হওয়া যায় দুভাবে—সচেতন অর্থ স্ব বা আত্মচেতন। এ আত্ম হতে পারে আমি নিজে। অর্থাৎ আমি যে শুধু কাজ করি তা নয়, যখন কাজ করছি সেই সঙ্গেই আবার আমার জ্ঞান আছে যে আমি করছি। যাই করিনা কেন সঙ্গে সঙ্গে আমি জানি যে সে কাজ করে চলেছি। এ ছাড়া আত্ম হতে পারে যে অঙ্গ কাজ করে তার নিজস্ব চেতনা। সেও সচেতন হয়ে ওঠে যে কাজ হচ্ছে তার মধ্যে। আমি যদি দৌড়ই তখন এ জ্ঞান বা বোধ শুধু নয় যে আমি দৌড়চ্ছি কিন্তু সে অঙ্গ বা যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ কর্মে সংশ্লিষ্ট হয় তারাও তাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়। তাতে ফল বা সাফল্য বহুগুণ বেড়ে যায়। এই রকমে দেহকে সচেতন করে তোলা, তার অঙ্গে অঙ্গে চৈতন্যের দোলা, আলোর স্পন্দন ফুটিয়ে তোলা—বৈজ্ঞানিকের ভাষায় তেজস্ক্রিয় করে তোলা—শারীরচর্চার ব্যায়াম-অনুশীলনের এই হ'ল আসল উদ্দেশ্য, সত্যকার সার্থকতা।

কিন্তু এ অবধি এসেও থেমে যাওয়া চলবে না, আর এক পৈঠায় উঠে দাঁড়াতে হবে। শরীর কেবল যে সচেতন (স্বচেতন) হবে তা নয় তাকে হতে হবে সুচেতন। আমার যে চেতনা, যে চেতনা আশ্রয় করে আমার কর্ম হয় তা আমার নয়, অন্ততঃ একান্ত আমার নয়, তা হ'ল বৃহত্তর, গভীরতর উর্দ্ধতর এক চেতনা। আমার চেতনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়, কাজ করে আর এক চেতনা। এই রকমে আমরা যোগসাধনার পর্যায়ে গিয়ে পড়লাম শারীর-চর্চা অনুসরণ করে।

কারণ আমাদের জানা দরকার শরীর সুস্থ সবল সুদক্ষ হয়ে উঠতে পারে সত্যসত্যই স্থায়ীভাবে এবং পূর্ণভাবে যখন তার চেতনা অর্থাৎ স্ব-চেতনা সুচেতনায় পরিণত হয়।

সু-চেতনা অর্থ সুষ্ঠু চেতনা, সত্য চেতনা। তা আসতে পারে—প্রথমতঃ গভীর থেকে, অন্তরের অন্তর থেকে, এ হল অন্তরাত্মা অন্তঃপুরুষের অন্তর্যামীর চেতনা। একে বলা যায় অন্তশ্চেতনা। তারপর অন্তর থেকে নয় অর্থাৎ প্রধানতঃ অন্তর থেকে নয়, সু-চেতনা আসতে পারে চারিদিক হতে—একটা বৃহত্তর অবকাশ থেকে, আপন অহং গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্ব প্রসার থেকে। একে বলব পরি-চেতনা। সুষ্ঠু চেতনা আবার আসতে পারে উপর থেকে উর্দ্ধ চেতনা রূপে। উর্দ্ধেরও নানা স্তর রয়েছে সর্বোচ্চ চেতনাকে বলা হয় পরা-চেতনা, মাঝখানে আর এক উর্দ্ধ চেতনা যোগ করে দেওয়া যেতে পারে, নাম দেব অধি-চেতনা, সে চেতনা সর্বপ্রথম মনকে ছাড়িয়ে উঠতে শিখেছে।

চেতনার তা হ'লে মোটামুটি এই হ'ল ক্রম বা সোপানাবলী (১) অচেতনা, (২) চেতনা, (৩) সচেতনা, (৪) অন্তশ্চেতনা, (৫) পরিচেতনা, (৬) অধিচেতনা (৭) অতি-চেতনা বা পরা-চেতনা—এ হ'ল আমাদের সপ্তকোষ, সপ্তলোক বা ভুবন, সপ্ত সমুদ্র, অগ্নির সপ্ত জিহ্বা, সূর্যের সপ্তাশ্ব। যে কোন স্তর অধিকার করতে পারে আধারকে এবং আধারের মূল গ্রন্থি "আমাকে"। ফল নির্ভর করবে এই সংযোগ সম্মেলনের ফলে।

সব সু-চেতনার সাধারণ ধর্ম্ম হল আলো ছড়িয়ে, আলো দিয়ে স্নান করান, আধারে একটা শুদ্ধি আনয়ন যার ফলে শরীরও হয়ে ওঠে, শরীরের জড় উপাদান পর্য্যন্ত হয়ে ওঠে পরিস্নাত, পরিশুদ্ধ। শরীরের পক্ষে যে নিম্নতম প্রয়োজন স্বাস্থ্য—তা অর্জন করবার সুষ্ঠুতর উপায় বা ফলপ্রদ ঔষধ দ্বিতীয় আর নাই।

এ রকমে যতই আমরা উর্দ্ধে উঠে চলি, লাভ করি উচ্চতর স্থিতি, চেতনা, চেতনার আলো ততই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ততই শুদ্ধ ও শুভ্র হয়ে ওঠে; তেমনিই আবার যতই গভীরে চলে যাই সেখানেও চেতনা হয়ে ওঠে ক্রমেই নিবিড় ঘনিষ্ঠ সত্তাতর আবেগ ও প্রবেগময়। এই দুই পথই, ভিতরের দিকে এবং উপরের দিকে ক্রমে এক হয়ে চলে, পরিপাকে একত্ব লাভ করে। এই চৈতন্য-সিদ্ধি একটা অপরূপ কায়াসিদ্ধিতে নিয়ে আসে।

আর একটি কথা জানা দরকার—এই যে চেতনা এটা বাহ্য স্মৃতিমাত্র নয়, বিচারক মনের ক্রিয়া নয়, পড়া মুখস্থ করে যে ভাবে মনে রাখি সে মনে রাখা নয়, এ মন হল মনের মন, মূল একটা বোধ, জ্ঞান বা চেতনা। তার্কিক মনে নিজেকে সজাগ রাখা কর্ম্মের বাধাই হয়, সহায় নয়।

আমরা বলে থাকি কাজে ডুবে যাওয়া, মত্ত হওয়া, নিজেকে হারিয়ে ফেলা—এ রকম তন্ময় হয়ে যে কাজ করি তাই হতে পারে সুন্দর নিখুঁৎ। কিন্তু তন্ময় হয়ে যাওয়া অর্থ অচৈতন্য হয়ে পড়া নয়; ঘড়ি চলে ঠিক ঠিক অচেতনভাবে—গাছপালা, নিম্নতর প্রাণীরা পর্য্যন্ত কাজ করে অজ্ঞানে অচেতনভাবেই এবং সুষ্ঠুতরভাবে। মানুষের মধ্যে চেতনা এসে পার্থক্য ঘটিয়েছে আমার আর আমার কাজের মধ্যে—আমি সচেতনভাবে কাজ করতে চাই: তাই কাজটাকে আলাদা করে ধরি—দেখি শুনি। কিন্তু এতেই এসেছে কাজে অসম্পূর্ণতা সন্দেহাকুলতা—এই চেতনা সুচেতনায় পরিণত হয় যখন আবার ফিরে পাই কাজে ও কাজীতে ঐক্য একাত্মতা। সু-চেতনার মধ্যে এই রকমে বিষয় বিষয়ীতে একাত্মতা ঘটেছে সচেতনভাবে। বলি আমার আমি দৌড়ই—আমি, আমার দৌড়ান এবং আমার দৌড়ানর লক্ষ্য—তিনটি একীভূত হয় একটা সামগ্রিক সাত্ত্বিক চেতনায়—আমি জানি আমি দৌড়চ্ছি, শুধু তাই নয় আমিই ঐ দৌড়ান, আমার আমিই লক্ষ্য—এই তিনটি ধারা এক হয়ে পরস্পরে আলিঙ্গন করে রয়েছে। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে এক অনুভূতি উপলব্ধি বলে ব্রহ্ম, ব্রহ্মাও, জীব তিনে এক—তিনটি সূত্রে সংগ্রথিত এক অভিন্ন চেতনা—শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ—তার অর্থ নয় শর আর শর নাই, রয়েছে কেবল তৎ। তা নয়, শর এবং তৎ এক হয়ে এক অদ্বৈত চেতনায় সংযুক্ত সম্মিলিত।

কথাটা বলা প্রয়োজন হ'ল বুঝাবার জন্য যে সচেতন হওয়া অর্থ মন দিয়ে বাহ্য মন দিয়ে সচেতন হওয়া নয়—এটি তৎকালীন প্রয়োজন মাত্র—অর্থাৎ তা চেতন বা সচেতন

মাত্র—সুচেতন নয়। সুচেতনা হ'ল মনের মন দিয়ে চেতন হওয়া এবং তার অর্থ পূর্বে উল্লিখিত একটা পার্থক্যসহ সম্মেলন বা একত্ব—একটা নব বিশিষ্ট অদ্বৈত।

সে যাই হোক আমাদের পক্ষে, সাধারণ মানুষের পক্ষে, এই সিদ্ধি যতই সুদূর পরাহত হোক এর দু একটি ক্রম বা সোপান অন্ততঃ সকলেরই করায়ত্ত। এ পথে সামান্য একটু অগ্রসর হলেও ফল হয় অসামান্য।

আমরা দেখলাম তবে শারীর শিক্ষা কি রকমে হয়ে ওঠে শারীর দীক্ষা।

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

এপ্রিল ২৬, ১৯৫১

শ্রীঅরবিন্দের The Mother ("মা") বইখানি থেকে—"...এমন মিথ্যা ও অলস প্রত্যাশা মন থেকে দূর করো যে ভগবৎ-শক্তি তোমার হয়ে সমর্পণের কাজটাও করে দেবে। তিনি যদিও চান তোমার সমর্পণ, কিন্তু তা বাধ্যতা-মূলক নয় যতদিন পর্যন্ত স্থায়ী অপরিবর্তনীয় রূপান্তর না আসছে, ততদিন পর্যন্ত তুমি প্রতিমুহূর্তে আপন ইচ্ছায় চলতে সম্পূর্ণই স্বাধীন, ভগবানকে তুমি অস্বীকার বা প্রত্যাখানও করতে পারো বা তোমার আত্মদান ফিরিয়েও নিতে পারো, তার আধ্যাত্মিক ফলাফল মেনে নিতে যদি প্রস্তুত থাকো।"

প্রশ্ন : "অপরিবর্তনীয় রূপান্তর" কথাটির কি অর্থ?

উত্তর : তোমার চেতনা যখন এমনই বদ্‌লে গেছে যে তার আবার আগেকার অবস্থাতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব, তারই নাম অপরিবর্তনীয় রূপান্তর। একটা সময় আসে যখন চেতনার পরিবর্তন এমনই সমগ্রভাবে ঘটে যে তুমি আর আগের মতো হতেই পারোনা।

প্রশ্ন : রূপান্তর আসা মানেই কি তা অপরিবর্তনীয় অবস্থা নয়?

উত্তর : রূপান্তর আংশিকও হতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলছেন চেতনার পুরোপুরি বদলের কথা ; সে চেতনা আর আত্মসুখী ও আত্মসুখকামী থাকবেনা, একেবারে পাল্‌টে গিয়ে সম্পূর্ণ ভগবৎসমর্পিত হবে। তিনি আরো স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে প্রথম দিকের সমর্পণ আংশিক মাত্রই হয়ে থাকে, কতক অংশ মাত্র হয় কিন্তু বাকী অংশগুলির তা হয় না। কেবল যখন সমগ্র সত্তা পুরোপুরিভাবে তার সমস্ত ক্রিয়াতে একান্তভাবেই সমর্পিত হয়, তখনই সে অবস্থা হয় অপরিবর্তনীয়। সে তোমার সমগ্র মনোভাবেরই অপরিবর্তনীয় রূপান্তর।

প্রশ্ন : ভাগবতী শক্তি ও দিব্যতেজের মধ্যে কি প্রভেদ?

উত্তর : দিব্যতেজ ভাগবতী শক্তিরই একটি অংশ, তারই অঙ্গস্বরূপ। শ্রীঅরবিন্দ

ভাগবতী শক্তি কথাটি 'চিৎ-তপস্' অর্থাৎ সৃষ্টিময়ী শক্তি ও চেতনার অর্থে ব্যবহার করেন, সুতরাং দিব্যাতেজকে তারই অংশ বলে বুঝতে হবে।

(মা পূর্বোক্ত "মা" বইখানি থেকে আবার পড়লেন), "...অসাড়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকাকে প্রায়ই প্রকৃত সমর্পণ বলে ভুল করা হয়, কিন্তু অমন নিষ্ক্রিয় অবস্থার দ্বারা কখনই কোনো সত্যিকার শক্তিগর্ভ সাফল্য মিলতে পারেনা। নিষ্ক্রিয় স্থূল দেহপ্রকৃতি সহজেই যত তামসিক বা অদিব্য শক্তিপ্রভাবের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। কিন্তু দিব্যশক্তির সার্থক ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন দৃঢ়চিত্তে ও সানন্দে তার সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা ভাবের আনুগত্য।"

প্রশ্ন সানন্দে দৃঢ়চিত্তে সক্রিয় সহযোগিতা ভাবের আনুগত্য কথাটির অর্থ কি?

উত্তর আনন্দ কাকে বলে তা তো জানো? দৃঢ়চিত্ত হওয়া কাকে বলে তাও নিশ্চয় জানো। সহযোগিতা করা কি জিনিস তাও জানো তো? তবে আর কি, ভগবানের আনুগত্য করা অর্থাৎ তাঁকে আত্মনিবেদন করা চাই আনন্দে স্বেচ্ছায় ও যথেষ্ট খুশিভাবে; তা হওয়া চাই তেমনি দৃঢ়মনের ও মজবুত ও সক্রিয়, যেন দুর্বল নিস্তেজ ও হীনবীর্য না হয়। তা ছাড়া তা যেন এমন এলে দেওয়া ভাবের না হয় "আমি তো" সমর্পণ করেই দিয়েছি, জীবনে আর কিছু করবার নেই, এখন কেবল চুপচাপ বসে দেখতে থাকা, সমর্পণের কাজ তো হয়েই গেছে।" তা নয়, সে সমর্পণ যেন সক্রিয় ও সহায়ক হয়, অর্থাৎ তাকে সত্তার রূপান্তরের জন্য বা প্রয়োজনীয় কিছু কাজে সাহায্য করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

(মা আবার ঐ বইখানি থেকে পড়লেন), "তোমার সমর্পণ যেন জড়বৎ কোনো স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মতো বা ভৌতিক যন্ত্রের মতো জিনিস না হয়ে তা এক জীবন্ত প্রাণীরই সমর্পণ হয়।"

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি তোমার ঘড়িটির আনুগত্যের কথা। তুমি ওতে দম দিয়ে দিয়েছ আর ও চলতে শুরু করেছে, কিন্তু এটি সচেতন সহায়ক আনুগত্য হলোনা।

"রূপান্তর হওয়া চাই পূর্ণাঙ্গ, সুতরাং তার বিরোধী সকল কিছুকে তেমনি পূর্ণাঙ্গ ভাবেই প্রত্যাখ্যান করতে হবে।"

এটা তো স্পষ্টই বোঝা যায়। কেবল ইতিবাচক ক্রিয়া নয়, তার সঙ্গে নেতিবাচক ক্রিয়াও থাকা চাই; কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মধ্যে রূপান্তরবিরোধী জিনিস কিছু রয়ে গেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো স্থায়ী রূপান্তর তুমি অর্জন করতে পারোনা। গোলমেলে জিনিস কিছু যদি তোমার মধ্যে থেকে যায়, হয়তো কিছুকাল পর্যন্ত তা এমনই প্রচ্ছন্ন-

ভাবে নীরব থেকে যাবে যে তুমি সেদিকে গ্রাহ্যই করবে না, কিন্তু পরে হঠাৎ একদিন সেটি বেরিয়ে এসে তোমার রূপান্তরের কাজ ভণ্ডুল করে দেবে। তাই কেবল ইতিবাচক আত্মদান হলেই চলবে না, আত্মদানের বিরোধী যা কিছু থাকতে পারে তাকে প্রত্যাখানের জন্য নেতিবাচক ক্রিয়াও চাই। "যেমন আছে তেমনি থাকনা" বলে কোনো কিছুকে ভিতরে পুঁতে রেখে দিলেও চলবে না, কারণ সুযোগ পেলেই তা বেরিয়ে আসবে আর তোমার সব কাজ খারাপ ক'রে দেবে। সত্তার মধ্যে এমন সব অংশ আছে যা এ বিষয়ে খুব দক্ষ; প্রাণসত্তার মধ্যে এমন সব জিনিস আছে যার এ বিষয়ে যথেষ্ট নৈপুণ্য; এগুলি নিঃসাড়ে নীরবে কোনো এক কোণে এমন ভাবে লুকিয়ে থাকে যে তার অস্তিত্ব তুমি জানতেই পারোনা তুমি সেদিকে আদৌ সতর্ক না হয়ে তোমার আত্মদান ও রূপান্তরের দিকটা নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকো, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখ যে "বাক্সতে আঁটা দানবের" মতো তা ডালা খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, আর তার প্রভাবে তুমি তখন যতকিছু বোকামি শুরু করে দাও। যেগুলি এতকাল চেপে থাকাতে তার বিক্রমও হয়ে ওঠে প্রচণ্ড—তারা কেবল সময় সুযোগের অপেক্ষা করছিল, আর তুমি আদৌ এটা প্রত্যাশা করোনি, তাই ঐ সব জিনিসকে ঐভাবে লাফিয়ে উঠতে দেখে তুমি হতাশ হয়ে বলো, "হায়, তাহলে আমার রূপান্তরের জন্য এত চেষ্টার ফল কি হলো?" এর কারণ আর কিছু নয়, ওগুলো তোমার মধ্যে আগের থেকেই ছিল। এমন ভাবেই এগুলি লুকিয়ে থেকে যায় যে আলো ফেলে বিশেষভাবে সন্ধান না করলে তুমি তাকে খুঁজেই পাও না, সে যে রয়েছে তা কক্ষাই করোনা, কিন্তু হঠাৎ একদিন এক মিনিটে তোমার সব পণ্ড ক'রে দেয়।

প্রশ্ন আশ্পৃহার খুব বেশি জোর থাকলেও কি তা হতে পারে?

উত্তর: তথাপি সে আশ্পৃহারও খুব সতর্ক হওয়া দরকার।

আমি এমন অনেককে জানি (অল্প কয়েকজন মাত্র নয়—যারা যোগ করে তাদেরই মধ্যে), তাদের আশ্পৃহা ছিল যথেষ্টই প্রবল এবং তার উপযুক্ত সাড়াও তারা পেয়েছে, কিন্তু সাড়া পাবার পরে প্রতিবারই (সেদিন বা বড় জোর তার পরের দিন) তাদের চেতনার সম্পূর্ণ ওলটপালট হয়ে গিয়ে তাদের আশ্পৃহার ঠিক বিপরীত জিনিস এসে পড়েছে। এমন প্রায় নিত্যই হয়ে থাকে। তার মানে এরা কেবল ইতিবাচক দিকটাকে নিয়েই অনুশীলন করেছে; আশ্পৃহার সাধনায় অগ্রসর হয়ে তারা উপরের সাহায্য চেয়েছে, উপরের শক্তিদের সংস্পর্শও পেয়েছে, কিন্তু

কিছু অনুভূতিও পেয়েছে কিন্তু এরা নিজেদের ঘর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করার দিকে মন দেয়নি। ঘর এদের নোংরাই থেকে গেছে, তারপর অনুভূতি যেমনি সরে গেছে, অমনি তার আবর্জনাগুলো ভারি হয়ে উঠেছে।

নিজের ঘর পরিষ্কার করতে কখনই অবহেলা করবেনা। এটা খুবই জরুরী; বাহ্য পরিচ্ছন্নতার মতো আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতাও বিশেষ প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ বলেছেন (আমি তাঁর কথার ফরাসী অনুবাদ থেকে বলছি), "প্রত্যহ সকালে উঠে তোমার দেহকে ও ভিতরের অন্তরাত্মাকে পরিষ্কার করে নেবে, যদি তার মতো সময় না থাকে তবে দেহকে পরিষ্কার করা বরং বাদ দিতে পারো কিন্তু অন্তরকে পরিষ্কার করা কখনই বাদ নয়।"

প্রশ্ন: কিন্তু কেমন করে জানবো যে নোংরা জিনিসগুলো ভিতরে এখনও রয়েছে অথবা সেগুলো ঘচে গেছে?

উত্তর: ছোটোখাটো পরীক্ষার দ্বারা সর্বদাই তা জানতে পারো। তাই আমি বলেছি যে তীব্র টর্চের আলো জেলে তোমার সত্তার মধ্যে "ঘুরে ঘুরে" তার সন্ধান নিতে হবে। খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলে সেই সব নোংরা কোণগুলি অনায়াসে তোমার নজরে পড়বে। মনে করো সুন্দর একটি অনুভূতি পেলে, তোমার আস্পৃহার জবাবে হঠাৎ একটা উদ্ভাসন জ্যোতি দেখলে: আনন্দে, আলোতে, নবশক্তিতে, সৌন্দর্যে তুমি প্লাবিত হয়ে উঠে মনে করলে যে এবার তুমি রূপান্তর পেতে চলেছো...তার পর তখনই সে ভাব কেটে গেল, এমনি তা কেটেই যায়, নয় কি? বিশেষত গোড়ার দিকে। হঠাৎই তা থেমে যায়। তখন যদি খুব সতর্ক না থাকো তাহলে বলো, "হায় হায়, একবার মাত্র এলো, এসেই আবার চলে গেল। আলোর কেবল আভাসমাত্র দেখিয়ে দিয়ে আবার অন্ধকারে ডুবিয়ে দিলে।" কিন্তু সে কথা বলা বোকামি। ওর বদলে বলতে হবে, "আহা, আমিই ওকে ধরে রাখতে পারলাম না, কেন তা পারলাম না?" তখন তুমি টর্চের আলো জেলে নিজের মধ্যে সন্ধান করবে যে তোমার চেতনার পরিবর্তনের সঙ্গে ঐ অনুভূতি থেমে যাবার সঙ্গে কি সম্পর্ক রয়েছে। খুবই নিখুঁতভাবে মন দিয়ে যদি লক্ষ্য করো তো দেখবে যে তোমার প্রাণের বা মনের বা দেহের কোনো অংশ তার সঙ্গে তাল রেখে যেতে পারেনি, যার ফলে মনের মধ্যে তুমি অচঞ্চল ও একাগ্র হয়ে না থেকে (নিজের "বুদ্ধিতে") বুঝে দেখতে চেষ্টা করেছ "এটা কিসের অনুভূতি? এর মানে কি হতে পারে?" কিংবা প্রাণের কোনো অংশ তাকে আরো উপভোগ করতে চেয়ে বলেছে, "বাঃ, বেশ মজার জিনিস দেখছি, আরো বেশি হোক, সব সময়েই হোক!"

কিংবা দেহের কোনো অংশ বলেছে, "না:, এ খুব কঠিন ব্যাপার, কতক্ষণ বা একে ধরে রাখা যায়!" হয়তো আমি যেমন বললাম ঠিক তেমন না হতে পারে, কিন্তু এই রকমেরই কথা কোথাও কিছু লুকিয়ে থাকে। এই তিন রকমের একটা কিংবা ওরই মতো অন্য কিছু নিশ্চয় হয়ে থাকে। সেইখানেই তখন আলো ফেলে দেখার দরকার হয় যে কোথায় রয়েছে কোন দুর্বল অংশ? কোথায় রয়েছে কিছু অহংভাব? কোথায় লুকিয়ে আছে কামনা? কোথায় রয়েছে সেই আগেকার মালিনা বা আমি আর চাইনা? কোন অংশ আত্মদান করতে না চেয়ে পাছে হারিয়ে যাই ভেবে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, নিজেকে খুলে ধরেনি? বা কোন জিনিস ঐ অনুভূতি থেকে নিজের কিছু সুবিধা আদায় করতে চেষ্টা করেছে? কিংবা কোনটা এতই দুর্বল যে আড়ষ্ট হয়ে থেকে তাকে অনুসরণই করলেনা?...এমনিভাবে সর্বত্র আলো ফেলে কারণ সন্ধানের পথ খুঁজে নেবে, এমন আলো ফেলবে যে কিছুই তাকে এড়াতে না পারে।

প্রথম চেষ্টাতেই তার সন্ধান পাবেনা, কিন্তু যদি অনিবার্যভাবে চেষ্টা করতে থাকো তাহলে ক্রমে ক্রমে কিংবা হঠাৎ কোনোদিন সে জিনিস ধরা পড়ে তার পরে তা অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিছুকাল পরে দেখবে যে তুমি অন্য মানুষ হয়ে গেছ।

কিন্তু যদি পূর্বোক্ত মনোভাব নিয়ে দোষটা চাপাও কৃপার ঘাড়ে বা দিব্যজ্যোতির ঘাড়ে, আর বলো, "একবারটি দেখা দিয়ে সরে গেল, আমাকে এইভাবেই আটকে রাখলে," তাহলে ত্রিশ চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর পরেও তুমি ঐ জায়গাতেই থেমে থাকবে, পরিবর্তন কিছুই হবেনা। ঐরকম হঠাৎ কিছু একটা বেরিয়ে তোমার অনুভূতিকে গ্রাস করে নেবে। অগ্রগতি না হয়ে তুমি একস্থানে দাঁড়িয়েই দিন গুণতে থাকবে, এগোবেনা এক পাও। কিন্তু তখনই যদি ঐ অবস্থার সুযোগ নিয়ে নাও...অবশ্য তাতে হয়তো কখনো কিছু বাধাও পাবে, যে অংশ অনুভূতির সুযোগ নিচ্ছে বা মনের বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে ব্যাহত করতে চাইছে বা আলস্যহেতু তাকে তখনই গ্রহণ করতে ইতস্তত করছে, তার উপর যদি সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আলোকপাত করতে পারো, তাতে কিছু বাধাও লাগতে পারে। তখন যদি বলো, "থাক থাক, অত তাড়াতাড়ি কাজ নেই, একটু বিশ্রাম নিতে দাও, অথবা ক্লান্ত হয়ে পড়ছি" তাহলে সবই আবার শুরু করতে হবে গোড়া থেকে। সে অনুভূতি আবার একবার ফিরে আসতে অনেক দিন, মাস বা বছর পার হয়ে যাবে। তবে তোমার আশ্পৃহা যদি খুব তীব্র ও সক্রিয় হয় তাহলে শীঘ্রই তা আসবে। কিন্তু পুনরায় যদি ঐরূপ বোকামি করো তবে পুনরায় ঐরকম হবে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে যদি কৌতূহলী মনকে থামিয়ে দিয়ে বলো, "থামো, এখন চুপ করে থাকো", তাহলে অনুভূতিটি হতেই থাকবে। প্রাণ যদি বলে, "আরো চাই, আরো অনেক চাই", তাকে তখন বলবে,, "শুদ্ধ হও, চঞ্চল না হয়ে স্থির হয়ে থাকো",—কিংবা

দেহ যদি বলে, "আমি আর সইতে পারছিনা, পিষে মরে যাচ্ছি", তখন তাকে বলবে, "চেপে যাও ভীরু, পরীক্ষার কষ্টটুকু কি মোটে সওয়া যায়না"। শান্ত ও অবিচল ইচ্ছার সঙ্গে যদি সময়মত এই কাজ করতে পারো তাহলে তোমার কিছু মিলে যাবে। নতুবা নিষ্ক্রিয় অলস হয়ে যদি বলো, "এখন তো আমি সমর্পণ করে দিয়ে বসে আছি, এবার দেখিনা কি হয়, যা হবার তা তো হবেই",—তাহলে আমি বলি পঞ্চাশ বছরে তোমার অর্ধপদও পরিবর্তন হবেনা।

শেষবারের আলাপে আমি বলেছি যে এ জিনিস অত সহজ নয়।...যে কাজ করতে চাও তা ঠিকভাবেই করো, নতুবা বৃথা চেষ্টা; আধাআধি কাজে কোনো ফল নেই, পুরোপুরি করা চাই।

অবশ্য অন্য রকমের রাস্তাও আছে। নিজেকে পূর্ণ নিখুঁত করে তোলার চেষ্টা না করতেও পারো। কোনো মনোজ্ঞ রকমের কাজের মধ্যে উত্তরোত্তর নিবিষ্ট হয়ে গিয়ে নিজেকে ভুলে যেতেও পারো, অর্থাৎ এমন কাজ যা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও ভগবানে নিবেদিত, যা সমস্ত অন্তর দিয়ে করবে আত্মভোলা হয়ে ও আত্মদান সহকারে—নিজের কথা যাদৌ না ভেবে কেবলই ভাববে সেই কাজের কথা। এ বিষয়টা তোমরা জানো, আগেই তোমাদের বলেছি; যে কোনো ভালো কাজই করতে যাও, এমন কি কোনো স্পোর্টের কাজ, বই লেখা, ছবি আঁকা, সঙ্গীত চর্চা, দৌড়ের প্রতিযোগিতা, যাই কেন করো, তা যদি ভালোভাবে করতে চাও তাহলে তোমার নিজেকেও তাই হতে হবে। তুমি ঐ সামান্য মানুষটি কেবল তার সাক্ষীর মতো হয়ে থাকলে চলবে না; কারণ তা যদি হও তাহলে...তোমার অহংএর ফাঁদের মধ্যেই রয়ে গেলে। যদি তুমি তোমার কাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারো তাহলে তাতেই যথেষ্ট উন্নতি হবে। সে কাজের অতি ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটির মধ্যেও ঢুকে যেতে শিখতে হবে। একটা তুচ্ছ দৃষ্টান্তের কথা বলি—মনে করো তুমি একটা বোতল ভরতে চাইছ। এক বোতল থেকে অন্য বোতলে কিছু ভরবে, এতেই নিবিষ্ট হয়ে গেলে (একটা শিক্ষা হিসাবে বলছি); যতক্ষণ তুমি সেই ভরার বোতল আর অন্য বোতল আর চালাচালির কাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রইলে, ততক্ষণ কাজটা ঠিকভাবে করা হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি ওরই মধ্যে ভাবতে শুরু করো, "এই তো, আমি ঠিক কাজটাই করছি", অমনি তখনই সে জিনিস চলকে বাইরে পড়ে যাবে। সকল কাজের বেলাতেই এমনি হয়। সেইজন্য কাজই হলো সমুচিত শিক্ষার পন্থা, কারণ সে কাজ নিখুঁতভাবে করতে গেলেই তোমাকে তার সঙ্গে একাত্ম হতে হবে, কাজটা যে ব্যক্তি করছে সে আর এই তুমি থাকবে না, নতুবা তা তেমন ভালোভাবে করাই যাবে না। যদি কাজটির "করনেওয়ালা" হয়েই তুমি থেকে যাও এবং নানারকম ভাবতে

থাকো তাহলে নিশ্চয় জেনো—তন্দুর জিনিসটা নাড়তে গেলেই তুমি তা ভেঙে ফেলবে, কিছু রাঁধতে গেলে তা পুড়িয়ে ফেলবে, বল খেলতে গেলে সে বল হাত থেকে ফস্কে যাবে। কাজও একটা বড় শিক্ষার উপায়। আর ভালো কাজের এই হলো একমাত্র উপায়।

মনে করো কেউ একজন একটা বই লিখছে। কিন্তু লিখতে বসে যদি সে নিজেকে লক্ষ্য করতে থাকে, তাহলে সে লেখা যে কতদূর খারাপ হবে তা ধারণাতীত। তার ক্ষুদ্র অহংএর গন্ধটা তৎক্ষণাৎ সেই লেখার ভিতর থেকে ফুটে বেরোবে, সে লেখার কোনো মূল্যই থাকবে না। চিত্রকর যদি ছবি আঁকতে আঁকতে নিজেকে লক্ষ্য করতে থাকে, সে ছবি তার কখনই ভালো হয় না, তার নিজের ব্যক্তিত্বটাই তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে; সে ছবি হয় প্রাণহীন, সৌন্দর্যহীন, নিস্তেজ। কিন্তু সে যদি তখনই হয়ে দাঁড়ায় তার ছবির বিষয়বস্তু তার তুলি, রং, ক্যানভাস, বর্ণবৈচিত্র্য, তার ছবির গোটা প্রতিরূপ, তারই মধ্যে যদি সে ডুবে যায়, তাহলে তা হয় এক অপূর্ব জিনিস।

সকল ব্যাপারেই এই কথা। এমন কোনো কাজ নেই যা সমুচিতভাবে করতে জানলে তা যোগশিক্ষার কাজের সঙ্গে না মেলে। আর ঠিকভাবে তা করতে না জানলে কোনো তপস্যাতেই কিছু ফল হয় না। কারণ সেখানেও সেই একই কথা, তপস্যা করতে করতে যদি নিজের পানে চেয়ে ভাবতে থাকো, "আমি কি এগোচ্ছি? ভালো কিছু হচ্ছে কি? এর সুফল কিছু কি হবে?" তখন তোমার নিজের অহংটাই সব চেয়ে বড়ো হয়ে উঠে জায়গা জুড়ে থাকবে, অন্য কিছুর স্থান সেখানে হবে না। আর সেদিন তোমাদের বললাম যে আধ্যাত্মিক অহংটাই সব চেয়ে খারাপ, কারণ নিজের হীনতা সম্বন্ধে সে একেবারে অচেতন, পুরো দিব্য হয়ে গেছি না ভাবলেও খুব বড়ো হয়েছি বলেই ভাবে।

স্কুলে যখন পড়ছ তখন শিক্ষক কি বলছেন তাতেই একাগ্র হয়ে থাকবে, যে চিন্তা বা জ্ঞান তোমার মধ্যে আসছে সেদিকে নিবিষ্ট হবে। তখন নিজের কথা আদৌ ভাববে না, কেবল ভাববে শিক্ষার বিষয়ের কথা। তাতে তোমার বোঝবার শক্তি দ্বিগুণ বাড়বে।

নিজের দিকে ফিরে ফিরে চাওয়া মানেই হীনতা ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার বোধগুলি চলে আসা, নিজের আণুবীক্ষণিক অহংএর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হওয়া মানেই অক্ষম নির্বীর্যতা। উদার উন্মুক্ত ক'রে আপনার ভিতরের দরজা খুলে দিতে হবে। আর নিজের দিকে একাগ্র না হয়ে নিজের কাজের দিকে একাগ্র হওয়াই সর্বোত্তম পন্থা।

এপ্রিল ২৮, ১৯৫১

(শ্রীঅরবিন্দের "মা" বইখানি থেকে) "কিন্তু নিম্নপ্রকৃতি যতদিন সক্রিয় রয়েছে, ততদিন পর্যন্ত সাধকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অবশ্য প্রয়োজন আছে।"

বাহ্যতঃ তোমার নিজের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর একটা আস্থা তোমার আছে। যতদিন সে আস্থা বর্তমান ততদিন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা তো করতেই হবে।

সত্তার মধ্যে এমন অংশ আছে যে জানেনা, সে ভগবানেরই একটু অংশ মাত্র। বাহ্যসত্তার সম্পূর্ণটাই নিঃসন্দেহরূপে জেনে রেখেছে যে সে নিজে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা, সে নিজেকে নিয়ে নিজে আছে। সত্তার এই অংশের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা করা দরকার। তাকে এমন কথা বলা যায় না যে "ভগবান তোমার হয়ে সাধনা করছেন, কারণ তাহলে সে কিছুই করবে না, কিছুই তার বদলাবে না। যার সঙ্গে কথা বলতে চাও তাকে তার ভাষাতেই তা বলতে হয়, নয় কি? (পরে এই অংশটি ছাপবার সময় মা এখানে বললেন—"এ কথা ঠিক হলো না। নিতান্ত ছাঁকা কথা হয়ে গেল। তার ভাষাটাই ভুল ভাষা, যদিও তাকে কথাটা বোঝাতে হবে, কিন্তু তা হলো আলাদা কথা। এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ সুদীর্ঘ ছত্রের পর ছত্র বাক্যসমষ্টির দ্বারা ব্যাখ্যা করতেন, সেগুলি ব্যাখ্যা নয়, নিখুঁতভাবে বলতে গিয়ে তাই করতে হতো।")

প্রশ্ন দেহের তমস জিনিসটা কি?

উত্তর: তা জানো না? অবাক করলে। এমন কি কখনো তোমার হয়নি যে বসে থেকে বসেই রইলে, উঠতে ইচ্ছা হলো না? কিংবা কোনো একটা কাজ করতে বাকী আছে জেনেও কি বলোনা, "ওঃ, এটা কি নেহাৎ করতেই হবে...

প্রশ্ন যাকে বলে আলস্য, কুঁড়েমি, এ কি তাই?

উত্তর ঠিক তাই নয়। অবশ্য আলস্যও একটা তমস্, কিন্তু ওর মধ্যে থাকে একটা বদ ইচ্ছা, চেষ্টা করবার অনিচ্ছা। আর তমস্ হলো জড়তা, করতে চাইলেও পারোনা।

অনেককাল পূর্বে আমি কয়েকজন তরুণ ব্যক্তির মাঝে বসে থাকতে থাকতে আমার ওঠবার ইচ্ছা হওয়ামাত্র আমি অনায়াসে লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। তাই দেখে তারা বললে, "এটা কেমন করে করলেন? আমরা যখন উঠতে চাই তখন আগে ওঠবার ইচ্ছা করে নিয়ে তারপর চেষ্টা করে তবে আমাদের উঠতে হয়।" তারা আশ্চর্য হয়েছিল। আর আমিও তাদের কথায় আশ্চর্য হলাম। ভাবলাম, "তাই বা কেন হবে? ওঠবার মন

হলে তখনই তো উঠে পড়ব।" তা নয়, দেহটা বসেই থাকে, ইচ্ছাকে আগে তার মধ্যে ঢোকাতে হয়, তাকে উঠিয়ে কাজ করতে বাধ্য করতে হয়। এরই নাম তনস্। প্রাণের বা মনের তনস্ খুবই বিরল (তাও হয় সংক্রমণের দ্বারা), হয়তো তা আয়বিক তনস্, প্রাণে বা মনে না হয়ে তা হয় মস্তিষ্কের মধ্যে। কিন্তু আলস্য হয় সকল অংশেই, মনে, প্রাণে, দেহে। সাধারণত যারা কুঁড়ে হয় তারা সকল বিষয়েই কুঁড়ে নয়। তাদের মনের মতো যদি কিছু করতে বলো তখনই তা করতে তারা প্রস্তুত হবে। কুঁড়েমির মধ্যে যথেষ্ট বল ইচ্ছা থাকে।

("মা" বইখানি থেকে) শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "দেহচেতনাকে ও প্রকৃতিকে যথেষ্ট উন্মুক্ত ও নমনীয় করে আনার ইচ্ছা জাগানো" দরকার।

তার কারণ দেহগত চেতনা ও প্রকৃতি খুবই সীমাবদ্ধ ও অনমনীয়—আপন অভ্যাসের মধ্যে নিতান্ত গণ্ডীবদ্ধ; এরা কোনো পরিবর্তন চায়না, বাঁধাধরা নিয়মেতে চলে। দেহের চেয়ে নিয়মবদ্ধ জিনিস আর কিছুই নেই। তার সেই অভ্যাসের যদি সামান্যমাত্র ব্যতিক্রম করতে যাও অমনি সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠবে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বলবে, "মাপ করো, মাপ করো, এ ভাবে কেউ বাঁচতে পারেনা।"

যাদের প্রাণসত্তা যথেষ্ট সতেজ ও প্রভাবসম্পন্ন তারা তাদের দেহকে নাড়া দিয়ে প্রভাবিত করে, এবং দুঃসাহসিক হলে (প্রাণসত্তা প্রায়ই দুঃসাহসিক হয়) দেহ তার প্রভাবকে মেনে নিতে বাধ্য হয়, ভিতরের নির্দেশ মেনে নিয়ে পরিবর্তনে রাজী হয়ে যায়, কিন্তু তাতে চেষ্টা লাগে। আর দিব্যের প্রভাব গ্রহণে প্রস্তুত হতে গেলে দেহসত্তা ও দেহ-চেতনার পক্ষে পুরোপুরিভাবেই নমনীয় হওয়া চাই, কারণ প্রাণসত্তার হুকুমের বেলাতে থাকে জবরদস্তি, দেহ বেচারাকে সেখানে মানতেই হয়, কিন্তু দিব্যের বেলাতে আসে কেবল জ্যোতি ও নবচেতনা, সেখানে তাকে গ্রহণ করতে হয় সচেতন ইচ্ছার সঙ্গে—বাধ্যতার প্রশ্নই নেই, চাই কেবল সহযোগিতা। দেহ ও তার চেতনার পক্ষে এতটাই নমনীয় হতে হবে যে সকল পরিবর্তনেই সে রাজী থাকবে, একদিন এক পথে ও পরের দিন অন্য পথে চলতে তার আপত্তি থাকবে না।

প্রশ্ন : শক্তি মাত্রই কি গতিবেগযুক্ত নয়?

উত্তর : স্থিতিশীল শক্তিও আছে। কেমন করে তা বোঝাই? দেখ, খেলা আছে দুই রকমের, রক্ষণমূলক ও আক্রমণমূলক, তা তো জানো? স্থিতিশীল ও গতিশীল শক্তির মধ্যে ঐ ধরণেরই পার্থক্য। স্থিতিশীল শক্তি সকল আক্রমণের বেগকেই আটকাবে, কিছুই তাকে ছুঁতে বা নড়াতে বা আহত করতে পারবেনা—সে থাকবে অনড়, অজেয়।

আর গতীয় শক্তি হলো ক্রিয়াশীল, আঘাত দিতেও পারে আবার নিতে পারে। অর্থাৎ তুমি যদি তোমার ঐরূপ শক্তিকে সর্বদা জয়ী করতে চাও, তাহলে কিন্তু সেখানে স্থিতিশীল শক্তির সমর্থন দরকার হবে, তবেই তার ভিত্তি অটল হবে।

আমি জানি তোমরা কি বলতে চাইছ...মানুষ তখনই শক্তি পরিচয় পায় যখন তা কাজ করে; মানুষ ভাবে যে কাজ করলে তবেই তা হলো শক্তি, কাজ নেই এমন শক্তির অস্তিত্বের কথা সে জানে না, নিষ্ক্রিয়তার পিছনেও যে প্রবল শক্তি থাকতে পারে সে খবর রাখেনা, যদিও বাস্তবিক তা সক্রিয় শক্তির চেয়ে অনেক প্রবল হতে পারে। তুমি নিজেও এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো তোমার বিরুদ্ধে যদি কোনো কঠোর নিন্দাবাক্য বা অনিষ্টকারী ক্রিয়া প্রযুক্ত হতে থাকে, তখন শান্ত অবিচল ও নিরপেক্ষ থাকতে পারা কতই কঠিন—আঘাতের জবাবে আঘাত দেওয়ার চেয়ে তা অনেক বেশি কঠিন। কেউ যখন তোমাকে অত্যন্ত অপমান করছে তখন যদি তুমি স্থির অচঞ্চল হয়ে থাকতে পারো (কেবল বাইরে নয়, ভিতরেও), যদি সে অপমান তোমার গায়ে কিছুমাত্র লাগতে না দাও: সেখানে তুমি এমন শক্তিময় হয়ে দাঁড়াবে যার বিরুদ্ধে কেউই কিছু করতে পারবে না, তুমি কোনো কিছুতে সাড়াই দেবেনা, একটিও কথা বলবে না, একটুও টলবে না, ভিতরে বাইরে তুমি সমান নিস্পন্দ হয়ে থাকবে, তোমার হৃৎস্পন্দন ধীরে ধীরেই হতে থাকবে, মাথার ভিতরকার চিন্তা থাকবে শান্ত ও অবিচল, অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী কিছুমাত্র উত্তেজিত হয়ে আঘাতের দ্বারা আঘাতের জবাব দিতে যাবে না—এমন অবস্থা যদি আনতে পারো, তাহলে তোমার সেই স্থিতিশীল শক্তি তোমার গতিশীল শক্তির চেয়ে অসংখ্য গুণে প্রবল হবে, যার তাড়নায় তুমি অপমানের বদলে অপমান ও আঘাতের বদলে আঘাত করতে চাইতে।

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ ওতে বলেছেন, "বোকামি, সন্দেহ, অবিশ্বাসকে বর্জন করতে হবে"। বোকামি যে বর্জন করতে পারবে সে তো বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে?

উত্তর: অর্থাৎ বোকামি কেউ বর্জন করতে পারে কিনা? হ্যাঁ, তার একটি উপায় আছে। সহজ না হলেও সে উপায় রয়েছে। আমি এমন লোকেদের জানি যারা যথার্থই অতি বোকা—কিন্তু শুধু আশ্পৃহার জোরে, যদিও সে আশ্পৃহা অসংগঠিত ও বাক্যের দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়—তবু তারই জোরে তারা চৈত্যের সংস্পর্শলাভ করেছে। সে সংস্পর্শ নিত্য নয়, তা ক্ষণকালের, প্রায় চকিতের মতো। কিন্তু সেই সংস্পর্শকালে তারা অসাধারণ রকমে বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে অতি আশ্চর্য সব কথা বলেছে। আবার চৈত্যের সংস্পর্শ ছেড়ে গেলে পূর্বের মতো বোকা হয়ে গেছে। এটা স্থায়ী জিনিস নয়,

কেবল চৈত্যসংস্পর্শের ফলেই বুদ্ধিদীপ্ত হওয়াতে তাদের বোকামি ঘেড়ে গেছে। অবশ্য উপায়টি খুব কঠিন, চৈত্যের সঙ্গে স্থায়ী সংস্পর্শ ঘটানো।

একটি মুসলিম কিংবদন্তীতে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে এক কাহিনী আছে: খ্রীষ্ট অনেক রোগ সারাতেন, পঙ্গুকে চলবার শক্তি দিতেন, অন্ধকে দৃষ্টি দিতেন, এমন কি মৃতকেও জীবন দিয়েছেন। এই সব দেখে একজন তাঁকে বলে, "আমার ছেলেটিকে তোমায় সারিয়ে দিতে হবে ছেলেটি নিতান্ত বুদ্ধিহীন বোকা।" খ্রীষ্ট তাই শুনে ভয় পেয়ে সরে পড়লেন। অর্থাৎ এ কাজ করতে তিনিও অক্ষম। কথাটা যদিও ঠাট্টা মাত্র কিন্তু এতে বোঝাচ্ছে যে কাজটি কতই কঠিন, তথাপি তাও হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন (উক্ত বইখানি থেকে) "ভগবান আছেন সকল ক্রিয়ারই পশ্চাতে, কিন্তু তিনি আছেন তাঁর যোগমায়ার অন্তরালে।"

উত্তর: হাঁ, জড়প্রকৃতির চেতনার দ্বারা তিনি আচ্ছাদিত। মূলের যে চেতনা সে তাঁকে আচ্ছন্ন করেনা, প্রকট করে। কিন্তু বাহ্যরূপে যে চেতনা এখানে রয়েছে তাই তাঁকে আবৃত করে রেখেছে। কেউ কেউ বলে তা ইচ্ছাকৃত, তাঁর লীলা যাতে অভিব্যক্ত হতে পারে, ভগবান লুকিয়ে থাকেন জড়প্রকৃতির আড়ালে যাতে চেতন সত্তারা তাঁকে খুঁজতে বাধ্য হয়। এ একটা মতবিশেষ...লোকে অনেক রকমই বলে থাকে।

অধিকাংশ দর্শনের একটা বড়ো ত্রুটি এই যে তারা অস্তিত্বের যাবতীয় বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন রাজ্যের কোনো সন্ধান রাখেনা। তারা দেখে কেবল পরমতত্ত্ব স্রষ্টাকে ও এই সৃষ্টিটাকে, তার মাঝে আর কিছু নেই। এতে সব কথা ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। ...সকল ব্যাখ্যাই শেষ পর্যন্ত কেবল ভাষা, কোনো ভাষাতে বোঝা কিছু সহজ আর কোনো ভাষাতে তা কঠিন। অপরপক্ষে তুমি যদি আদি মূল ও সর্বনিম্ন জড় প্রকৃতির মাঝামাঝি অবস্থাগুলির কথা, বিভিন্ন প্রকার রাজ্য ও তার ভিতরে বাহিরে সত্তাগুলির অবস্থানের কথা জানতে পারো, তাতে অনেক সমস্যার সহজ ব্যাখ্যা হয়ে যায়। আমরা ইতিপূর্বে নিয়তিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যদি নিয়তিকেই সম্পূর্ণরূপে নির্ধার্য বলে মেনে নাও তাহলে কিছুই বোঝা হলোনা—কারণ জীবনের বাস্তব ঘটনা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেবে। তাতে সমস্যা এমন জটিল হয়ে দাঁড়াবে যে কোনো কিছু ধরাই যাবে না। কিন্তু যদি এটা বোঝো যে নিয়তি অনেক সংখ্যাতে থাকে পরস্পরনির্ভর হয়ে, এক নিয়তি অন্য নিয়তির ক্রিয়াকে বদলে দিতে পারে, তাহলে বুঝতে পারা সহজ হয়ে আসে। বিশ্বে ভগবানের ক্রিয়া সম্বন্ধেও এই কথা। যদি ভাবো যে একদিকে এই রয়েছে সেই কেন্দ্রীয় সৃষ্টিশক্তি বা সৃষ্টিচেতনা বা নিরপেক্ষ মহাসাক্ষী, আর অন্যদিকে

নিখিল বিশ্ব, যাকে আর কিছু নেই, তাহলে কিছুই নেই বোঝা হবে না। অনেকে এইভাবেই জিনিসটাকে সহজ করে নিয়েছিল। কেবল আছেন ভগবান যিনি সৃষ্টা, আর আছে তাঁর সৃষ্ট জীবগণ। এতেই এসে পড়ে নানা সমস্যা। ভগবান জগৎ সৃষ্টি করলেন, কিন্তু কি দিয়ে? কেউ কেউ বলে ধূলিকণা দিয়ে। তাহলে জগৎসৃষ্টির পূর্বে সেগুলো কি করছিল?...অথবা তিনি সৃষ্টি করলেন শূন্যের ভিতর থেকে। ..খুবই অর্থহীন কথা, যুক্তিবাদী মনের পক্ষে বড়ই বিভ্রান্তিকর। তার উপর বলা হয়েছে যে তিনি সজ্ঞানে ইচ্ছাপূর্বক এটি করেছেন এবং কাজ শেষ করে বলেছেন, "বেশ ভালো জিনিসই হয়েছে।" কিন্তু জগদ্‌বাসীরা বলছে, "আমরা তো ভালো কিছু দেখছি না। তোমার কাছে ভালো হতে পারে, আমাদের কাছে নয়।" এ সব হলো সহজ করা মতবাদ। নিতান্ত ভুল এই সহজ মতবাদ বিশ্বসমস্যাকে খুবই দুর্বোধ্য করে তুলেছে, এবং যার মস্তিষ্ক একটুও জেগেছে তার কাছে এ ব্যাখ্যা আদৌ গ্রাহ্য নয়। তাই তোমাদের বলে দেওয়া হয়, "বুঝতে চেষ্টা কোরো না, কিছুই তোমরা বুঝবে না।" কিন্তু সে হলো মনের একটা কুঁড়েমি, মনের বদ ইচ্ছা। যার মনে ক্রিয়াশীল শক্তি আছে সে নিজের মনে এই আস্পৃহাই করতে থাকে যাতে কিছু আলো পায়, কিছু মীমাংসা পায়, কোনো ব্যাখ্যার সঙ্গে যা মিলে যায়,—নতুবা (আমি এ সম্বন্ধে হয়তো কিছু লিখে থাকব) জগৎ যদি হতো অত সহজ মীমাংসার জিনিস, তাহলে সে তো একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়াল, তাই যারা বলে "এ জগৎ থেকে যত শীঘ্র সরে পড়া যায় ততই ভালো," তারা ঠিকই বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পালিয়ে সরে যাবার তো অন্য কোনো স্থান নেই, আছে কেবল এই একটাই স্থান,—এ অবস্থান থেকে বেরিয়ে তুমি অন্যত্র আর যাবে কোথা? অতএব এই চিন্তা নিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে অন্তরাত্মা হতাশ হয়ে পড়ে যায়। কিন্তু এর যদি তেমন কোনো চাবি খুঁজে পাও—আছে তেমন দুএকটা চাবি, অন্ততপক্ষে একটা চাবি আছে যা দিয়ে সব দরজাই খুলে যেতে পারে—সে চাবি পেলে আপন রাস্তা করে নিয়ে তুমি আসল কথাটা ক্রমে বুঝতে পারো।

প্রশ্ন: চেতনা আর দেহপ্রকৃতির মধ্যে কি তফাৎ?

উত্তর: বলো দেখি, তোমার দেহটা কি নিজের সম্বন্ধে, নিজের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সচেতন? না। তাহলে কি তবে? অমনিই দেহের প্রকৃতি। আর দেহ-প্রকৃতি যদি নিজে চেতন না হয়, তার মানে প্রকৃতি আর চেতনা এক জিনিস নয়। দেহপ্রকৃতির মধ্যে জড়প্রকৃতির সব কিছু রয়েছে। যেমন পাহাড়, পাথর, আকাশ, জল, আগুন—সবই জড়প্রকৃতির অন্তর্গত। কিন্তু তোমার ঐ দেহপ্রকৃতির মধ্যে রয়েছে

উপরন্তু একটা চেতনা, নিজে চেতন না হলেও সে ঐ চেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। আর সে নিজে চেতন নয় বলে সে জড়বৎ অনড়, তামসিক, "নিশ্চেতন" হতে পারে। নতুবা সকল কিছুই চেতন হতো, এমন কি পাথরও (পাথর কতটা চেতন জানিনা, তবে মানব-চেতনার তুলনায় খুবই সামান্য)।

প্রশ্ন : নিজের কাজগুলিকে নিবেদন করা কি "সমর্পণের" একটা স্বরূপ নয়?

উত্তর : কাজ করা খুবই ভালো উপায়। কিন্তু সমর্পণের ভাব সেরূপ নয়, তা কোনো অচেতন, নিষ্ক্রিয়, প্রায় অনৈচ্ছিক বাধ্যতা নয়। কেবল কাজ দিয়ে সমর্পণ হয়না।

সমর্পণের সব চেয়ে বড়ো কথা হলো তোমার চরিত্রের, তোমার জীবনধারার সমর্পণ, যাতে তা একেবারে বদলে যাবে। তোমার প্রকৃতিকে যদি সমর্পণ না করো তবে সে প্রকৃতি কখনই বদলাবে না। এই হলো সব চেয়ে জরুরী কথা। তোমার নিজের একটি বোঝবার ধারা আছে, প্রতিক্রিয়ার ধারা আছে, বোধশক্তির কাজের ধারা আছে, অগ্রসর হবার ধারা আছে, বিশেষত জীবনের উপর একটা দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন সম্বন্ধে কিছু প্রত্যাশা আছে,—সেইগুলিকেই করতে হবে সমর্পণ। অর্থাৎ প্রকৃতই যদি তুমি দিব্যজ্যোতি লাভ করতে ও রূপান্তর পেতে চাও তাহলে তোমার সত্তার সকল ধারাকেই সমর্পণ করতে হবে,—তা করতে হবে আত্মোন্মীলনের দ্বারা, নিজেকে যথাসাধ্য উন্মুক্ত ও গ্রহিষ্ণু করে তুলতে হবে, যাতে দিব্যচেতনা তার মধ্যে সরাসরি কাজ করে ঐ সব ক্রিয়াকে সঠিক রকমের ক্রিয়াতে পরিবর্তিত করে আনতে পারে, তোমার সত্তার ভিতরকার নিজস্ব সত্য অনুযায়ী। কাজ নিবেদন করার চেয়ে এটি করা অনেক বেশি জরুরী। যা কিছু তুমি করছ সেটাই বড়ো কথা নয় (যদিও তারও প্রয়োজনীয়তা আছে), কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা যা তুমি হয়েছ। যাই কেন করো, কিভাবে করছ তাই নিয়ে কথা নয়, কেবল চেতনার সঙ্গে তা করছ সেটাই বড়ো কথা। তুমি হয়তো খুব নিঃস্বার্থ-ভাবে ব্যক্তিগত কোনো লাভের আশা না নিয়ে কেবল কাজের আনন্দেই সে কাজ করছ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি সে কাজ তখনই ছেড়ে দিতে বা বদ্‌লে ফেলতে বা তার ধারা বদলাতে প্রস্তুত না থাকো, যদি সমানে তাই করে যেতে চাও, তাহলে তোমার সমর্পণ সম্পূর্ণ হলোনা। এমন একটা অবস্থাতে তুমি আসবে যখন নিজের মধ্যে স্পষ্ট বোধ করতে থাকবে যে অমুক কাজটি করতে তুমি আদিষ্ট হচ্ছ এবং সেই কারণেই তা সেইভাবে করতে হবে। সে কাজ তুমি আপন অভ্যাসহেতু বা আসক্তিহেতু বা পছন্দ হেতু করবেনা, কোনো নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে বা একটা ভালো কাজ করা হিসাবেও

নয়,—তা যদি করো তাহলে তোমার সমর্পণ সম্পূর্ণ হলোনা। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোনো কাজে এমন ভাবে লেগে থাকো যাতে বলো, "এটা ওটা সেটা বদলাতে পারে, কিন্তু আমার এটি বদলাবেনা" (সে কাজ নিজে বদলাতে চায়না বলে নয় কিন্তু তাকে বদলানো তোমার ধারণাতে আসছেনা)—ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার সমর্পণ সম্পূর্ণ নয়।

বলা বাহুল্য, যদি তোমার কাজের মধ্যে এ ভাব একটুও থাকে, "আমায় করতে দেওয়া হয়েছে তাই করছি", যতক্ষণ তার মধ্যে অবশ্যকরণীয় ভাবটি আসেনি, তাতে আনন্দ আসেনি, কেবল একটা তোমার পৃথক অংশ বলছে "এই ভাবে এটি করতে বলা হয়েছে তাই করছি", তখন তার মানে তোমার ও সমর্পণের মাঝখানে বস্তু একটা ফাঁক রয়েছে। প্রকৃত সমর্পণ সেইখানে যেখানে সে কাজ করা ছাড়া কোনো গতি নেই, যেখানে তদ্ভিন্ন তুমি অন্য কিছু করতেই পারোনা, যেখানে তার সঙ্গে একটা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ যোগ রয়েছে। অথচ পরমুহূর্তে সে কাজ বদলেও যেতে পারে, যদি তাই উদ্দিষ্ট হয় তবে তার বদলে অন্য কাজ এসে পড়তে পারে। এখানে চাই পুরো নমনীয়তা, তাতেই বস্তু পার্থক্য। এটা ঠিক কথা যে কাজ যারা করছ তাদের এইরূপই বলা হয়, "হাঁ, কাজ করে যাও, এই তোমাদের সমর্পণের রাস্তা", কিন্তু তা হলো গোড়ার দিকের কথা। অবস্থা ক্রমশ বাড়বে। শুধু আরম্ভের বেলাতেই ওরূপ বলা হয়, বুঝলে?

মে ৩, ১৯৫১

(শ্রীঅরবিন্দের "মা" বইখানি থেকে) "অর্থ হলো বিশ্বশক্তির এক দৃষ্ট রূপ, এ শক্তি পৃথিবীতে অভিব্যক্ত হয়ে কাজ করে তার প্রাণ ও দেহের স্তরে, আর বাহ্য জীবনের সম্পূর্ণতার জন্য এই অর্থ অপরিহার্য। মূলতঃ এবং ওর প্রকৃত ক্রিয়াতে ও-জিনিস ভগবানের। কিন্তু তাঁর অন্যান্য সব শক্তির মতো এটিকেও এখানে নিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু নিম্নপ্রকৃতির অজ্ঞানতা হেতু একে জোরদখল করা হয় অহং তোষণের জন্য অথবা আসুরিক প্রভাবে একে ধরে রেখে এর প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বিকৃত করা হয়। এটি হলো সেই তিন শক্তির অন্যতম—ক্ষমতা, অর্থ, যৌনতা। মানুষের অহংএর এবং অসুরের এর প্রতি প্রবল আসক্তি, এবং যাদের অধিকারে আসে তারা প্রায়ই এর অসদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার করে।...এই কারণে অধিকাংশ আধ্যাত্মিক অনুশাসনে বলে যে দারিদ্র্য ও রিক্ততাই আধ্যাত্মিকতার পক্ষে অনুকূল অবস্থা। কিন্তু

তা ভুল কথা ওতে এ শক্তিকে যত সব বিরোধী শক্তিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। অতিমানস পথের সাধকদের পক্ষে উচিত কাজ হবে এ শক্তিকে ভগবানের প্রয়োজনে পুনর্দখল করা এবং তাঁরই কাজে দিব্যজীবনের উদ্দেশ্যে দিব্যভাবে এর সদ্ব্যবহার করা।"

প্রশ্ন : কেমন করে জানব, যে ভাবে অর্থ ব্যবহার করছি তা ভগবৎ ইচ্ছা অনুযায়ী ?

উত্তর : ভগবৎ ইচ্ছা কি তাই প্রথমে জানতে হবে। তবে সব চেয়ে সুনিশ্চিত উপায় দিব্যকাজে অর্থ নিবেদন করা, যদি নিজের কাজের উপর আস্থা না থাকে। "দিব্য ভাবে" দেওয়া মানে ভগবৎসেবাতে দেওয়া অর্থাৎ আত্মতুষ্টির জন্য নয়, সেবার জন্য প্রয়োগ করা।

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "অর্থের অধিকারী হলে তাকে কতকগুলি অভ্যাসের দুর্বল বন্ধনে জড়িয়ে ফেলে।"

উত্তর : যদি তুমি ধনী হয়ে অনেক টাকার মালিক হও, তখন সে টাকা তুমি তোমার মনোমত বিলাসে খরচ করো এবং তাতেই অভ্যস্ত হয়ে তারই বন্ধনে আবদ্ধ হও। তারপর একদিন যদি নির্ধন হয়ে পড়ো, তখন সেই অভ্যাসের জিনিসের অভাবে তুমি অসুখী ও দুর্দশাপন্ন হয়ে ভাবো যে তোমার সকলই গেল, যেহেতু অভ্যস্ত কোনো কিছুই তোমার মিলছে না। এ এক দুর্বলতারই বন্ধন। অনাসক্ত ব্যক্তি ঐ সকল অভ্যাসের মধ্যেও ঠিক থাকে, আবার যখন সব চলে যায় তখনও ঠিক থাকে সে থাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়ে। এটাই হলো সমুচিত মনোভাব ; যখন অর্থ থাকবে তখন তার যথা-যোগ্য ব্যবহার করবে, যখন থাকবে না তখন তার প্রয়োজনও হবেনা। তার আভ্যন্তর চেতনাতে এতে কিছু যাবে আসবেনা। শুনে হয়তো আশ্চর্য হচ্ছ, কিন্তু তাই হয়।

প্রশ্ন : যদি কারো প্রভূত অর্থ অর্জনের ক্ষমতা থাকে, তার মানে কি পার্থিব শক্তিদের উপর তার কিছু অধিকার আছে ?

উত্তর : কেমন ভাবে সে অর্থ সংগৃহীত হচ্ছে তার উপর তা নির্ভর করে। যদি তুমি অসৎ উপায়ে তা সংগ্রহ করো, সেখানে ঐরূপ কোনো অধিকার তোমার থাকবে না। কিন্তু কেউ যদি নিজের কাজ ঠিক ভাবে করতে করতে দেখে যে তাতেই অনেক অর্থ

তার হাতে এসে গেল, সেখানে ঐরূপ অধিকার কিছু আছে বলেই বোঝাবে। অনেকের অর্থকে আকর্ষণ করার একরূপ ক্ষমতা থাকে, সেজন্য তাদের অসৎ কাজ কিছু করতে হয় না। আবার অনেকে অল্পবিস্তর সৎভাবে নানা উপায় অবলম্বন করেও মাত্র কিছু অর্থই সংগ্রহ করতে পারে। অতএব এ বিষয়ে কিছু বলা যায়না...কোনো ধনীকে দেখে তুমি হয়তো ভাবলে যে অর্থশক্তির উপর তার নিশ্চয় কিছু অধিকার আছে—কিন্তু তা ঠিক নয়। তবে যদি কেউ সাধুভাবে থেকে টাকার দিক লক্ষ্য না রেখে নিজের কাজ করে যায়, তথাপি টাকা তার কাছে আপনি অনেক এসে পড়ে, সেখানে জানবে যে ঐ শক্তিদের উপর তার নিশ্চয় কিছু প্রভাব আছে।

প্রশ্ন : কথায় বলে, একটা গর্ত না খুঁড়লে একটা ঢিবি গড়া যায়না, অর্থাৎ কাউকে গরিব করে না দিয়ে তুমি ধনী হতে পারোনা, তা কি ঠিক কথা ?

উত্তর : ঠিক তা নয়। তুমি যদি কিছু একটা গড়ে তোলো, তাতে সম্পদ বেড়েই যায়, কমে না। তার মানে তুমি জগতে এমন কিছু ছাড়লে যার মূল্য টাকার সঙ্গে সমান। কিন্তু যারা ফাটকা খেলে, ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা লগ্নীর কারবার করে, তাদের বেলাতে ও কথা ঠিকই, একটা গর্ত কেটে একটা ঢিবি গড়া। ওতে একজনের ক্ষতি না করে অন্যের লাভ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই তার সীমা। একজন উৎপাদক যখন কিছু উৎপাদনের দ্বারা প্রচুর অর্থ অর্জন করে, তখন সে কোনো গর্ত খোঁড়ে না। অবশ্য তার উৎপাদনেরও মূল্যের প্রশ্ন আছে, কিন্তু যাতে মনুষ্যসম্পদ বাড়ে তাতে গর্ত খোঁড়ার প্রশ্ন থাকে না। কেবল স্থূলের রাজ্যে নয়, শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান, সকল ক্ষেত্রেই সম্পদসৃষ্টি হতে পারে।

প্রশ্ন : আমি যখন আমদানি রপ্তানির ব্যবসাতে ছিলাম তখন কেবলই মনে হতো যে আমি অন্যান্য প্রতিবেশীদের ন্যায্য উপার্জনের অর্থ হতে বঞ্চিত করছি।

উত্তর : ওটা হলো মধ্যবর্তী হয়ে অন্যদের উপার্জনের অর্থ ভোগ করানো। এ একটা সুবিধার উপায় বটে, কিন্তু যে ভাবে এ কারবার করা হয় তাতে পণ্যের উৎপাদক ও ভোক্তাদের মাঝে থেকে দুইদিকের অর্থ আহরণ করা হয়। তুমি নিজে কাজের কিছু করছ না, কেবল মাঝে থেকে বিনা চেষ্টাতে অর্থ উপার্জনের সেই সুবিধাটি ভোগ করছ। তবে এর চেয়েও আরো অসংখ্য রকমের হীনতর উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : বাইরের বন্ধুরা প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করে, "অর্থ উপার্জন করতে যখন বাধ্য হয়েছি তখন কি কেবল প্রচলিত সাধুতার নীতি মেনে চললেই যথেষ্ট, অথবা আরো কঠোর সংযত নীতিতে চলতে হবে?"

উত্তর তোমার বন্ধুর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর উপরেই তা নির্ভর করবে। যদি সে সাধক হতে চায় সেখানে মামুলী কোনো নীতির কোনো মূল্যই থাকবে না। যদি সে সাধারণ মানুষ হয়ে সাধারণ জীবন যাপন করে, সেখানে এটা ব্যবহারিক প্রশ্ন মাত্র, নয় কি? স্থানীয় নীতি মেনে চললে তাকে কোনো দুঃখই পেতে হবে না। কিন্তু যদি যোগের রাস্তা ধরে দিব্যজীবনের পথে যেতে চায় তাহলে সেখানে ঐ মামুলী নীতিগুলির মূল্য খুবই আপেক্ষিক, সেখানে তা সম্পূর্ণই বদলাতে হবে। সে মূল্য এমনই বদলে যাবে যে আর সাধারণ ভাষাই সেখানে খাটবে না। যদি দিব্যজীবনের সাধনায় প্রকৃতই নিজেকে সমর্পণ করো তাহলে পুরোপুরি ভাবেই আত্মদান করতে হবে, নিজের স্বার্থে কোনো কিছুই করবে না, যে দিব্যশক্তির কাছে সমর্পিত হয়েছ তারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে। এই পরিবর্তনে সবই তখন বদলে যাবে। এখনই যা আমি পড়েছি তা কেবল যোগসাধকদের পক্ষে, অন্যের কাছে এর কোনো অর্থ নেই, কিন্তু সাধকের তা অবশ্য-কর্তব্য। এ কয়দিনে যা বলা হয়েছে সে কেবল তাদেরই পক্ষে খাটবে। দুই নৌকাতে পা দেওয়া চলবে না, কারণ দুইয়ের গতি বিপরীত দিকে। এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "দুমুখো জীবন" এখানে চলেনা। হয় এটাকে নয় ওটাকে ছাড়তে হবে— দু ভাব রাখা চলবে না।

তার মানে কিন্তু এই নয় যে তোমার জীবনের যা বর্তমান অবস্থা তাকে বর্জন করতে হবে; কেবল সম্পূর্ণই বদলাতে হবে তোমার আভ্যন্তরীণ মনোভাবকে। যে কাজ তুমি করছ তাই করবে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ মনোভাব নিয়ে। জীবনের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে নির্জনে কোথাও গিয়ে যোগ করা বা কোনো আশ্রমে গিয়ে থাকা নয়। অবশ্য এটা ঠিক কথাই যে সংসারের মধ্যে থেকে যোগ করা অনেক বেশি কঠিন, কিন্তু তা হবে আরো সম্পূর্ণতর। কারণ প্রতি মুহূর্তে এমন সব সমস্যা আসবে যা কোনো ত্যাগী নির্জনবাসী যোগীর বেলাতে আসে না, তাদের বেলা প্রায় কোনো সমস্যাই থাকেনা। অপরপক্ষে জীবনের ক্ষেত্রে রয়েছে বহুরূপ বিপদবিপত্তি, বিশেষত প্রথম থেকেই তোমার প্রতিবেশীরা তোমাকে ভুল বুঝবে, সেদিক তোমাকে সামলাতে হবে· অসীম ধৈর্য ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তোমার যোগ সম্বন্ধে কে কি বলছে তা আদৌ গ্রাহ্যই করবে না, এই হবে প্রথম সত্রপাত। জগৎ কি ভাবছে বা কি বলছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে থাকবে। কারো মতামত যেন তোমাকে স্পর্শমাত্র না

করে। এই কারণেই ঘর ছেড়ে নির্জনে গিয়ে যোগ করার চেয়ে আপন পরিস্থিতির ভিতরে থেকে যোগ করা অনেক বেশি কঠিন। তাহলেও কিন্তু আমরা সহজ রকম কাজ করতে এখানে আসিনি—সহজ কাজ করুক সেই সব লোকেরা যারা রূপান্তর আনার কথা আদৌ ভাবে না।

প্রশ্ন : একজন অসৎ উপায়ে অনেক ধন অর্জন করেছে, তার কাছে কি ভগবানের কারণে অর্থ চাওয়া যায়?

উত্তর : শ্রীঅরবিন্দ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন যে অর্থ হলো নির্ব্যক্তিক শক্তি—কি উপায়ে তা অর্জিত সে তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাতে তোমার নিজের অনিষ্ট হতে পারে, অন্যেরও হতে পারে, কিন্তু তাতে অর্থের নির্ব্যক্তিক গুণের কোনো ইতরবিশেষ হয়না . অর্থ বর্ণবিহীন, আস্বাদবিহীন, কোনোরূপ মনস্তাত্ত্বিক চেতনা-বিহীন। সে কেবল এক শক্তি। যদি বলো যে একজন অসাধু ব্যক্তির নিঃশ্বাসবায়ু সাধু ব্যক্তির নিঃশ্বাসবায়ুর চেয়ে বিষাক্ত সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি বলি যে দুই বায়ুরই সমান গুণ। ব্যবহারিক কারণে তুমি চোরাই অর্থ নিতে নারাজ হতে পারো, কিন্তু দিব্য কারণ কিছু নেই। ওটা হলো নিছক মানবী মনোভাব। মানব-চেতনার দিক থেকে তুমি বলতে পারো, "না, তুমি যেভাবে ঐ অর্থ উপার্জন করেছ তা আমার খারাপ লাগছে, আমি ভগবানের নামে তা নিতে পারি না।" কিন্তু মনে করো (চরম দৃষ্টান্ত হিসাবে) একজন খুন করে অনেক টাকা পেয়েছে কিন্তু হঠাৎ তার মনে প্রবল ধিক্কার ও অনুতাপ হতে থাকায় সে বললে, "ঐ টাকা আমি নিজের জন্য রাখতে পারছি না, এটা আমি সেইখানে দিয়ে দিতে চাই যেখানে নির্ব্যক্তিক রূপে এর সদ্ব্যবহার হবে,"—এ কথা নিজের জন্য খরচ করার চেয়ে অনেক ভালো সংকল্প। তাই বলছিলাম, অসাধুতার অর্থ না নেওয়ার পক্ষে ব্যবহারিক কারণ থাকতে পারে, আবার তপস্যার দিক দিয়ে গভীরতর আধ্যাত্মিক কারণও (নৈতিক ছাড়া) না থাকতে পারে এমন নয়। তুমি বলতে পারো, "না, ঐ জঘন্য উপায়ে পাওয়া টাকা এখানে দিয়ে তোমার লাভ হবেনা, তুমি বরং ওটা যথাস্থানে ফিরিয়ে দাও।" সে ক্ষেত্রে ভালো কাজে দেওয়ার চেয়ে ফিরিয়ে দিলে তার উপকার হতে পারে। অতএব দেখতে পাচ্ছ যে এ বিষয়ে কোনো নিয়ম করা যায়না। বরাবরই তাই আমি বলি, নিয়ম করে কিছু বলা অসম্ভব। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। কিন্তু এ কথা ভেবোনা যে অর্থে কোনো দোষ স্পর্শায়; যে ভাবেই তা আসুক তাতে এই পার্থিব শক্তিকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করেনা। অর্থ একই ভাবে থাকে, তোমার নোটগুলি আর মোহরগুলি ঠিক তেমনি ভাবেই থাকে,

তার যা শক্তি তা সবাইই থাকে। যা কিছু ক্ষতি হতে পারে তা সেই ব্যক্তির যে তা অর্জন করেছে। এখন প্রশ্ন এই তোমার ঐ অসাধু ব্যক্তি কি কারণে কোন মনোভাব নিয়ে তার অর্থ দিব্যকর্মে দিতে চায়? তা কি স্বচ্ছন্দ ও নিশ্চিন্ত হবার জন্য আর নিজের বিবেককে শান্ত করবার জন্য? তা কিন্তু খুব ভালো অভিপ্রায় নয় এবং তার অনুমোদন করা যায়না। তবে তার কৃতকর্মের জন্য যদি যথার্থই দুঃখ ও অনুশোচনা হয়ে থাকে আর এই বোধ এসে থাকে যে অন্যায়ার্জিত অর্থ হতে নিজেকে বঞ্চিত করে তা যথাসম্ভব সৎকর্মে ব্যয় করা উচিত, তাহলে তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই। সাধারণভাবে এ বিষয়ে কিছু বলা যায় না, বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর তা নির্ভর করে। তবে তুমি যদি জানো যে অকথ্য উপায়ে যে অর্থসংগ্রহ করেছে তার কাছে দিব্যকর্মের জন্য কিছু চাইতে যাওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে তাকে সে বিষয়ে সমর্থন ও প্রশ্রয় দেওয়া হবে, সে কথা ঠিকই। তবে যদি কোনো কারণে সে আপনা হতেই দিতে চায়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করার কোনো হেতু নেই। কিন্তু সেখানে চাইতে যাওয়া অসম্ভব, কারণ তার কাজকে তাতে ন্যায্য বলা হবে। এতেই বিস্তর প্রভেদ।

আর সাধারণত এই সব ঠগ জুয়াচোরদের কাছে অর্থ চাওয়া হয়ে থাকে ভয় দেখিয়ে —বাস্তব ভয় নয়, কিন্তু ভবিষ্যৎ-জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে এই ভয়। সেটা ভালো নয়। এ ভাবে কখনই কোথাও চাইতে যাবে না।

প্রশ্ন অর্থশক্তি ভিন্ন আর কোন কোন দিব্যশক্তিকে এখানে "নিয়োগ" করা হয়েছে?"

উত্তর সকল শক্তিকেই। দিব্যশক্তি মাত্রই এখানে অভিব্যক্ত হয়ে বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে—আলো, প্রাণ, প্রেম,শৌর্য, সদ্গতি, আনন্দ—সকল কিছুই, সবগুই, এমন কিছু নেই যা মূলত: দিব্য নয় এবং যা সম্পূর্ণ বিকৃতিপ্রাপ্ত ও মেকি হয়নি। সেদিন এ সম্পর্কে বলেছিলাম যে দিব্যপ্রেম কেমনভাবে বিকৃত হয়ে এখানে অভিব্যক্ত হচ্ছে, এও সেই একই কথা।

প্রশ্ন অর্থকে মায়ের জন্য কিরূপে পুনর্মথন করা যায়?

উত্তর ও...তারও কিছু নির্দেশ এখানে আছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তিনটি জিনিস হলো পরস্পরনির্ভর—ক্ষমতা, অর্থ, যৌনতা। আমি মনে করি এই তিনটিকেই আগে জয় করতে হবে—একটিকে জয় করতে চাইলে অন্য দুটিকেও সেই সঙ্গে জয় করা দরকার। ক্ষমতার কামনা, অর্থের কামনা, যৌনের কামনা, তিনরূপ কামনাকে

যশ করতে না পারলে কোনো জয়ই তোমার মজবুত ও স্থায়ী হবেনা। জগতে বর্তমানে অর্থকে যে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় তা কেবল অর্থের কারণেই নয়, কেবল কয়েকজন মাথাপাগলা ব্যক্তি যারা স্তূপাকারে ধনসঞ্চয় করে এবং সেগুলি কেবল গুণে গুণেই খুশি থাকে তারা ভিন্ন সকলেই অর্থ চায় নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, এবং সেগুলি সবই পরস্পরনির্ভর : কামনার জগতে ঐ তিনটি জিনিসের স্বতন্ত্র মূল্য কম, প্রত্যেক কামনাই নির্ভর করে অপর দুটির উপর। আমি তোমাদের বলেছিলাম অন্তর্দর্শনে এক কালো সাপ দেখার কথা, যে পৃথিবীর ধনরত্নকে পাহারা দিচ্ছে, সে চেয়েছিল যৌনতার উপর প্রভুত্ব পেতে। কারণ কোনো কোনো তন্ত্রে বলে যে ক্ষমতা অর্জন করতে চাওয়া হয় এই যৌনেরই তুষ্টির জন্য, আর যৌন জয় করা হলে তখন ওটাও মানবচেতনা থেকে ছেড়ে যায়, ক্ষমতা ও অর্থের আকাঙ্ক্ষা তখন আপনা হতেই বিলীন হয়। মানব জীবনে প্রধান বাধা ঐ তিনটি, ওগুলি জয় না হলে মানুষের পরিবর্তন আসা দুষ্কর।

প্রশ্ন : কেবল ব্যক্তিগতভাবে কামনা জয় করলেই কি তাতে কাজ হবে, না সমগ্রভাবে সকল জনের মধ্যেই তা হওয়া দরকার?

উত্তর : হাঁ, এ একটা কথা...সকলের দিক থেকে একটুও তফাৎ না হলে কি ব্যক্তির পক্ষে পূর্ণ রূপান্তর আসা সম্ভব? ...আমার মনে হয় তা সম্ভব নয়। ব্যক্তি আর গণের মধ্যে এমন যোগাযোগ রয়েছে যে সেই কারণেই সন্ন্যাসীরা প্রচার করে, সংসার যেমন আছে তাকে তেমনি ফেলে রেখে তুমি জগৎ ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাও, বাকী সব কিছুর ভার অন্যদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজে তুমি নিজেকে নিয়ে সরে পড়ো, তা যদি না করো...তবে তাতেও আমার সন্দেহ আছে। সমগ্রের মধ্যে যদি একটুও কিছু পরিবর্তন না আসে তাহলে ব্যক্তিসত্তার রূপান্তর কি পূর্ণমাত্রাতে সম্ভব হবে? আমার তা মনে হয়না। মানব-প্রকৃতি যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল—সে স্থলে তুমি চেতনার পরিবর্তন যথেষ্টই আনতে পারো, তোমার চেতনাকে নিষ্কলুষ করে তুলতে পারো, কিন্তু যেটা সমূহ বিজয়, জড়ের রূপান্তর, তা অনেকটাই নির্ভর করবে গণচেতনার কিছুটা উন্নতির উপর। বুদ্ধ ব্যক্তিগতভাবেই বলতেন যে তোমার মধ্যে যতক্ষণ কামনার স্পন্দন রয়েছে, সে স্পন্দন সারা জগতে ছড়াতে থাকবে এবং যারই কিছু গ্রহিষ্ণুতা থাকবে সেই তাকে গ্রহণ করবে। তেমনি তোমার মধ্যে যদি সে গ্রহিষ্ণুতা থাকে তাহলে যে সকল কামনাস্পন্দন জগতে নিত্য ঘুরে বেড়ায় তা তোমারও মধ্যে প্রবেশ করবে। তাই তিনি বলেছেন,—বেরিয়ে এসো এই মিথ্যা মায়ার ভিতর থেকে, নিজেকে সব থেকেই সরিয়ে নাও,তাহলেই তোমার মুক্তি। কিন্তু

আমার মনে হয় এ অপেক্ষাকৃত স্বার্থপরের মতো কথা, যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত এই সীমাংসাই দেখেছিলেন। আরো এক উপায় আছে তুমি নিজেকে দিব্যশক্তির সঙ্গে এমন ভাবে একাত্ম করে নাও যাতে চেতনভাবে নিত্য জগতের সকল স্পন্দনের উপর সেই ভাব নিয়ে ক্রিয়া করতে পারো। যখন কোনোই অকাম্য স্পন্দন তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম হবে, বরং তুমিই তার উপর নিজের প্রভাব প্রয়োগ করবে, অর্থাৎ সেই অকাম্য স্পন্দন তোমার মধ্যে ঢুকে ক্রিয়া করবার পরিবর্তে তুমি তৎক্ষণাৎ তাকে লক্ষ্য করে তাকেই রূপান্তরিত করে দিতে পারবে, তখন সেই রূপান্তরিত স্পন্দন জগতে ফিরে গিয়ে মঙ্গলকরভাবেই কাজ করতে থাকবে এবং সকলকে তাই উপলব্ধির জন্য প্রস্তুত করে তুলবে। ঠিক এই জিনিসটাই শ্রীঅরবিন্দ সার্থক করে তুলতে চান, এবং সুস্পষ্টভাবে তাই তোমাদের করতে বলেন।

ছেড়ে পালিয়ে না গিয়ে তোমার মধ্যে সেই শক্তিকে টেনে আনো যা সর্ব্বজয়ী।

কিন্তু জেনে রেখো, এমনি ব্যবস্থা করা আছে যে একটুকুও দুরাকাঙ্ক্ষা যদি তোমার থেকে যায়, সেই শক্তিকে যদি চাইতে যাও আপন ব্যক্তিগত কিছু কারণে, তাহলে তা কখনই তোমার কাছে ঘেঁসবে না। প্রাণের জগতে ও বস্তুর জগতে যে সব সীমাবদ্ধ বিকৃত রূপ তার দেখা যায়, সে জিনিস তুমি পেতে পারো এবং অনেকের মধ্যেই তা আছে; কিন্তু খাঁটি যে শক্তি, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেন "অতিমানস" শক্তি, তা কিছুতেই অভিব্যক্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার অহং সর্বাংশে ও সম্পূর্ণরূপে বর্জিত না হচ্ছে। সুতরাং সেখানে কোনো অপপ্রয়োগের আশংকা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মধ্যে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ অনাসক্তি পুরোপুরি ভাবেই না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার সত্তার মধ্যে সে শক্তি অভিব্যক্তই হবেনা। আমি তোমাদের বলে দিয়েছি, শ্রীঅরবিন্দ আমাদের মধ্যে সেই জিনিসই আনতে চান :—তোমরা বলবে সে তো খুব কঠিন কথা, কিন্তু আমি আবার বলি, সোজা কাজ করতে আমরা আসিনি, কঠিন কাজ করতেই এসেছি।*

* S. A. I. C. E. Bulletin থেকে। অনুবাদক—পঙ্কজিনী চট্টোপাধ্যায়

প্রসঙ্গত

১২২

তোমার মতের নির্বোধ দাস হতে যদি না চাও, তাহলে আগে দেখ যে তোমার সে ভাবনার মধ্যে সত্য কোথায়, তার পরে খোঁজো যে তার বিরুদ্ধ মতের মধ্যে সত্য কোথায়; শেষে খুঁজে বের করো যে দুটির মধ্যে পার্থক্যের কি কারণ এবং কোথায় ভগবানের সেই চাবিকাঠি যার দ্বারা দুইএর মধ্যে সঙ্গতি ঘটতে পারে।

১২৩

কোনো একই মত সত্যও নয় মিথ্যাও নয়, কেবল তা জীবনের ক্ষেত্রে হয় কার্যকর অথবা অকার্যকর; কারণ তা সৃষ্ট হয় কালানুযায়ী, সে কাল পার হয়ে গেলে তার ফলও থাকে না মূল্যও থাকে না। সুতরাং মতের উপরে উঠে গিয়ে জ্ঞানের সন্ধান কর।

১২৪

মতকে লাগাও জীবনের কাজে; কিন্তু তা যেন আত্মাকে শৃঙ্খলে না বাঁধে।

১২৫

প্রত্যেক নিয়ম, উপকারীই হোক বা অত্যাচারীই হোক, নিশ্চয় তার একটা বিপরীত নিয়ম থাকবে যার দ্বারা তাকে খণ্ডানো যাবে, বদলানো বা নাকচ করা যাবে।

(মা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন)

আমি দেখছিলাম যে মতামত কিভাবে কাজের হতে পারে...শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, তা কার্যকরী বা অকার্যকর,—কিসে তা কার্যকর হয়?

প্রশ্ন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তা কিছুকাল কার্যকরী হয়।

উত্তর: না, সেটাই আমি অস্বীকার করি; লোকে যে আপন মতানুযায়ী কাজ করে তার কোনো দাম নেই। আমি নিত্যই অনেকের কাছ থেকে চিঠি পাই তারা কিছু একটা করতে চাইছে অথবা চাইছে না, তার মধ্যে তারা বলে, "এই আমার নিজের মত, এটা ঠিক, ওটা ঠিক নয়", আর অধিকাংশই শতকরা নিরানব্বুইএরও বেশি স্থলে সেটা ভুল কথা হয়, নিতান্ত বোকামি করা হয়।

স্পষ্টই দেখা যায়—হাঁ, প্রত্যক্ষ দেখাই যায় যে—বিপরীত মতেরও সমান দাম, শুধু এক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন, এই পর্যন্ত। তার সঙ্গে স্বভাবতই মিশ্রিত হয়ে থাকে ব্যক্তিগত অহংএর যেটা পছন্দ : তুমি পছন্দ করো যে এই ভালো, তাই মতও হয় তদনুরূপ।

প্রশ্ন : কিন্তু আমার ক্রিয়ার জন্য যতক্ষণ উচ্চতর আলো না পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নিজের মতানুযায়ী চলতেই তো আমি বাধ্য হই।

উত্তর : মতের চেয়ে জ্ঞান ভালো—অর্থাৎ সকল সম্ভাবনার কথা বুঝে, প্রশ্নটার সকল দিক দেখে তারপর যতটা সম্ভব স্বার্থশূন্য হয়ে স্থির করা,—যেমন কোনো কাজের বেলাতে, তা অধিকাংশ লোকের উপকারে আসবে কিনা অথবা যথাসম্ভব কম ক্ষতি হবে কিনা, এবং সর্বাপেক্ষা যা গঠনমূলক হবে ; এমন কি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ছেড়ে দিয়ে ব্যবহারিক প্রয়োজন ও নিঃস্বার্থতার দিক থেকেও মতের বদলে জ্ঞানের পথে কাজ করাই ভালো।

প্রশ্ন : তা বুঝেছি, কিন্তু যখন আলো কিছু পাচ্ছিনা তখন নিজের মত বা অহংকে মিশ্রিত হতে না দিয়ে কাজ করার সঠিক উপায় কি হবে?

উত্তর সমস্যাটির সকল দিক বিবেচনা করে যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে তোমার চেতনার সামনে উপস্থিত করবে এবং দেখবে যে কোনটা করা ভালো (যদি সম্ভব হয়), অথবা যদি খারাপ ফল আসতে পারে দেখ তাহলে তা যত কম হয় তাই করবে।

প্রশ্ন : আমি জানতে চাইছিলাম যে কেমন ভাব নেওয়া ভালো? তার মধ্যে মাথা গলাতে যাওয়া ভালো অথবা উদাসীন মনোভাব রাখা ভলো? কোনটা ঠিক?

উত্তর হাঁ, যেখানে ঠিক কাজটি সম্বন্ধে তুমি খুবই সুনিশ্চিত সেখানে মাথা গলাতে পারো ; তবে সুনিশ্চিত হওয়া চাই যে তোমার দৃষ্টি অন্যের বা অন্যেদের চেয়ে বেশি বড়ো আর বেশি সঠিক। তবে সহজে মাথা না গলানোই বুদ্ধিমানের কাজ—লোকে অথথা তাই করে থাকে, পরের ব্যাপারে উপরপড়া হয়ে মত দেওয়া তাদের এক অভ্যাস।

সঠিক ক্রিয়া সম্বন্ধে তোমার ঠিক দৃষ্টি থাকলেও মাথা গলানো অধিকাংশ স্থলেই অনুচিত। কেবল কেউ যদি এমন কিছু করতে যাচ্ছে যাতে বিপর্যয় ঘটবে দেখ, সেখানে তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। (হেসে) সেখানেও কিন্তু তাতে কাজ হয়না।

বস্তুত কেবল সেখানেই তা করা যেতে পারে যেখানে তোমার সত্যদৃষ্টি সম্বন্ধে তুমি নিঃসন্দেহ। শুধু তাই নয়, যেখানে দেখবে যে ফল খারাপ হতে যাচ্ছে। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হলে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হওয়া চাই, এবং তোমার মধ্যে যথেষ্ট সহানুভূতি ও কারুণ্য থাকবে। এমন কি তোমার এমন দৃষ্টি থাকবে যাতে তুমি জানো যে তোমার হস্তক্ষেপে অন্যের ভাগ্যে কি ঘটবে। লোকে সহজেই উপদেশ দিতে যায়, "এটা করো, ওটা কোরোনা"। আমি দেখেছি যে তারা কতটা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তাদের নেই। হাল্কা ও বিশৃঙ্খলা তারা আরো বাড়িয়ে দেয়। কখনো বা কোনো ব্যক্তির স্বাভাবিক উন্নতির সম্বন্ধে তারা ক্ষতিই করে।

আমি বলি যে মতামত দিতে যাওয়া সর্বদাই বিপজ্জনক ও সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

অন্যের ব্যাপারে কখনই কিছু বলতে যেওনা, যদি প্রথমে নিশ্চিত না জানো যে তুমি তার চেয়ে অনেক-বেশি জ্ঞানী (অবশ্য সকলেই নিজেকে বেশি জ্ঞানী ভাবে), কিন্তু সেটা নিজের মতে নয়, বাস্তবিকই যদি তাই হও। যদি তুমি তার দেখার চেয়ে ভালোভাবে দেখতে পাও, আর তুমি সকল আবেগের, সকল কামনার, অন্ধ প্রতিক্রিয়ার অতীত হও। তবেই তোমার অন্যের জীবনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে—যদি সে নিজে এ বিষয়ে তোমার সাহায্য চায়। সে যদি তা না চায় তাহলে যেচে পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার তোমার অধিকার নেই।

(মা ধ্যানস্থ হয়ে অনেকক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন)

আমি একটা নজার চিত্র দেখলাম। যেন পাহাড়ের একটা উঁচু খাড়াই, তার গা বেয়ে কেউ উঠছে (মানুষের প্রতিরূপ)। আশ্চর্য, এই জিনিসই দেখতে পেলাম অনেকবার। এই সকল সত্তার পরণে বস্ত্র নেই অথচ এরা উলঙ্গ নয়, অর্থাৎ একরকম আলোর আবরণে ঢাকা। সে আলো জ্যোতির্ময় নয়, একটা বায়বীয় আচ্ছাদনের মতো। দেহ থেকেই নির্গত একটা স্বচ্ছ আবরণকোষ বলা যেতে পারে। তার ভিতর থেকে আকৃতি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু উলঙ্গ নয়। আর উপরের আকাশ থেকে—নীচের থেকে উপর পর্যন্ত সে এক বিরাট আকাশ (পরিষ্কার ছবির মতো স্বচ্ছ জ্যোতির্ময় আকাশ)—সেখান থেকে নেমে আসছে অসংখ্য পাখির মতো জিনিস, সেগুলো উড়ে আসছে ওরই দিকে আর ও যেন তাদের আকর্ষণ করে নিচ্ছে। মোটের উপর সমস্তটা হাল্কা নীল ও শুভ্র; থেকে থেকে দেখা যাচ্ছে এক একটা ডানার প্রান্ত বা পর্বতের চূড়া, কতক বা অন্ধকার, কিন্তু তা দৈবাৎ। সেগুলো শত শত সংখ্যায় উড়ে এলো, তার পর সেই ব্যক্তি তাদের টেনে নিয়ে পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে দিলে (সে নিজে দাঁড়িয়েছিল খাড়াইএর উপর), —সবই ছড়িয়ে দিলে সে নীচেকার উপত্যকায়। আর সেগুলো শেষে হয়ে দাঁড়ালো

(মা হাসলেন)...কেবল মত মতামত। সবস্তই শুধু মতামত। কতক বা গাঢ় রং,... কতক বা হাল্কা রং, কতক বাদামি, কতক নীল।

তারা যেন একরকম পাখি, ঐভাবে পৃথিবীতে এলো। যদিও এটা চিত্র মাত্র— ঠিক চিত্র নয়, কারণ সবই তো গতিশীল। মজার জিনিস।

সে বললে, "এই দেখ, এমনি করে মতামত তৈরি হয়।" কিন্তু তা এলো বিরাট আকাশ থেকে, বিরাট স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ময়—নীল সাদা বা গোলাপী নয়...শুধু জ্যোতির্ময়। আর সেই আকাশ থেকে এলো শত শত নর হাজারে হাজারে ঐ সব জিনিস, সে ব্যক্তি তাদের গ্রহণ করলে, আর হাত নেড়ে নেড়ে পৃথিবীতে ছড়ালে...তাই হলো সব মতামত। ব্যাপার দেখে আমি হাসলাম।

আশ্চর্য এ ব্যাপার। সবই নেবে এলো পৃথিবীতে।

মতামতও আসে আলোর আকাশ থেকে। (মা হাসলেন)

বস্তুত বলা কথার চেয়ে চিত্রে বেশি প্রকাশ করা যায়।*

---

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

পথের কথা

সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৬৬

প্রশ্ন : যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ কেন হয়? কষ্ট মোচানো যায় কেমন করে?

উত্তর : সম্প্রতি বহুদিন থেকে একটা খুব সুস্পষ্ট ও তীব্র অনুভূতি আসছে যে দিব্যশক্তির ক্রিয়াই পর্যবসিত হয়ে থাকে তথাকথিত কষ্টভোগ ও ব্যথা-বেদনাতে, যেহেতু এভাবে নাড়া দিলে তবেই জড়কে তার জড়তার ভিতর থেকে টেনে তোলা যাবে।

পরিবর্তন যে শান্তি ও স্থিরতা, তাই বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে জড়তায় ও "তমসে", আর যেহেতু তা মূল শান্তি ও স্থিরতারই বিকৃত রূপ, তাই আর তার কোনো নড়চড় নেই : সেখানে দরকার তাকে জোরে নাড়া দিয়ে আবার জাগিয়ে তোলা, তবেই সে ঐ "তমসের" ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে, নতুবা সরাসরি কোনোমতে সে "তমস্" থেকে শান্তির অবস্থাতে আসবেনা ; কিছু একটা করা দরকার ঐ "তমস্"কে নাড়া দেবার জন্য, তারই ফল বাহ্যভাবে দেখা দেয় যন্ত্রণা ও ব্যথাবেদনাতে।

আমি এখানে দৈহিক ব্যথার কথাই বলছি—কারণ প্রাণ মন ও আবেগাদির তরফের যে সব বেদনা—সেগুলো হয় কেবল মনের ভুল ক্রিয়ার দোষে—সেগুলিকে একত্রে নিয়ে বিধ্যাবর্গের তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু দৈহিক যন্ত্রণা আমার কাছে বোধ হয় শিশুকে পীড়ন করার মতো,—কারণ এখানে ঐ জড়ের ক্ষেত্রে যা মিথ্যা তা দাঁড়িয়েছে অজ্ঞানতায়, অর্থাৎ কোনো বদ্ ইচ্ছা ওখানে নেই—কেবলই আছে জড়তা ও তার অজ্ঞানতা : সত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞান, সকল সম্ভাবনা সম্বন্ধে অজ্ঞান, এমন কি ব্যথাকে কেমন করে এড়াতে হবে সে সম্বন্ধেও অজ্ঞান। সেই অজ্ঞানতা রয়েছে সর্বত্র প্রতি কোষে কোষে, এবং কেবল অনুভূতির সাড়াতেই—যে অনুভূতি অন্তরিতমাত্র চেতনার কাছে কেবল ব্যথারূপেই সাড়া দিতে পারে—তার দ্বারাই পারে তাকে জাগাতে, তখন কেমন করে তা সারানো যায় সেদিকে চেষ্টা জাগে, কেমন করে নিজেকে রূপান্তরিত করা যায় সেদিকে চেষ্টা জাগে।

সেই জিনিসই এখন সুনিশ্চয়তায় এসে গেছে। কারণ সকল কোষের মধ্যে জন্মেছে এই আশঙ্কা, যা উত্তরোত্তর প্রবলতর হচ্ছে, এবং তাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দেখছে যে যখনই কোনো ক্রিয়া বিকৃত হচ্ছে (অর্থাৎ স্বাভাবিক ও সাবলীল ক্রিয়ার বদলে তা কষ্টপূর্বক করতে হচ্ছে এবং বোধ হচ্ছে যে কোনো বিপরীত ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে, যদিও বাস্তবিক তা নয়, এ কেবল তার নিজেরই একটা অবুঝ

অজ্ঞানতার সংকোচ)—তখনই সেই আশ্পৃহার তীব্রতা ও সাড়া বেড়ে যাচ্ছে দশ গুণ ও তা হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু সেই তীব্রতাকে বরাবর সমানে বজায় রাখা কঠিন; সাধারণত তার চড়া সুর নেমে গিয়ে, ঠিক তন্দ্রাভাব নয়, কিন্তু একটা শৈথিল্য এসে পড়ে; একটা সহজ করে নেওয়ার ভাব এসে পড়ে; কেবল যখন ভিতরের বিশৃঙ্খলা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে তখনই আশ্পৃহার তীব্রতা বাড়ে ও তা স্থায়ী হয়। কোনোরূপ শৈথিল্য না এসে ঘন্টার পর ঘন্টা সেই আশ্পৃহা, সেই ব্যাকুল আহ্বান, ভগবৎমিলনের ও ভগবৎসাযুজ্যের সেই ইচ্ছা চরম অবস্থাতেই থাকে—কিন্তু তা কেন হয়? কারণ বাইরের দিকে রয়েছে একটা শারীরিক বিপর্যয়, এবং তার তীব্র যন্ত্রণা রয়েছে। নতুবা যখন তেমন যন্ত্রণা কিছু নেই, তখন সময় সময় তুমি উপরে উঠে যেতে পারো, আবার এলে গিয়ে নীচে নেমে এসো, আবার উপরে ওঠো এবং নামো, এ জিনিসের শেষ হয়না। চিরন্তন এই চলতে থাকে। আমরা যদি তাড়াতাড়ি কাজ চাই (আমাদের জীবনের ছন্দের অনুপাতে) তাহলে সেখানে চাবুকের আঘাত দরকার। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, কারণ যখনই তুমি আভ্যন্তর সত্তার মধ্যে থাকো, অমনি ব্যাপারটিকে দেখতে থাকো অবজ্ঞার চোখে (নিজের সম্পর্কে)।

অতঃপর হঠাৎ যখন আসে প্রকৃত দিব্যপ্রেমের অনুকম্পা, আর ওদিকে রয়েছে এই সব বীভৎস বিচিত্র অস্বাভাবিক ব্যথাবেদনা সকল প্রাণীর ও এমন কি সকল বস্তুরও মধ্যে—তখনই স্নেহসত্তার মধ্যে জেগে ওঠে আশ্পৃহা, তাকে জুড়িয়ে দেবার, আরাম করে দেবার, মুছে ফেলে দেবার জন্য আশ্পৃহা। দিব্যপ্রেমের মূল উৎসে এমন কিছু আছে যা নিত্য রূপায়িত হচ্ছে কৃপার ক্রিয়াতে, যা মধুময় এক শক্তি, সান্ত্বনার অপূর্ব স্পর্শ স্পন্দনের মতো, সর্বত্রই রয়েছে ব্যাপ্ত হয়ে, যাকে কেবল কোনো জ্যোতির্ময় চেতনা পারে যথাস্থানে প্রযুক্ত করতে; আর আমি দেখতে পেলাম যে এই স্থলেই চিন্তাকে দিয়ে প্রকৃতভাবে পারা যায় এই কাজে লাগাতে; চিন্তাই পারে বাহক হয়ে ওকে প্রয়োজনের স্থানে নিয়ে গিয়ে হাজির করতে। সেই মধুর শক্তি, সেই মাধুর্যের অপূর্ব স্পন্দন জগতের উপর ছড়িয়ে আছে এক স্থিতিশীল অবস্থাতে, তাকে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে, কিন্তু তার ক্রিয়া একেবারে নির্ব্যক্তিক,—কেবল এমন চিন্তা, যা জ্যোতির্ময় ও সমর্পিত, যে চিন্তা এখানে কেবল যন্ত্রস্বরূপ, যে চিন্তা নিজে কিছু না করে উচ্চতর চেতনার দ্বারা চালিত হচ্ছে—সেই চিন্তাই মাধ্যমস্বরূপ হয়ে সেখানে যোগাযোগ ঘটায় এবং ঐ নির্ব্যক্তিক শক্তিকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রযুক্ত করে।

সুনিশ্চিত ভাবে এ কথা বলা যায় যে প্রত্যেক অশুভ মাত্রেরই সাথে সাথে থাকে তার প্রতিকার। সকল ব্যথারই সাথে সাথে থাকে তার আরোগ্য। সুতরাং অশুভকে "অযথা" বা "অর্থহীন" হিসাবে দেখবে না, যা সাধারণত ধরে নেওয়া হয়,—দেখবে

যে উন্নতি ও ক্রমবিকাশের কারণেই এসেছে দুঃখভোগ, সেটাই তার অস্তিত্বের হেতু, সে এনে দেবে তার অভীপ্সিত ফল এবং সেই সঙ্গে কষ্টভোগও থাকবে, যদি তুমি নিজেকে উন্মীলিত করে দিয়ে সেটা গ্রহণ করতে পারো। এই তিন ব্যাপার, উন্নতির জন্য কষ্টভোগ, উন্নতি আসা, ও সঙ্গে সঙ্গে কষ্টের নিরাময় হওয়া এগুলি পরস্পরে একত্রেই হয়ে থাকে, অর্থাৎ একটার পর অন্যটা নয়, সবই হয় এককালে।

যে সময়ে রূপান্তরকারী ক্রিয়া কষ্টভোগ ঘটালে, তখন যদি সেই কষ্টজনক অংশের মধ্যে যথেষ্ট আস্পৃহা ও উন্মীলন থাকে, এবং সেই সঙ্গে তার ওষুধও পড়ে, তাহলে তার যা ফল হয় তা পুরোপুরি রকমের ও সামগ্রিক : রূপান্তর এসে পড়া ও সেই সঙ্গে তার ক্রিয়ার সাথেই আসে প্রতিরোধের কারণে যে মিথ্যা কষ্টভোগ হচ্ছে তার নিবারণ,... তখন সকল কষ্টের পরিবর্তে আসে এমন কিছু যা পৃথিবীতে অজ্ঞাত, যা আনন্দ স্বাচ্ছন্দ্য আস্থা ও নিরাপত্তার সমজাতীয় জিনিস। সে এক পরম অনুভূতি, পূর্ণ শান্তির অনভূতি, এমন কিছু যা কেবল চিরন্তনই হতে পারে। যাকে বলে "আনন্দের সারবস্তু", এ কেবল তার কিছু অর্থপূ বিশ্লেষণ।

আমার মনে হয় যে সর্বকালেই এ কথা আংশিকভাবে ও মাঝে মাঝে চকিতের ন্যায় অনুভূত ও অবজ্ঞাত হয়ে এসেছে, কিন্তু এখন পৃথিবীতে প্রায় সুস্পষ্টতর ও ঘনীভূত ভাবে ঘটতে শুরু করেছে। কিন্তু স্থূল স্নায়ুকোষগুলি নতুন রকমের স্পন্দনের আশংকাতে, ভয়ে বা উদ্বেগে নয়, কিন্তু অস্থিরতা হেতু তার গ্রহিষ্ণুতা সংকুচিত হচ্ছে (সেটা ঠিক ব্যথা নয়, অস্বাচ্ছন্দ্য), সেই আশংকা যখন আস্পৃহার দ্বারা ও পূর্ণ সমর্পণের দ্বারা খণ্ডিত হবে, তখন ঐ ভাব ঘুচে গিয়ে দেখা দেবে পরম স্বাচ্ছন্দ্য।

এ সমস্তই হলো চেতনাক্রিয়ার আণুবীক্ষণিক পরিচয়, মনের ক্রিয়া এতে কিছুমাত্র নেই। তবে শব্দে ও বাক্যে প্রকাশ করতে গেলে মনের দিকের কথাই এসে পড়ে, কিন্তু অনুভূতির মধ্যে তার অস্তিত্ব নেই। এটা খুবই উল্লেখযোগ্য। কারণ খাঁটি অনুভূতির মধ্যে থাকে সত্য, সেখানে মনের হস্তক্ষেপ ঘটবামাত্র তা লোপ পেয়ে যায়। তাই প্রকৃত যা বাস্তব তা সকল প্রকাশের বাইরে। যেমন কোনো মানুষ ও তার ছবিতে যতখানি তফাৎ এও তাই, একটা হলো সত্যবস্তু আর অন্যটা তার কাহিনী। এমনিই হয়। কিন্তু এ ব্যাপার তার চেয়েও সূক্ষ্ম।

এখন আমরা যে কথা বলছিলাম সেই কথাতে ফিরে আসি,—সেই অনুকম্পা শক্তির প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে যখন তুমি চেতন হবে—তখন দেখবে যে কেমন ক'রে তা চেতন ব্যক্তির ভিতর দিয়ে কাজ করে, তখন তোমার সমস্যারও চাবিকাঠি মিলে যাবে।*

---

* BULLETIN OF S. A. I. C. E.-থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দের যোগ*

সুধা বসু

(৬)

এবার গুরুর কথা। গুরু সম্বন্ধে প্রথমেই আমাদের মনে রাখা দরকার যে তিনি আমাদের মনের মানুষ। আমাদের প্রাণের মধ্যেই তাঁর আসল পরিচয়। তাই বাইরে যখন গুরু আসেন অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যেতে, তখন তাঁকে দেখি আমারই অন্তরতম নেদিষ্ঠ যে ভাবরূপ, তারই মহান বিগ্রহরূপে। বৈষ্ণব কবির ভাষায় তখন বলি—"হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির"। গুরুর সঙ্গে এই প্রাণের ও প্রেমের সম্পর্কটি প্রায়ই প্রথম দর্শনে ধরা পড়ে।

গুরুবাদ আমাদের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। উপনিষৎ আমাদের যে আচার্যের কথা শুনিয়েছেন, তিনি ব্রাহ্মী তত্ত্বদর্শী শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। অন্তেবাসী শিষ্যের কাছে তিনি গূঢ়তম রহস্য ব্যক্ত করে দিচ্ছেন যেন এক লোকোত্তর আবেশে। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শিষ্যকে সমিৎপাণি হয়ে তাঁর কাছে যেতে হবে। গুরুশিষ্যের এই অপূর্ব মিলনটি সংঘটিত না হলে তত্ত্বজ্ঞান ঠিকভাবে স্ফুরিত হবে না। এর পরিচয় উপনিষদের বহু আখ্যানে আমরা পাই। অধ্যাত্মসাধনার পথে গুরু যে অপরিহার্য এই ধারণাই আমাদের মনে বদ্ধমূল।

কিন্তু আধুনিক যুগে গুরুর আবশ্যকতা নিয়ে অনেক কারণে প্রশ্নও জেগেছে। এই নিয়ে সংশয় ও দ্বিধা রবীন্দ্রনাথ নিজেই আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে তাঁকেও আমরা "গুরুদেব" বানিয়ে ছেড়েছি। 'চতুরঙ্গে' খোলাখুলিভাবেই গুরুবাদ নিয়ে অনেক বিতর্ক তিনি তুলেছেন এই বলে,—যে গুরুর নয়, দেবতার পথই মানুষকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন "কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু, শুধাব না কোন পথিকে"। এইভাবে গুরু ও ইষ্টের মধ্যে এক বিরোধ রবীন্দ্রনাথ নিজেই সৃষ্টি করেছেন। মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত মনে এ দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক নিয়মেই আসে যে ভগবানকে চাই, কিন্তু তার জন্য গুরুর দরকার আছে কিনা এবং নির্বিচারে তাঁর আদেশ পালন করাও মেনে চলা আদৌ সম্ভব কিনা। বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের দেশে নানা কারণে গুরুবাদ এক বিরাগ ও বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা ভিত্তিহীন

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

কিনা সে সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু সমাধান বিশ্লেষণ করে আমাদের দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। তা করতে হলে গুরুর স্বরূপ নির্ণয়ের অধিকার এবং গুরুবাদই বা কি—এগুলি বিশ্লেষণ করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ গুরু ও শিষ্য দুয়েরই বিচার করেছেন।

গুরুবাদের মত অধিকারবাদও প্রাচীন বিধি। প্রত্যেকের অধিকার ও সম্বন্ধ ভিন্ন। রামকৃষ্ণদেব বলতেন "যার পেটে যেমন সয়"। ধর্মাচরণ সকলের সমান হতে পারে না। অধিকারভেদে অতি উত্তম অধিকারীর পক্ষে মানুষ-গুরুর প্রয়োজন নাও হতে পারে। সত্য তার কাছে স্বপ্রকাশ। সে সব কিছু তার নিজের বা আত্মার ভিতর হতেই লাভ করে। বাহিরের কোন আলম্বনের প্রয়োজন তার নাও হতে পারে। মধ্যম অধিকারীর থাকে এক তীব্র ব্যাকুলতা। ছুঁই ছুঁই করেও যেন অন্তরের সত্যকে ঠিক ধরতে না পেরে সে খুঁজে বেড়ায় কিন্তু পথ বলিয়ে দিলেই দেখতে ও বুঝতে শেখে। আর—অধমের পথ সুদীর্ঘ। তার আশ্রয় বা আলম্বন না হলে চলেনা। তাকে পথ দেখিয়ে-দেখিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বলা বাহুল্য বেশীর ভাগ সাধকই এই পর্যায়ের। কাজেই অধিকারভেদে গুরুর স্বরূপও তিন ভাবে বুঝে নিতে পারি। উত্তমের তত্ত্বরূপ গুরু, মধ্যমের গুরু ভাবরূপ আর অধমের চাই বিগ্রহরূপ গুরু, এটা হল গোড়ার কথা। কিন্তু অধ্যাত্মজগতে এ ক্রমগুলির অদলবদল হয়। বিগ্রহের মধ্যেই তত্ত্ব ও ভাবের প্রকাশ ঘটে।

শ্রীঅরবিন্দ প্রথম তত্ত্বরূপী জগদ্‌গুরুর কথাই বলছেন, পতঞ্জলি যাকে বলেছেন ঈশ্বরগুরু। গুরুবাদের দার্শনিক ভিত্তিও এতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরই সকলের গুরু, যাঁকে কোনকালেই ক্লেশ, কর্ম, বিপাক বা আশয় স্পর্শ করতে পারে না। কোন কালের দ্বারা ঈশ্বরগুরুকে পরিচ্ছিন্ন করা যায় না—"স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"। কাজেই তাঁর গুরুগিরিতে কোন কালেই ছেদ পড়ে নি। আমরা ক্লেশ কর্ম বিপাক এবং আশয়ের দ্বারা গ্রস্ত হয়ে আছি। এ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাতে পৌঁছাব সেই তত্ত্বই গুরু। সেই লক্ষ্য, সেই আদর্শই ঈশ্বর—"ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"।

ঈশ্বরই গুরু এই যখন বলা হয়, তখন সে যেন জ্ঞানের দিক দিয়ে দেখা। আবার ভক্তির অঙ্গনে দেখে এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলা হয় যে, গুরুই তো ঈশ্বর। সেটা ভাবের কথা। ঈশ্বরগুরু বা জগদ্‌গুরুর সঙ্গে জীবের এক সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে। সেটা বুঝতে পারলে সেটাই হয় সত্যকার গুরুশিষ্যের সম্পর্ক। পূর্ণযোগের সাধকের প্রাণের মধ্যে এই প্রজ্ঞার ও প্রেমের সম্পর্কটি অপরিহার্য ভাবে গড়ে তুলতে হয়। গুরুশক্তি কোথা থেকে কি ভাবে উৎসারিত হয়, এ সম্বন্ধে এক স্পষ্ট উদার বোধ থাকা দরকার। পতঞ্জলি বলেন গুরু জীবকে উদ্ধার করেন, শিষ্যের স্বরূপ প্রাপ্তির সহায়ক তিনিই। এইভাবে গুরুতত্ত্ব যদি বুঝি তাহলে আবার সর্বাঙ্গীণ যে আদর্শবোধ সেই গুরু। ঠিক ঠিক

এই বোধ হলে আমরা আর বিগ্রহে বাঁধা পড়ব না। বিগ্রহে গুরুকে পেলে তার মধ্যে ভগবদ্ভাবটি যদি না দেখতে পারি, তাহলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। বাহিরে যে গুরুকে বিগ্রহে পেলাম, তিনিই তো তাঁর ভাব দিয়ে বাণী দিয়ে শক্তি দিয়ে আমাকে পরম সত্যের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছেন। ঈশ্বর তো প্রতিটি জীবের হৃদয়ে সদা সন্নিবিষ্ট হয়ে তাই করে চলেন। তাই ঈশ্বরের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হবে। আর তা-ই হল গুরুশক্তির কাছে পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষে নিজকে দিতে-দিতে একেবারে সব সঁপে দেওয়া।

কিন্তু এই জগদ্‌গুরু ঈশ্বর আমাকে কি ভাবে পরিচালিত করেন? প্রথমে মনে হয় তাঁর রীতি-নীতি আমার কাছে অদৃষ্ট। তবুও নেপথ্যে তাঁর শক্তি কিন্তু কাজ করেই চলেছে। আমার মধ্যে পূর্ণ শরণাগতির ভাব থাকা চাই, সেইজন্য প্রয়াস ও প্রপত্তির তখন প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রপত্তির পথে আবার বাধা হয় আমাদেরই অহমিকা। আমার ভাব তখনও সীমিত, তাঁর মত করে তাঁকে না চেয়ে আমিই যেন চাই আমার ঈশ্বরকে নির্বাচিত করতে। তাতে সাধ্য ও সাধনকে অনন্তের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে খর্ব করে ফেলে নিজেকে ব্যাপ্ত না করে আবার পাকে-পাকে বেঁধে ফেলি—"আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে নিশি পলে পলে।" তাই গোড়াতেই অহংএর শুদ্ধি একান্ত প্রয়োজন, না হলে গুরু ঈশ্বরই হন আর মানুষই হন, তাঁর অনুশাসন বা দেশনা কিছুই তো বুঝতে পারব না। গীতা স্পষ্ট ভাষায় গুরুর নিকট হতে জ্ঞান আহরণের প্রকৃষ্ট উপায়টি সুন্দরভাবে বলে দিয়েছেন—

"তৎ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

"যাঁরা জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী তোমাকে তাঁরা জ্ঞান উপদেশ করবেন। তার জন্য তোমার মধ্যে থাকবে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা।" নিজকে পুরোপুরি লুটিয়ে দিতে হবে সেখানে। যাই আসুক তোমাকেই চাই, চাই-ই। এই ভাব নিয়ে যে শুরু করেছি, আর কিছু দিয়ে তো সে চাওয়া পূর্ণ হবে না। ওই ভাবে গুরুর কাছে পরিপূর্ণ আত্মদানে বাস্তবিকই জীবনে অঘটন ঘটে। গুরুশিষ্যের এ ভাব সর্বজনীন। কেননা মানুষে মানুষে এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। তাই গুরুর সমীপে যখনই জিজ্ঞাসা নিয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে যাই তখন নীরব হয়ে নম্র হয়ে যাব, চিত্ত উদার ও সবল করেই যাব। কেননা জাগ্রত চিত্তের যথাযথ প্রশ্নও থাকবে, সদ্‌গুরু তার মীমাংসা করে দেবেন। তারপর সেবা-বুদ্ধিতে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত এক মধুর সম্পর্কও গড়ে উঠবে। এই প্রপত্তির ভাব না থাকলে কোনো ক্ষেত্রেই বড় কিছু পাওয়া যায় না। এখন আমরা গুরুবাদ তর্কের দ্বারা নস্যাৎ করে দিলেও দলের গুরু, রাষ্ট্রগুরু এদের কাছে কিন্তু নতজানু হয়েই থাকি। তা থেকেই গোলামির ভাব মনে আসে। কিন্তু ধর্মগুরুর সমীপে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও

সেবা দ্বারা শিষ্যত্ব গোলামি নয়, এবং এতে লজ্জা বা অগৌরবের কিছু থাকতেই পারে না।

এইভাবে জগদ্‌গুরুর কাছে সবটাই সমর্পণ করে দিতে পারলে তিনি যখন আধারে আবিষ্ট হন, তখনই গুরুশক্তির ক্রিয়া শুরু হয়। তখন তিনি চৈত্যগুরু বা অন্তর্যামী। রামকৃষ্ণদেব এই অবস্থাকে লক্ষ্য করেই বলেছেন যে, 'শুদ্ধ মনই গুরু। খানিকটা সাধন করলে কেউ এসে বলে দেবে কি করতে হবে।' অন্তরে থেকে যিনি নির্দেশ দেন তিনিই জগদ্‌গুরু। তত্ত্বরূপ হল তাঁর ভাবনার স্বরূপ আর সাধকের উপলব্ধি পরম ভাবভূমি। গুরুপ্রণামের সুন্দর একটি মন্ত্রে এর পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি।

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

সদ্‌গুরু ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ। তিনি পরমসুখদ, কেবল জ্ঞানমূর্তিতে বিরাজিত। তিনি আকাশবৎ দ্বন্দ্বাতীত, নিত্য একল বিমল অচল থেকেও সকল বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীপুরুষ। সমস্ত ভাবকে ছাপিয়ে ও তার উর্ধ্বে গুণাতীত তাঁর স্বভাব। সেই তাঁকেই আমি নমস্কার করি।" এই মন্ত্রটি বিগ্রহবান মানুষীতনুধারী জগদ্‌গুরু সম্বন্ধেও প্রয়োগ করতে হয়। এইভাবে যদি মানুষগুরুর মধ্যে ঠিক ঠিক জগদ্‌গুরুকে দেখে বন্দনা করতে পারি, তবেই না গুরুকরণ সিদ্ধ হবে। উত্তম যার অধিকার তার এই পথে গুরু আর ঈশ্বরে তো কোনও ভেদ থাকে না। তার কাছে গুরুই যেমন ঈশ্বর, তেমন ঈশ্বরই গুরু স্বয়ং।

আবার যে মধ্যম অধিকারীরা ভাবকে আশ্রয় করে চলেন, তাঁদের ভাবরূপই হল ইষ্ট এবং সেটাই সেখানে প্রধান। গুরুকে তাঁরা আশ্রয় করেন ইষ্টলাভের জন্য। কিন্তু ইষ্ট গুরু ঈশ্বর তিনকে সমভাবে নিয়ে যে যাঁটি মূলভাব, সেই নিয়ে চলতে পারলে ওই উত্তম ভাবগুলি সবই ঠিক ঠিক মিলে যাবে। আর একটি কথা। যেমন বিগ্রহবান্ মানুষতনুধারী গুরু লাভ হয়, তেমনি ভাবের বিগ্রহধারী গুরুও লাভ হতে পারে। এঁদের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক দুই ধারায় চিহ্নিত করতে পারা যায়। এদেশে রাম কৃষ্ণ ও বুদ্ধ এই তিনটি নামই ঐতিহাসিক গুরুবর্গের ধারায় প্রধান স্থান গ্রহণ করে। পৌরাণিক ধারায় কালী, দুর্গা, শিব গুরু। এঁরা সবাই যেমন বিশ্বতত্ত্ব এবং শুদ্ধভাবাশ্রিত, তেমনি ভাবময় বিগ্রহও ধারণ করেন। ধ্যানে ভাব জমাট বেঁধে রূপ ধরে। এদেশের দেববিগ্রহগুলি সব তত্ত্বমূর্তি। ঐতিহাসিক গুরু বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়, তাঁদেরও ভাবরূপ ইষ্টদেবতারূপে বিগ্রহে ভজনা করা হয়ে থাকে। যে-ভাববিগ্রহ বাইরে আমার

সম্মুখে, তা-ই আমার হৃদয়ের বেদিতে প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব শুদ্ধ হলে তা থেকে তত্ত্ব স্ফুরিত হয়।

কিন্তু তত্ত্বই হোক আর ভাবই হোক, এসবই লোকোত্তরের আবেশজনিত এক অতীন্দ্রিয় বস্তু। মাটির মানুষ আমরা, তাই ইন্দ্রিয় দিয়েও তো তাঁকে পেতে চাই মানুষের মত করে। মানুষের মধ্যে মানিতেও তাঁর আশ্রয় চাই। শৈশবে মায়ের ভালবাসা আর পিতার মহিমা আমার কাছে ছিল বিগ্রহবান গুরুই মতই। তেমনি করে ভাব ও তত্ত্বকে পুরুষ-বিগ্রহে বা মানুষী তনুতে চাইলে সেটা তো অযৌক্তিক বলতে পারিনা। এটাই বর্তমান যুগে গুরুবাদের মূল কথা। মানুষের অন্তরে যেমন এই চাহিদা আছে, এর ফলিত দিকের এক গভীর সার্থকতাও তেমন আছে মানুষের জীবনে। তাই যখন মাটির মানুষে গুরুকে দর্শন করি সে ভাবের তো কোন তুলনা হয় না। জীবনে সে এক শ্রেষ্ঠ আবির্ভাব। তাঁর সঙ্গে শুদ্ধ এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, জীবন উজ্জ্বল ও মধুর হয়। ভাবে ও রূপে আর দ্বন্দ্ব থাকে না। পরম প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিতে প্রাণ ভরে ওঠে। কিন্তু ভাবে ও রূপে তারতম্যটা সকলে ঠিক মত রাখতে পারে না। প্রাণের উত্তালতায় শুদ্ধ অশুদ্ধ দুই ভাবের সংমিশ্রণে সাধনপথের অনেকদূর পর্যন্ত একদিকে ঝোঁক পড়ে গোলমাল পাকিয়ে গেল এমনও হয়। গীতা ও ভাগবত এজন্য বারবার আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্—, মানবীয় তনুধারী আমাকে না জেনে যারা অবজ্ঞা করে তারা মূঢ়। তারা সর্বভূতের মহেশ্বর পরম সত্তাকে জানতে পারে না, দেখতেও পায় না।" গুরুবিগ্রহ সম্বন্ধে এটাই সার কথা। এই সর্বভূত মহেশ্বর বা ঈশ্বরের তিনটি ভাব—অব্যক্ত পরমভাব, বিশ্বাত্মক ভূতমহেশ্বর ভাব আর মানুষী তনুতে বিগ্রহভাব। কাজেই যারা মানুষী তনুটিকেই শুধু আঁকড়ে ধরে, তাদের পথ কখনও পূর্ণতায় নিয়ে যায় না। পরম পুরুষের বিগ্রহের পিছনে **universal** (বিশ্বাত্মক) ও **transcendent** (লোকোত্তর)-কে জানতে হবে। গুরুতে এটি দেখে বুঝে নিতে না পারলেই দ্বৈতের সৃষ্টি হয়, দ্বিধা ও সংশয় এসে দেখা দেয়। আবার ভাগবত অপরূপ সেই পরমপুরুষের রূপ দেখিয়েও আমাদের বারবার নিয়ে গেছেন স্বরূপের ব্যঞ্জনায়, যেন তাঁকে আমরা কখনও না ভুলি। কিন্তু শুধু দুর্দর্শ স্বরূপকে নিয়ে কঠিন পথে যেন চলতে না চাই। কেননা স্বরূপেরই তো রূপ।

শ্রীঅরবিন্দ গুরু ও শিষ্য উভয় সম্পর্ককেই সাবধান করে দিয়ে বলছেন, পূর্ণযোগের সাধককে মন মুক্ত রাখতে হবে। গুরুগীতায় পেয়েছি—"মনাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ—আমার ইষ্ট সবারই ইষ্ট, আমার গুরুই সবার গুরু।" একথাটা আওড়ানো সহজ। কিন্তু তারপরেই আছে, "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা"। একথাটিরও গুরুত্ব ওইসঙ্গে না বুঝলেই সর্বনাশ। ইষ্ট বা গুরুকে অহংএর গণ্ডিতে ছোট করে পুরে রাখতে

চাই ; তাও কি হয়? আমার এই ক্ষুদ্র অহং বা কাঁচা আমির মৈতবুদ্ধি গলে গিয়ে আত্ম-চৈতন্যে সবার মধ্যে একত্ব অনুভব করলে পর বোঝা যাবে আমার প্রভুই জগতের নাথ, আমার গুরুই সবার গুরু। এটা গভীরের অনুভূতির বাণী, বাহিরের প্রচারের বিষয় নয়। জোর করে প্রচার করতে গেলে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও হানাহানির সৃষ্টি হয়, সেটা তো ঈশ্বরের অভিপ্রায় হতে পারে না।

শিষ্যকে এ বিষয়ে যেমন সর্বদা সচেতন থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি গুরুসম্পর্কেও কয়েকটি লক্ষণ শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন—অনুশাসন, আচরণ ও সবচেয়ে বড় কথা আবেশ বা শক্তিসঞ্চার। আচরণ ও অনুশাসন অপেক্ষাও শেষেরটি গভীর স্তরের কার্যকরী শক্তি।

গুরুর বাণীই তার অনুশাসন। কিন্তু সম্প্রদায় পরম্পরায় ওই বাণী গ্রহণ করার মত প্রস্তুত না হয়েই আমরা পেয়ে যাই। তা থেকেও অনেক বিরোধ ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। মহাপুরুষের বাণী নিয়ে আমাদের মতুয়ার বুদ্ধি সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিতে আটকে গিয়ে কত যে ঝামেলায় পড়ে তা আর বলার নয়। আসল কথা, যে ভাবেই চলি না কেন, আমাদের লক্ষ্য যে ওই বৃহৎ অসীম অনন্তের দিকে, সেটা ভুললে চলবে না। তাই অনুশাসন দিয়ে গুরুশক্তিতেই নিজেকে যখন বাঁধব মনে করি, তখন মন যেন মুক্ত থাকে, কেন না সে শক্তিও যে সমুদ্রগামী। এই প্রসঙ্গে পুষ্পদন্তের বহুপ্রচলিত শ্লোকটি স্মরণীয়—"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব। সব মানুষই নিজের রুচির বৈচিত্র্য অনুযায়ী, সরল ও বাঁকা নানা রকম পথ ধরে চলে। তবুও নদীসমূহের যেমন সমুদ্রই একমাত্র গতি, 'তুমি'ই সেই সকলের একমাত্র গন্তব্য।" এসব শাস্ত্রীয় কথা খুবই গভীর এবং বোঝেনও অনেকেই, তবুও কার্যত এটা যেন ঠিকমত সবসময় করা হয় না।

আমাদের দেশে বহু সম্প্রদায়। কিন্তু সব সম্প্রদায়ের আচার্যই প্রস্থানত্রয়ীর দার্শনিক রূপে এক ব্রহ্মের কথাই বলেছেন। যেমন শাক্ত বৈষ্ণব ও শৈব যথাক্রমে শক্তি, নারায়ণ ও শিবকেই পরমদেবতা মনে করেন। কিন্তু সেখানেও ইষ্টদেবতা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই। ইষ্টের নানরূপ যাই থাকুক, তাকে ধরে যেতে হবে সেই একদেবে বা একতত্ত্বে —অসীম অনন্ত সমুদ্রের মতই যা অতল গভীর প্রশান্ত এক অনির্বচনীয় একরস প্রত্যয়ের বোধ। এ-বুদ্ধিযোগ গুরুর অনুশাসন থেকেই পেতে হবে।

আবার শাস্ত্রের বাগ্মিকতায় বাঁধা না পড়তে হয়, সেদিকে বুদ্ধিকে সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হবে। অবশ্য এও সত্য যে একটা নির্দিষ্ট শাস্ত্রবাণীকে স্বাধ্যায় করে না চললেও তো হবে না। সব কিছুর মধ্যে নাক গলাতে গেলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। সেজন্য সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রথমে একটাকেই দৃঢ় করে ধরতে হয়। এ দেশের উদার

শাস্ত্র গীতা, ভাগবত ও উপনিষৎগুলি আশ্রয় করে চললে শাশ্বত সনাতন পথের সন্ধান মেলে এবং অন্য পন্থের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিরোধ থাকে না। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনও তাঁর গীতা-ভাষ্য এবং বেদউপনিষদের মন্ত্রবাণী থেকেই আরম্ভ করতে হয়। সম্প্রদায়প্রবর্তকেরা সকলেই শ্রুতি ও গীতা অনুসরণ করে চলেছেন। তাই অতীতের সঙ্গে সংযোগ রেখে সর্বকালীন ও সর্বজনীন দর্শন আমরা শ্রীঅরবিন্দের বাণী থেকেই লাভ করব, যা আমাদের ধারণাকে সেই মূলে নিয়ে যেতে পারবে "যত প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণী—" যেখান থেকে চিরন্তনী প্রবৃত্তিসমূহ প্রসৃত হয়ে আসছে। এমন করে প্রয়োজন বুঝে রুচিমত স্বাধ্যায় নির্বাচন করে তাতে নিবিষ্ট হতে পারলে চিত্তের ব্যাপ্তি ও ঔদার্য লাভ হয়। সব শাস্ত্র ও সম্প্রদায় যে মূলতঃ এক কথাই বলছেন, সেটা তখন বুঝতে পারা যায়। ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য বেড়া বাঁধার কাজে প্রথমে লেগে থাকতে হয়। কিন্তু চিত্ত মুক্ত থাকলে ফসল ফললে বেড়ার বাঁধন আপনিই খসে যায়। গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্র তখন একাকার হয়ে যায়। সেই ইষ্টই সাক্ষাৎ জগদ্‌গুরু ঈশ্বর। এই ঈশ্বরই শিষ্যের অন্তরে আবির্ভূত, তার সকল কর্ম, জ্ঞান, সংবেদন ওই বোধেই অনুভূত। এই শক্তি ও বীর্য শিষ্য লাভ করে গুরুর অনুশাসন থেকেই।

তারপর গুরুর আচরণ। গুরুর এই এক দায়িত্ব। শুধু বাণী নয়, তাঁর জীবনই তাঁর চরম অনুশাসন। চৈতন্যদেব যেমন রাধাপ্রেমের গলিত রূপটি তাঁর জীবন কাব্যে অপরূপ করে ঢেলে দিয়ে দেখিয়ে গেলেন—"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।" গুরুকে শুধু বিচারে নয় আচারেও শিষ্যের সমভূমিতে নেমে আসতে হয়। সাধারণত গুরু এটা সহজে করেন না, শিষ্যেরাও সেটা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। বিবেকানন্দকে দেখেছি অমরনাথ যাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদেরই সমভূমিতে নেমে ধর্মাচরণ করছেন, একাত্ম হয়ে গেছেন সর্বভূতের সঙ্গে। গীতায় এই কথাটাই অন্য ভাবে আছে, "জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান যুক্ত সমাচরণ্"—যিনি বিদ্বান, পরম তত্ত্বকে যিনি জেনেছেন, তিনি যুক্ত থেকেও অবিদ্বানের সঙ্গে মিলে তাঁর আচরণ দিয়ে তাদের কর্মে রস যোগাবেন। গুরু শিষ্যের মধ্যে এ ভাবেই নেমে আসেন, তাদের অবিদ্যাশ্রিত ভাবে ও কর্মে তাঁর বিদ্যার আলো এসে পড়ে তাকে পরিশোধিত ও মার্জিত করে। এটাই শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

এর পরের কথাটাই আসল—শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেন Influence বা শক্তিসঞ্চার। গুরুর মাঝে আছে এক দিব্য প্রেরণা, তিনি যা পেয়েছেন তা জগৎকে দিয়ে দিতে হবে। রামকৃষ্ণদেব চাপরাশ পাবার কথা বলেছেন, সেই অধিকারটি চাই। নাহলে সামান্য শক্তি লাভ করে দেবার জন্য ছুটকাটি, সে এক সিদ্ধাই। তা হল গুরুতত্ত্বের অপব্যবহার। কিন্তু বুদ্ধদেবকে দেখি জগৎকে জরা ব্যাধি মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার

করতে নির্বাণের সত্য অধিকার করেও করুণায় অভিভূত। তাঁর যেন দ্বিধা—এ বস্তু কি দেব, না দেবনা? অবিদ্যাচ্ছন্ন জগতের মূঢ়তা ও ঘোরস্বভাব তাঁর জানা ছিল; জগৎ কি তাঁর শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণ করতে পারবে? Mother-এর ধ্যানবাণীতে আমরা এই রকম এক গভীর উচ্ছ্বল শুদ্ধতার পরিচয় ও ওই প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধের বাণী শুনেছি। সেই রকম পরম করুণায় নির্গলিত অনন্ত সুধাঝরি উদার করে ঢেলে দেওয়া, শুদ্ধ থেকে নৈঃশব্দ্যের ঘনীভূত শক্তিকে নামিয়ে এনে আবার মৌনী শান্ত থেকেই ওই শক্তিকে নিঃশেষে বিচ্ছুরিত করা, এর প্রভাব অমোঘ। কোন কালে এর ক্ষয় নেই। প্রাচীনকালের দক্ষিণামূর্তি গুরুস্তোত্রে এই গুরুশক্তির আবেশের এক অপূর্ব চিত্র পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য বলছেন—

"চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধা শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ"॥

এ এক আশ্চর্য যে বটতরুমূলে যুবা গুরু বৃদ্ধ শিষ্যগণ পরিবৃত হয়ে সমাসীন, তিনি মৌনী। কিন্তু শিষ্যগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসার সব কিছুর উত্তর লাভ করে সংশয়মুক্ত। মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিত পরব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দক্ষিণামূর্তি গুরুর পরমশক্তিবিকিরণের এক শ্রেষ্ঠ উপায়—এই তত্ত্ব আমরা এই চিত্র থেকে পেয়েছি। নীরব ও শান্ত থেকে শুধু অস্তিত্বের দ্বারা এক পরম দিব্য আবেশকে সঞ্চারিত করা, তা থেকে শিষ্যের বীর্যলাভ ঠিকমত হলে প্রচার ও প্রসার আপনা থেকেই হবে। কোন বিরোধী শক্তির সাধ্য নেই তাকে রুদ্ধ করে রাখতে পারে। শিবশক্তি তখন একাকার। দেবীসূক্তে দেবী যেমন বলেছেন "অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা"—সেই অবস্থা। ঋণাবর্তের প্রবল বেগে বয়ে চলেছে সেই শক্তিস্ফুট, অন্তরে বাহিরে সর্বত্র। সে শক্তি বিধৃত এক পরম বিরাট ভাবের মহিমায়। গুরুর গুরুত্ব ক্ষীণ হয়ে যায় সেই বিরাট ভাবে—এই গুরুশক্তি, উচ্ছ্বসিত বেগবান তার গতি। গুরুশক্তি কখনও ব্যর্থ হয়না। আপাতদৃষ্টিতে অনেক সাধকের জীবনে এমনও দেখা যায় যে মনে হয় সব কিছু পণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু এমনও বলা যায় যে অনেক জীবনের অসিদ্ধি, পরাভব, দুর্গতির ভিতর দিয়েই তিনি সাধককে অগ্রসর করে নেন। আমরা প্রথমে সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনা কিন্তু সদ্‌গুরু সেটা জানেন। গুরুর সঙ্গে অন্তরের যোগটি নিবিড় হলে তবে তাঁর এই মহিমা বোঝা যায়। এই গুরুর ধর্ম।

এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে গুরুর করণীয় কিছু বলতে হয়। গুরু হলেন প্রভিভূ, বালকস্বভাব, সখা। তিনি পরম সত্যকে কখনই আড়াল করবেন না। তাঁর স্বচ্ছতায় ঈশ্বরের প্রকাশ, এই ভাবটি খাঁটি থাকা চাই। তিনিও ঈশ্বরের কাছে প্রপন্ন মানুষ ভাবে এবং তা থেকেই পূর্ণ প্রজ্ঞা বিচ্ছুরিত—এই তাঁর ভাব। রামকৃষ্ণদেব জগদ্‌গুরু

হয়েও বলতেন —'এ তিনে আমি নেই, কর্তা, বাবা, গুরু'। এই ভাব ধরে যিনি থাকেন তিনিই পূর্ণ, তিনিই গুরু।

এইবার সর্বশেষে আসে কালের কথা। আমাদের যত ঝামেলা বাধে এই কাল বা সময়কে না বুঝতে পেরে। সাধনা আরম্ভ করে সিদ্ধির জন্য সময়ের অপেক্ষা করার ধৈর্য ধরা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু পূর্বেই বলা আছে যে সমগ্র প্রকৃতিতে যোগ চলেছে। কাজেই কিছু করতে পার আর না পার—স্রোতে যখন ভেসেছ, সমুদ্রে পড়বেই। এ তো জানা কথা। কিন্তু সচেতন সমনস্ক থাকলে তো যোগ। আকৃতির সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাভ করলে কালকে আমরা সংক্ষিপ্ত করতে প্রয়াসী হতে পারি। আত্মসমর্পণের সঙ্গে এই প্রয়াসও থাকা চাই—**now and here**; আবার কালের প্রতীক্ষা করতেও জানা চাই। সমর্পণ করা বলা যত সহজ করা তত নয়। তাঁর প্রসাদ আর আমার প্রয়াস—তিনি যত এগিয়ে আসেন—আমার দেওয়াও তত সহজ হয়ে আসে। এ এক সদাজাগ্রত প্রচেষ্টা। তোমারই আকর্ষণে চলেছি, সময় হলেই তুমি আমায় একেবারে নিয়ে নেবে, তবেই না তোমাকে পাব। সেই পরমলগ্নটি কবে আসবে, যখন তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান ঘুচে যাবে। এই ব্যাকুলতা নিয়ে জেগে আছি। কাল যে কখন দ্রুত আর কখন বিলম্বিত—তা বোঝবার উপায় নেই। কখনও দীর্ঘকাল সাধনার পরে চকিতে যেন পরমলগ্নটি দেখা দেয়। আবার কখনও না চাইতেই তার আবির্ভাব আমার সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে রিক্ত করে নিয়ে আবার যেন হারিয়ে যায়। সাধনায় একাগ্রতায় চেতনা স্বচ্ছ হয়ে আসে এবং তাতে বাধার গুরুত্ব লঘু হয়ে যায়। তিনি বরণ করেছেন বলেই যে আমার ব্যাকুলতা—এইটা বুঝলেই কালের যাত্রা শুরু হয় পূর্ণের পথে। তারপরই বাধার সৃষ্টি হতে থাকে। বাধা যত প্রবল হবে, ততই তার সঙ্গে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে—এই দৃঢ়সংকল্প চাই। মনমরা ভাব থাকলে বা হতাশ হলে চলবে না। বাধাকে যখন কিছুতেই হটাতে না পারি তখন দোষ দিই কালের; ভাবি ও বলি, কালই আমার বাধা। সামনে এক দুস্তর সমুদ্র, ঝিনুক দিয়ে জল ছেঁচে সেই সমুদ্র পার হতে হবে। এমন অবস্থায় চাই অসীম ধৈর্য। কিছুতেই হার না মেনে, পিছু হটে না গিয়ে, নাছোড়-বান্দা হয়ে লেগে থেকে পার হবার চেষ্টা করা, সেটাই বীর্যের পরিচয়। কালের সঙ্গে এই সংগ্রামে তাকে সম্মুখ সমরে মুখোমুখি আহ্বান জানাতে হবে, যতই সেটা দীর্ঘ হক না কেন। তাতেই কাল সংক্ষিপ্ত হয়, প্রকৃতির এই নিয়ম। পতঞ্জলির সেই যোগসূত্র "তীব্রসংবেগা-নামাসন্নঃ"—তীব্র সংবেগেই বাধা ক্ষীণ হতে থাকে। অনেকদিন হয়তো সংগ্রাম চালাতে হয়, কেননা বাধার অধিকাংশই যে কুণ্ডলীপাকানো অহংএর সৃষ্টি, এটা সহজে বোধগম্য হয় না। বাধাকে আরও জটিল করি নিজেরই রচিত এক মিথ্যা অহঙ্কারের পাকে-পাকে তাকে জড়িয়ে রেখে—এই এক বিড়ম্বনা। তিনি যে সঙ্গে রয়েছেন, ওই

নিথ্যা প্রাচীরটা ভেঙে দেবেন তাঁরই শক্তিতে, এটা কার্যত বুঝতে চাই না, সে প্রার্থনা নেই। ওরশক্তিকে যেন ভিতরে প্রবেশ করতেই দিতে চাইনা। এর জন্য চাই একাগ্রতার শ্রদ্ধার আবেগ। শ্রদ্ধাই ওই তীব্র সংবেগ এনে দেবে। তখন তো আর কিছু করার নেই, তাঁরই নাম নিয়ে দুস্তর সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, হাতের খিনক ফেলে দিয়ে। এতেই কাল সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে, ওদিকের বেগও বেড়ে যায়। কখন যে অকূলের টানে বাধার বুলও উৎপাটিত হয়ে যায়, সহসা বোঝাও যায় না। Christian Mystic-রা একটা উদাহরণ দিয়ে থাকেন—সমস্ত সাধনা দিয়ে যেন এক বিরাট জগদ্দল পাথরকে খাড়া করে উলটে দিতে হবে, এই হল কাল যখন আমার বাদী তখনকার প্রচেষ্টা। তাতে হার না মেনে সমস্ত শক্তি একাগ্র করে ওই পাথরকেই তুলতে চেষ্টা করতে হবে। শক্তির এই সাধনায় প্রবল বাধাই শেষ পর্যন্ত পরম সহায় হয়ে দাঁড়ায় কালের প্রসাদে। কালের যাত্রা প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে ধ্রুবক ভক্তের সাক্ষাৎকারের সুপ্রচলিত গল্পটি মনে রাখা ভালো। জ্ঞানী ও তপস্বী হয়েও ভগবৎপ্রাপ্তি হতে আরও তিন জন্ম লাগবে, নারদের মুখে এই কথা শুনে ভক্তটির ধৈর্য ও আশা ভগ্ন হয়ে গেল। অপরদিকে এক পাগলা ভক্ত নারদের মুখে শুনল যে তার ভগবৎসাক্ষাৎকারের সময় হবে এক তেঁতুলগাছের যত পাতা তত জন্ম হবার পরে। তাতেই তার উল্লাস ও নৃত্য, কেননা সে নিশ্চিন্ত হল যে একদিন দুস্তর কাল পেরিয়ে তাঁকে সে পাবেই। এই ভাবে খসী হয়ে কালকে নিতে হবে। চাই বিশ্বাস আর তাঁকে ভালবাসার জোর—সেটাই হিম্মৎ। আমি দাঁড় বেয়ে চলেছি কিন্তু হাল ধরে আছেন যে তিনিই স্বয়ং—পুরোভাগে তিনিই কর্ণধার। তাহলে আর ভাবনা কি? এই মনোবৃত্তির অনুশীলনটি চাই।

তাহলে আমরা সাধনসম্পদের মধ্যে পেলাম যে প্রথমেই থাকা চাই উৎসাহ। তারপর পথের খবর ভাল করে জানতে হবে; সেই শক্তি ও জ্ঞান দেবেন শাস্ত্র। আর পথের দিশারী-গুরু লাভ করে চাই কালের সঙ্গে সংগ্রাম করে বিজয়ী হবার বীর্য।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে

জনৈক বুদ্ধিজীবী সমালোচক

শ্রীঅরবিন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যখন কোনো একটা সংস্কৃতির সমালোচনা আমাদের প্রয়াস, সে-সংস্কৃতি আবার যখন এমন যে তার মধ্যেই আমরা গড়ে উঠেছি অথবা তার থেকেই মুখ্য সব আদর্শসূত্র গ্রহণ করি এবং পক্ষপাতদুষ্টতার জন্য তার দোষত্রুটি কমিয়ে দেখতে প্রস্তুত অথবা অতিঘনিষ্ঠতার দরুণ তেমন সব দিক বা গুণ যা অপরিচিতের চোখে পড়ে অথচ আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, তখন অন্যে সেটি কীভাবে দেখে তা কৌতূহলের ও শিক্ষার বিষয়। এতে আমাদের মত ছেড়ে তাদের মত গ্রহণে প্রয়োচিত হব না; তবে এরকম অনুধ্যানের ফলে আসবে নূতন আলো, আত্মসমীক্ষায় আনুকূল্য। অবশ্য বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নানা চোখে দেখা যায়। আছে সহানুভূতির দৃষ্টি, সম্বোধি ও নিকট তাদাত্ম্যবোধের দরদী দৃষ্টি এই দৃষ্টিরই ফল ভগিনী নিবেদিতার **Web of Indian Life**, মিঃ ফিল্ডিংয়ের বর্মা-সংক্রান্ত বই, কিম্বা স্যার জন উড্রফের তন্ত্র-বিচার। এ-সবই যবনিকা সরিয়ে জাতির অন্তরাত্মাকে খুলে দেখাবার চেষ্টা। হতে পারে এতে বাহিরের তথ্য সব পাই না, তবে মহত্তর বাস্তবতাযুক্ত গভীরতর কিছুর সন্ধান পাই; আপাতত যেমন তেমনি ত্রুটিপূর্ণ জীবনবস্তুটিকে পাই না, পাই তার আদর্শ তাৎপর্য। আত্মা, মূল চিদ্‌বস্তু এক জিনিস, দুরূহ মানবিক বাস্তবতায় প্রমূর্ত এবং প্রায়শ বিকলাঙ্গ ও বিকৃত রূপাবলী আবার অন্য জিনিস; পূর্ণদৃষ্টির কাছে দুয়ের কাউকেই কিন্তু অবহেলা করে চলে না। তারপর আছে গুণগ্রাহী ও নিরাসক্ত সমালোচকের চোখ—সে দেখে সবের উদ্দেশ্য ও ভূতাবস্থা, মিলিয়ে নেয় আলো-ছায়া, দোষ-গুণের এবং সফলতা-বিফলতার লেখে সমান ভাব, যার প্রাপ্য নিষ্করুণ তিরস্কার তার থেকে পৃথক করে ধরে তেমন জিনিস যার প্রাপ্য সহৃদয় প্রশস্তি। সর্বদা একমত না হতে পারি; বাহিরের দিক দিয়ে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা আলাদা, সম্বোধি এবং তাদাত্ম্যবোধের অভাবে আসল জিনিস কিম্বা নিন্দা-প্রশংসার বস্তুটির তাৎপর্যই অগোচর থেকে যেতে পারে: তবু লাভ আছে, ছায়াপাত বর্ণপাত সম্বন্ধে ধারণার এতে উন্নতি হবে, পূর্বতন বিচারের সংশোধন হবে। পরিশেষে রয়েছে বৈরী সমালোচকের নজর, বিচার্য সংস্কৃতির অপ-কৃষ্টতার সে নিঃসন্দেহ, সে অত্যুক্তি না করেও সরলভাবে সাধুভাবে তার সিদ্ধান্তের পক্ষে

যুক্তি খাড়া করে। আমাদের কাছে তারও মূল্য আছে; আস্থা ও যুক্তির নিতার্থে বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রয়োজন, তবে আমরা চাই তাতে কাতর হয়ে না পড়তে, আমাদের জীবন্ত বিশ্বাস ও কর্মবৃত্তির আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত বিধ্বস্ত না হতে। আমাদের এই মানুষী জগতে সবই অসম্পূর্ণ এবং এক এক সময়ে এই অপূর্ণতার দিকে কড়া নজর দেওয়া ভালো। আর কিছু না হলেও, তাতে অন্তত অন্যের দিকটি বুঝতে শিখব, বিরুদ্ধতার মূল কোথায় ধরতে পারব; এই রকম তুলনার ফলে আসে বিজ্ঞতা অন্তর্দৃষ্টি সহানুভূতি।

বৈরী সমালোচনার কিছু উপকার থাকতে হলে প্রথমে তাকে সমালোচনা পদবাচ্য হতে হবে, কুৎসা নয়, জাল সাক্ষী নয়, গালিগালাজ নয়; বিকৃত না করে তথ্যের স্পষ্ট বিবৃতি দিতে হবে তাকে, বিচারের একই মান বরাবর মেনে চলতে হবে, চেষ্টা করতে হবে ন্যায় সুক্ষ্মতার মাত্রা একটা রাখতে। মিঃ উইলিয়ম আর্চারের ভারত-সম্পর্কে সুপরিচিত বইটি—দোষের জন্যই যাকে আমি আমাদের সংস্কৃতির বিরোধী বা ভারতবিদ্বেষী পাশ্চাত্য দৃষ্টির নমুনা বলে নিয়েছি—অবশ্য এ ধরণের নয়। এখানে শুধু যে আদ্যন্ত ও নির্বন বিস্তার, আলোহীন শুধু অন্ধকারেরই ছবি, তা-ই নয়: তাহলে তো প্রশংসাই করা হল, মিঃ আর্চারের প্রতিশ্রুত লক্ষ্য ছিল শয়তানের উকিলের ভূমিকায় ভারতীয় সংস্কৃতির সব সোৎসাহ প্রশস্তির বিরুদ্ধতা করা, যার ব্যবসাই হল তার মহত্ত্বের দাবির বিপক্ষে যা-কিছু খুঁজে বের করা এবং কঠোরতম ভাষায় প্রয়োগ করা। আমাদের বেলাও এরকম এক সর্বব্যাপী আক্রমণ সামনে রাখা ভালো, যাতে এক নজরে আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিপক্ষের গোটা মামলাটি দেখতে পাই। কিন্তু তাঁর বিবৃতিতে তিনটি আত্মঘাতী উপাদান আছে। প্রথম, এখানে একটি স্থূল, রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে. তার আরম্ভ এই প্রচ্ছন্ন ভাব নিয়ে যে ভারতকে এমন একান্ত বর্বর বলে প্রমাণ করতে হবে যাতে তার স্বরাজের দাবিটি ফেঁসে যায়। এরকম যাহা মতলবে তাঁর সমস্ত মামলাটিই খারিজ হয়ে যায়; কারণ এর অর্থ পার্থিব স্বার্থের খাতিরে জেনেশুনে সত্যের বিকৃতি করা, যা সংস্কৃতিমূলক তুলনা ও সমালোচনার একান্ত পরিপন্থী।

বস্তুত এ বইখানি সমালোচনা নয়; এটি সাহিত্যিক কিম্বা বরং সাংবাদিকী মুষ্টিযুদ্ধ। তাও আবার একটা উদ্ভট ধরণের নির্ধাবাচন ও অতিভাষণের তাণ্ডব নৃত্যের দ্বারা। ইচ্ছামত ভূপাতিত শায়িত ভারতের এক মূর্তির ওপর এ একটা অসিচালনা, এই আশা নিয়ে যে বোকা দর্শকরা বুঝি বিশ্বাস করবে যে বোদ্ধা সত্যসত্যই প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করল। সুক্ষ্মতা, ন্যায়, পরিমিতি এখানে বাতিল: লক্ষ্য এখানে দারুণ দারুণ আঘাত হানার তাণ, আর সেজন্য যা কিছু হাতে পাওয়া যায় তা-ই কাজে লাগান,—ঘটনার মিথ্যা প্রচার কিম্বা হাস্যকর বিন্যাস, অনিবার্যতার মুখোশ পরিয়ে অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক সব প্রস্তাবনা, একটা বিষয়ে আপাত-প্রাধান্যলাভের জন্য চরম অযৌক্তিক অসংলগ্নতার

আশ্রয় গ্রহণ। এসব তেমন একজন বিজ্ঞ সমালোচকের চকিত তীক্ষ্ণদৃষ্টি নয় যিনি মানসিক বিকারে ভুগছেন এবং এক নিদারুণ যুক্তির কসরতে সেই বিষ ঝেড়ে ফেললেন একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন আকাশকুসুম কল্পনার কিম্বা অপ্রিয়ভাজন এক বিষয়ের চতুর্দিকে বিভীষণ রণনৃত্যে। এ এক রকম অনিতচারিতা এক আধ বার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এবং বেশ কৌতুকপ্রদ ও হাস্যকর ব্যাপার। রোমক কবি বলেছিলেন, স্থান কাল বুঝে বিদূষকের ভূমিকা সুন্দর ও মধুর হতে পারে,—**dulce est desipere** কিন্তু নিঃ আর্চারের প্রাদপি অযৌক্তিক বাগাড়ম্বরে পদস্খলন মোটেই স্থানোপযোগী—**in loco**, নয়। অচিরে দেখতে পাব—অসঙ্গত মতলব এবং স্বেচ্ছাকৃত অসাধুতার সঙ্গে এটি তৃতীয় এবং অধম্য এক মারাত্মক ত্রুটি, যেসব বিষয়ে অবলীলাক্রমে বুক ঠুকে তিনি তাঁর বিরূপ রায় দিয়েছেন সেসব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তিনি যা করেছেন তা হল ভারতের ওপর যত লোকের অপ্রিয় মন্তব্য তিনি পড়েছেন মনে মনে তাদের সংগ্রহ করেছেন, নিজের হালকা মতামত জুড়ে সেগুলিকেই খাড়া করেছেন, এই অসার ও অস্বাস্থ্যকর নিষ্ক্রিয়কেই নিজের মৌলিক সৃষ্টি বলে চালিয়েছেন,—যদিও একমাত্র নিজস্ব ও খাঁটি অবদান হল তাঁর এই পরসূত্রে প্রাপ্ত মতামতের ব্যাপারে একটা খোসমেজাজী অবজ্ঞার ভাব। বইখানি সাংবাদিকসুলভ জ্ঞান বাদ, খাঁটি সমালোচনা সৃষ্টি নয়।

স্পষ্টত লেখক তত্ত্বশাস্ত্রে পারঙ্গম নন—ও-জিনিসকে তিনি মনের অপব্যবহার বলে অবজ্ঞা করেন; অথচ তিনিই আবার বসলেন ভারতীয় দর্শনের গুণাগুণ বিষয়ে বিশদ সূত্র বাঁধতে। তিনি এমন একজন যুক্তিবাদী যাঁর কাছে ধর্ম হল প্রমাদ, এক রকম মানসিক রোগ, যুক্তির কাছে পাপস্বরূপ; আবার তিনিই নানা ধর্মের তুলনামূলক বিচারে রত, ভালোর কাছাকাছি স্থান দিলেন খৃষ্টধর্মকে—সম্ভবত খৃষ্টানরা নিজেদেরই ধর্মে তেমন বিশ্বাস করে না এই জন্যই যেন—পাঠক হাসতে পারেন, কিন্তু বইটি গম্ভীরভাবে এই তত্ত্বই উপস্থাপিত করেছে; আর হিন্দুধর্ম পেয়েছে নেকনজর। তিনি স্বীকার করেছেন সঙ্গীতে তাঁর অজ্ঞতা, অথচ তাতে ভারতীয় সঙ্গীতকে নিতান্ত অপকৃষ্টতার স্তরে ঠেলে দিতে বাধে নি। শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ে তাঁর রায় সংকীর্ণতার চরম; তবু নিরঙ্কুশ নিশ্চয় তিনি উদার। নাটক ও সাহিত্যে আশা ছিল তিনি এর চেয়ে ভালো কৃতিত্ব দেখাবেন; কিন্তু তাঁর মাপকাঠির লঘুতা ও যুক্তির চাপল্য দেখে অবাক লাগে কি করে তিনি বিশ্বের দরবারে সাহিত্য এবং নাট্য সমালোচক বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন: তাহলে বলব, নিশ্চয় তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের বিচারে অন্য পদ্ধতি ও রীতি নিয়েছেন, কিম্বা য়ুরোপে এরকম হাততালি খুব সুলভ। ঘটনার অজ্ঞতাপূর্ণ ভ্রান্ত ব্যবস্থাপন, যে জিনিস অনুধাবন করেন নি তার উপর

লঘুচিত্তে নির্ভীক রায় আমাদের এই সমালোচকের ভারত সংস্কৃতিকে বর্বরতার স্তূপ বলে খারিজ করে দেবার একমাত্র চাপরাশ।

অবশ্যে ভারতীয় সভ্যতা বহিঃস্থ বিজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখাটির জন্য কিম্বা সুপণ্ডিত বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য আমি মিঃ আর্চারের দিকে নজর দিই নি। কার্যত যাদের আছে কোনো সংস্কৃতি তারাই পারে তার সৃষ্টির মূল্য যাচাই করতে, কারণ তাদেরই সামর্থ্য আছে সেসবের গহনে ঢুকবার। বিদেশী সমালোচকের কাছে আমরা যেতে পারি শুধু তুলনামূলক বিচার গড়তে সাহায্যের জন্য,—তারও অপরিহার্য প্রয়োজন আছে। তবে এসব ব্যাপারে কোনো কারণে চূড়ান্ত বিচারের জন্য যদি বিদেশীর মতামতের ওপর নির্ভর করতে হয় তাহলে অবশ্য তেমন ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞেরই দ্বারস্থ হতে হবে। মিঃ আর্চার, ডাঃ গাফ্ অথবা স্যর জন উড্রফের অনুজ ইংরেজ অধ্যাপক ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে কী বলেন তাতে আমার কিছুই এসে যায় না আমি সন্তুষ্ট হবো এমারসন, শোপেনহাওয়ার বা নীটশে—এক্ষেত্রে এই ত্রয়ী বিশ্বের সেরা এক মানস প্রতিভার পরিচয় দেন—কিম্বা কাজিন ও হেগেল কী বলছেন জেনে, তার নানা ভাবনার ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব লক্ষ্য করে, প্রাচীন য়ুরোপীয় চিন্তার সঙ্গে আমাদের প্রাচীন চিন্তাধারার বহুৎ সমবর্ধিতা দেখে, আজকের আধুনিকতম জিজ্ঞাসা ও গবেষণার যে-ফল প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে তার স্বীকৃতি পেয়ে। ধর্মের জন্য মিঃ হেরল্ড বেগবীর দ্বারস্থ হবনা, অথবা আমাদের আধ্যাত্মিকতার ওপর মতামতের জন্য কোনো য়ুরোপীয় নাস্তিক বা যুক্তিবাদীর কৃপা প্রার্থনা করব না, দেখব তাঁদের কী প্রতিক্রিয়া যাঁরা ধর্মভাব ও অভিজ্ঞতা সহ উদারমনা, যেমন আধ্যাত্মিক এবং ধর্মচিন্তার নায়ক টলষ্টয়। নিশ্চিত পক্ষপাতিত্ব আছে জেনেও ধর্ম ব্যাপারে আমি খুঁজব শিক্ষিত নাস্তিক খৃষ্টান মিশনারীর বক্তব্য, ধর্মকে সে বর্বর কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেয় না। চিত্রকলায় আমি গড়্ডলিকা য়ুরোপীয়ের মত নিতে যাব না,—সে ভারতীয় স্থাপত্য চিত্র ভাস্কর্যের মর্ম অর্থ রীতিপদ্ধতি কিছুই বোঝে না। প্রথমেই আমি ফার্গুসনের মতো সর্বমান্য পণ্ডিতের অভিমত নেব ; তারপর মিঃ হ্যাভেলের মতো সমালোচকদের যদি পক্ষপাতদুষ্ট বলে বাদ দিতে হয় তাহলে কিছু অন্তত জ্ঞানের জন্য ওকাকুরা বা লরেন্স বিনিয়নের কাছে যাব। সাহিত্যে একটু মুশকিল, এমন তো একজনও পাশ্চাত্যের প্রতিভাবান লেখক বা সুপ্রসিদ্ধ সমালোচকের নাম মনে পড়ছে না যাঁর মূল সংস্কৃত সাহিত্য অথবা কোনো প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে,—আর অনুবাদ-নির্ভর যে বিচার তা তো শুধু ভাব নিয়ে কারবার,—ভারতীয় বিষয়ের এসব অনুবাদের অধিকাংশ আবার একান্তই নিষ্প্রাণ নীরস। অথচ এক্ষেত্রে গ্যেটের শকুন্তলা সম্বন্ধে বিখ্যাত উক্তিই আমার কাছে প্রমাণ যে য়ুরোপীয় সৃষ্টির পাশে ভারতীয় সৃষ্টি কিছুমাত্র নিকৃষ্ট বর্বরোচিত নয়।

তাছাড়া কখনো নিলে যেতেও পারে সুরুচিপূর্ণ প্রাজ্ঞ সাহিত্য-বিচারক—দুয়ের সমাবেশ বড় একটা হয় না—তাদের কাছে সাহায্য পেতে পারি। এরকম পরিস্থিতি অবশ্য পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মূল্যবোধের ঠিকানা দেবে না, তবে নিয়ুকুল গাফ আর্চার বেপরীদের হাতে পড়ার চেয়ে অনেক নিরাপদ।

তবে এই সব আয়ানঘাত বস্তুর যে উল্লেখ প্রয়োজন বোধ করছি, তার অন্য এক উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্যের জন্যও নি: আর্চারের রচনার আদ্যোপান্ত প্রয়োজন নেই, তার বহুলাংশ এতই অযৌক্তিক, অসংলগ্ন এবং হাবভাবে অসাধু যে শুধু দেখে চলে যেতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি পাঠককে আশ্বাসভরে যখন বলছেন, ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করেন আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে নিজের নাভির ওপর ত্রাটক করাই বিশ্বসত্য জানার শ্রেষ্ঠ উপায়, অথচ তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হল অনল স্থাণুত্ব এবং ভক্তের অনুগ্রহে জীবন পোষণ, তখন এরকম একাগ্র এক ধ্যানচিত্রের অপব্যাখ্যায় তাঁর মতলব দারুণ অসদ্ভাব্যতা ও স্বার্থ-পর নিশ্চেষ্টতা আরোপ করে ধ্যান জিনিসটিকেই অজ্ঞ ইংরেজ পাঠকের চোখে হেয় প্রতি পন্ন করা তাঁর এই অসাধু প্রয়াসে ধরতে পারি তাঁর যুক্তিবাদী মনের ভড়ং, তার অন্য কোনো উপযোগিতা নেই। যখন তিনি বলেন হিন্দুধর্মে নৈতিকতা কিছু নেই, নীতি প্রচার কখনো তার কাজ ছিল না—এসব প্রবচন সত্যঘটনার বিপরীত—যখন তিনি আরো বলছেন হিন্দুধর্ম একটা জাতির চারিত্র বৈশিষ্ট্য এবং তা হল 'সবকিছু' অস্বাস্থ্যকর ও বীভৎসের দিকে প্রবণতা, তখন স্বতঃই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে নীতিচর্চাগত সত্যভাষণ গুণটি নি: আর্চার আদৌ প্রয়োজন মনে করেন নি, অন্তত যুক্তিবাদীর ধর্মালোচনায় আবশ্যক ভাবেন নি।

কিন্তু না, নি: আর্চার গররাজি হয়েও সত্যের একটু প্রশংসা করে ফেলেছেন। একই নি:শ্বাসে তিনি আবার বলছেন হিন্দুধর্ম ন্যায় বিষয়ে অনেক কথা বলে এবং হিন্দু সাহিত্যে রয়েছে বেশ চমৎকার নানা নৈতিক দর্শন। কিন্তু এতে শুধুই প্রমাণ হয় যে হিন্দুদর্শন যুক্তিহীন,—নৈতিকতা সেখানে আছে অবশ্য, তবে থাকা উচিত ছিল না ; তার অস্তিত্ব নি: আর্চারের কাহিনীর সঙ্গে খাপ খায় না। যুক্তিবাদের ধ্বজাবাহীর এই যুক্তি, এই যুক্তি-বন্ধ পারম্পর্য দেখে হাততালি দিন! লক্ষ্য করুন, হিন্দুদের বাইবেলস্বরূপ রামায়ণের বিরুদ্ধে তাঁর একটি অভিযোগ হল যে এর আদর্শ চরিত্র রাম সীতা, ভারতীয় নরনারীর জীবন্ত আদর্শ আলেখ্য, তাঁর রুচির কাছে অতিরিক্ত নির্দোষ। মানুষী প্রকৃতির পক্ষে রাম অতিরিক্ত সাধু। আমি সত্যিই জানি না রাম খৃষ্ট বা সেন্ট ফ্রান্সিসের চেয়ে বেশি সাধু কিনা, তবে বরাবর ভেবেছি এঁরা মানুষের পরিধির মধ্যে ; তবে তার্কিকটি বোধহয় বলবেন, মানুষী আওতার মধ্যে হলেও তাদের অত্যধিক গুণাবলী অন্তত হিন্দুধর্মের দৈনিক আচারের মতো,—উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, একান্ত দৈহিক পবিত্রতা, শারীরিক পরিষ্কার

পরিচ্ছন্নতা, প্রতিদিন ধ্যান উপাসনায় ভগবানের দিকে মন ফেরান, "মানুষী সীমানার বাইরে সরাবার পক্ষে যথেষ্ট"। কারণ তিনি বলছেন সতী সাধ্বী স্ত্রীর আদর্শ সীতায় এত বাড়াবাড়ি সদ্‌গুণ যে "তা অনৈতিকতায় গিয়ে পড়ে।' অর্থহীন চতুর বাচন চূড়ান্ত বাচাল হয়ে পড়ে যখন এমন মূঢ়তায় গিয়ে ঠেকে। নিঃ আর্চারের বার বার ভারতীয় 'বর্বরতা' বলতে যেমন আমারও তেমনি দুঃখ হচ্ছে ওই বিশেষণটি ব্যবহার করতে, কিন্তু আমি নিরুপায়; 'ওতে ব্যাপারটির মূলরহস্য ধরা দেয়।' অবশ্য সবটা যদি এই ধরণের হত,—পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, পরিতাপের বিষয়,—তাহলে নীরব উপেক্ষাই তার যথাযথ উত্তর ছিল। কিন্তু ভাগ্যগুণে আপনো তো সর্বদা ভাঙবার মতো তাঁর ধনুকের ছিলা টানেন না; নিঃ আর্চারের তীরের ঝাঁক সবই বুনো হাঁসের পলায়ন নয়। তাঁর লেখায় অনেক বস্তু আছে যা অনাভিতভাবে কিন্তু বেশ সঠিকভাবে দেখায় ভারতীয় সংস্কৃতির অনবদ্য বৈশিষ্ট্যের প্রথম দর্শনে সাধারণ প্রতীচ্য মনের কেমন প্রতিক্রিয়া-সংকোচন—এটি লক্ষ্য করবার ভাববার জিনিস; এটির অর্থ বোঝা এবং মূল্য নিরূপণ করা প্রয়োজন।

এই প্রয়োজনটি আমি কাজে লাগাতে চাই; এ শুধু প্রয়োজন নয়, তারও বেশি কিছু। আমাদের এই এক বিশ্বমানব গোষ্ঠির এক বৃহৎ ভাগ থেকে আর এক ভাগকে তফাৎ করেছে যে মানসিক পার্থক্য তার মূল সবচেয়ে ভালো ধরতে পারি এই সাধারণের মনের ভিতর দিয়ে। শিক্ষিত মন এই আত্মপরিমার পক্ষপাতিত্বের ধারকে ভোঁতা করে দেয়, নয়ত অন্ততপক্ষে বিরোধ ও বৈরিতার মাঝেও মিলের সূত্রটি স্থাপন করতে চায়। সাধারণের মনে বাধার এই গ্রাম্য রূপটি ও তার বেগটি সঠিক ধরতে পারার সম্ভবনা বেশি। এখানেই নিঃ আর্চারের সাহায্য পাব চমৎকার। তার অর্থ নয় প্রয়োজনীয় জিনিসটি পেতে অনেক জাল-জঞ্জাল সাফ করতে হবে না। আমি অবশ্য খুশি হতাম যদি পেতাম অবোঝাবুঝির একটা সর্বগ্রাহী অথচ চটি বই, যাতে শাদা ভাষায় সোজা কথাটি থাকবে অথচ চালাকি ও সস্তা অলঙ্কার স্থান নেই। সেরকম কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে নিঃ আচারকেই ধরা যাক, তাঁর কিছু কিছু কুসংস্কারের বাবচ্ছেদ করে অন্তর্নিহিত মনস্তত্বটি দেখতে চাই। হয়ত দেখব যে এই যাবতীয় অপ্রীতির গ্রাম্যতার ভিতর দিয়ে পৌঁছেছি ইতিহাসের একটা মহাদৈশিক অবোঝাবুঝির সারতত্বে। এই জিনিসটির যথার্থ অর্থবোধ হলে একটা বোঝাবুঝির পুনর্মিলনের দিকে যেতে আমাদের সাহায্য করবে।*

---

* Foundations of Indian Culture

বিলাতের ডায়েরীর কয়েক পাতা

(ব্যক্তিগত বিবরণী)

এ. বি. পুরাণী

(পূর্বানুবৃত্তি)

অক্সফোর্ড আলোচনাচক্র ১৫ই হতে ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

কেম্ব্রিজের মতো অক্সফোর্ড একটি প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র যেখান থেকে ইংলণ্ডের বিভিন্ন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক নেতাই তৈরি হয়ে বেরিয়েছে। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, রাজনীতিতে অক্সফোর্ডের অবদান সুবিদিত। টেম্‌স্ নদী অক্সফোর্ডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত, এই সামান্য প্রাকৃতিক সুযোগকে ব্রিটিশ জাতি তাদের স্বভাবসুলভ দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। লণ্ডনের মতো এখানেই দেখা যায় নদীবক্ষে শ্বেত-হংসের দল ভেসে বেড়াচ্ছে—প্রত্যহ প্রাতে এ দৃশ্য অতি মনোরম। টেম্‌স নদী মাত্র ৩০ থেকে ৫০ ফুট চওড়া, তার দুই তীর সিমেন্টের জমাটতক্তা দিয়ে বোড়া। এই নদীতে নৌকাবিহার বাচখেলা ও পণ্যদ্রব্যের চালানীও হয়ে থাকে। এই নদীপথে অক্সফোর্ড থেকে লণ্ডনেও যাতায়াত করা চলে।

এখানকার জনসংখ্যা এখন শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে গেছে। এর সংকীর্ণ প্রাচীন রাস্তাগুলির ধারে ধারে ১২টি কলেজ স্থাপিত। রক্ষণশীল ব্রিটিশ জাতি বিশ্বাস করে যে উন্নতি করতে হলে আপন রক্ষণশীলতাই বজায় রাখা দরকার। যেমন, এখানকার সমস্ত কলেজগুলি একমাত্র বেলেপাথর দিয়ে গাঁথা, যদিও ইংলণ্ডের আবহাওয়াতে তা পাঁচ দশ বছরের মধ্যে নোনা লেগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং সারা বছর ধরেই নতুন নতুন বেলেপাথর দিয়ে পুরানো পাথর বদলানোর কাজ চলতে থাকে। তবু এখানকার লোকে ওর বদলে গ্র্যানিট বা সিমেন্ট ব্যবহারের কথা ভাবতেই পারে না। এখানকার বোড্‌লিয়ান লাইব্রেরির প্রাচীন অংশ যেমন শুধু কাঠের তৈরি ছিল তেমনই এখনও আছে, অথচ তারই মধ্যে টেলিফোন, লিফ্‌ট, ইলেক্‌ট্রিক ও ঘর গরম করার আধুনিক ব্যবস্থাদি সমস্তই করা হয়েছে।

এখানকার ছাত্রদের কঠোর জীবন—নিজেদের ব্যাগ ও বইএর বোঝা কাঁধে বয়ে কিংবা সাইকেলে নিয়ে যাতায়াত করে—তাদের আত্মনির্ভর হতে হয়। শিক্ষকদের মধ্যে ছোটো থেকে বড়ো নানা স্তরভেদ আছে— টিউটর, সিনিয়র টিউটর, ডন, লেকচারার,

প্রফেসর ইত্যাদি। আর সকলেরই শাসনকর্তৃত্ব আছে। এই আবহাওয়ার মধ্যে থেকে ছাত্রেরা সংযত হতে শেখে। তাদের সামাজিক খাদ্যব্যবস্থা কঠোরভিক্ষুতার পরিচায়ক। প্রফেসররা কলেজের মধ্যেই বাস করে পুরো টার্ম পর্যন্ত। তাদের বিভাগে ছাত্র না থাকলে তারা আপন আপন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

সকল প্রফেসরই আপনাপন বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং জ্ঞানপিপাসু ছাত্রেরা তাদের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এ কথা আমি জানলাম ষ্টীমারে যাত্রাকালে। এলিংওয়ার্থ নামে একজন অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েট ঐ ষ্টীমারে যাত্রী ছিল, আমি অক্সফোর্ড যাচ্ছি শুনে সে তার প্রফেসর সি, এস্, লুইসের সঙ্গে দেখা করতে বললে আর একটি খামের উপর তার নাম লিখে দিলে। আমি যখন বললাম যে তোমার নামটিও এতে লিখে দাও, সে তখন অনেক ইতস্তত করে তার নিজের নাম লিখে বললে, "আমার নামটা এই নামের সঙ্গে লিখতে বাধ্য হলাম বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি তাঁর সঙ্গে সমান হবার যোগ্য বা তাঁর সঙ্গে আমার কোনো তুলনা হতে পারে।" পরে জানলাম সে ঐ প্রফেসরের ছাত্র ছিল।

কলেজের মধ্যে বড়ো বড়ো সবুজ ঘাসের লন এখানকার বিশেষত্ব। এই লনের সম্যক পরিচর্য্যার জন্য ইউনিভার্সিটিতে এক স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। প্রত্যেক ইউনিভার্সিটির স্বাধীনসত্তা আছে এবং পার্লামেন্টে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ওখানকার শতকরা ৭৫ জন ছাত্রই স্কলারশিপ ভোগ করে। যুদ্ধের সময় ছাত্রদের ভিতর থেকে সৈনিক ও অফিসার সরবরাহ করা হয়, আমার উদ্দেশ্য ছিল ওদের "সমসাময়িক ব্রিটিশ দর্শন তত্ত্বের আলোচনা-চক্রে যোগ দিয়ে প্রধান প্রধান দার্শনিকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এই আলোচনা-চক্রের দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করি। বৈঠক বসতো সাধারণত সকালে ৮।।টার সময়, তখন খুব শীত থাকায় দরজাগুলি বন্ধ রাখা হতো। বৈঠক শুরু হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রায় সকলেই ধূমপান শুরু করে দিত। যিনি ভাষণ দিচ্ছেন তিনিও পনের মিনিটের মধ্যে ধূমপান শুরু করতেন। ২৫ ফুট ২৫ ফুট মাপের একটি ঘরের মধ্যে ৫০।৬০ জন ব্যক্তি যদি একত্রে ধূমপান করতে থাকে আর দরজাগুলি সব বন্ধ থাকে তাহলে কেমন অবস্থা হয় বুঝে দেখ! এই ধোঁয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমি পাশের জানলাটা খুলে দিতাম। বৈঠকের তিন চার ঘণ্টা সময়টুকুর জন্য এই সব দার্শনিকরা ধূমপান না করে থাকতে পারেনা, ভেবে আমার আশ্চর্য বোধ হতো! অন্ততপক্ষে বক্তা তার থেকে বিরত থাকবে এটাই আশা করতাম।

আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে যাঁরা দর্শন নিয়ে আলোচনা করছেন তাঁদের দর্শনের সঙ্গে জীবনযাত্রার অনেক পার্থক্য। অবশ্য জীবনে কোনো আরাম থাকবেনা এমন কথা নয়। কিন্তু বৈঠকের শেষে যে সকলে মিলে "শেরীপানের পার্টিতে" যোগ

দিত, তাতেই আমার চোখে সেটা বিসদৃশ ঠেকতো। জীবন আর দর্শনে যদি এতটাই পার্থক্য থেকে যায় তাহলে দার্শনিকতা চিরদিন বন্ধ্যা হয়েই থাকবে।

অক্সফোর্ড আলোচনাচক্র

ব্রিটিশ কাউন্সিলের তরফ থেকে এই সার্থক সম্মেলন আহ্বানের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এতে অক্সফোর্ডের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি অনেক ছিল এবং বাইরের থেকেও বেশ কয়েকজন এসে যোগ দিয়েছিল। সকল ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে করা হয়েছিল। মিঃ টমলিন, মিঃ বাক্, মিস্ চিজলি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি যাতে সকলের থাকা ও কাজ করা সম্পর্কে কোনোরূপ অসুবিধা না হয়। কিন্তু অক্সফোর্ড সম্প্রদায়ের মতামত ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতামতও যদি ওখানে ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া হতো তাহলে দুইরূপ উদ্দেশ্যই সফল হতে পারত। কারণ বাইরের লোকের কাছে এটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে কেবল অক্সফোর্ড স্কুলের মতামত জাহির করবার জন্যই এমন আলোচনাচক্রের অবতারণা। ভাষণপাঠ ও তাই নিয়ে আলোচনাদি ছাড়াও পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ঘটবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, এবং আমার মনে হয় সেটাই এরূপ সম্মেলনের বিশেষ উপকারিতা। ওতে সকল দিক থেকেই দেখা যায় যে সমসাময়িক ব্রিটিশ দার্শনিক-বাদের মধ্যে অক্সফোর্ড স্কুলের দর্শনই সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত ও মুখর এবং সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সকল স্থানে এর শিক্ষাই প্রধান স্থান অধিকার করতে প্রয়াসী। এর নেতাস্থানীয় হলেন রাসেল এবং মুর, আর সেই নেতৃত্বাধীনে ষাটজন ব্যক্তি এর শিক্ষাদান করছে। তথাপি এ কথাও বলা উচিত যে আলোচনাচক্রে সকল দিক থেকেই বন্ধুত্ব-পূর্ণ মনোভাব নিয়ে উচ্চস্তরের আদানপ্রদান হয়েছিল।

এটা দেখে বিশেষ আনন্দ হলো যে আলোচনাতে যারা যোগদান করেছিল তাদের কারো মধ্যেই রেষারেষির মনোভাব ছিলনা, সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাব নিয়েই তারা পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। এমন কি যারা অক্সফোর্ডেই কাজ করছে তাদের মধ্যেও যে মতের মিল ছিল এমন কথা নয়। প্রফেসর প্রাইস ও প্রফেসর উইসম্যানের মত ছিল বিভিন্ন—এমন কি দর্শনতত্ত্বের মূলগত পার্থক্য।

এই কথা আমার মনে হলো যে রাট্রাণ্ড রাসেলের পরে অক্সফোর্ড একটা নিজস্ব শিক্ষাকৌশল আয়ত্ত করেছে এবং সকল দার্শনিকই অধিবিদ্যাকে এই কৌশলের গণ্ডীর মধ্যে এনে ফেলতে চাইছে। বলতে পারিনা আমার এ অভিমত অভ্রান্ত কিনা। কিন্তু মেখলাম যে উপস্থিত সকলেরই উপর এ জিনিসকে মেনে নেবার জন্য যথেষ্ট চাপ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যেজন এই শিক্ষাধারার অন্তর্ভুক্ত নয় তার পক্ষে ওটা মেনে নিলে তাতে তার অর্ধেকেরও বেশি সূত্রগুলিকে ছেড়ে দিতে হয়, কারণ এ প্রণালী

পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সমীক্ষার উপর নির্ভর করে, এটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সমর্থনের উপর বিশেষরূপে নির্ভরশীল এবং এর দৃষ্টিভঙ্গী বিজ্ঞানের তরফ থেকেই নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞানের জগৎজোড়া বিজয় ও তার ক্রমপ্রসারিত প্রভাব এর দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে, যদিও তা ন্যায্য তথাপি আমার মনে হয় যে তার বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মধ্যে যে উঁচুদরের সত্য আছে সে কথা সত্য, কিন্তু প্রশ্নটা এখানে তাই নিয়ে নয়—প্রশ্ন এই যে বাহিরের দিক ও ভিতরের দিক থেকে দার্শনিক চিন্তাধারার পক্ষে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীই একমাত্র অনুসরণীয় পন্থা কিনা।

অক্সফোর্ড ধারা চাইছে অধিবিদ্যাকে সাধারণ ভাষার আওতার মধ্যে এনে ফেলতে; ওদের মতে যা কিছু অধিবিদ্যা সম্পর্কীয় সমস্যার (যাকে ওরা বলে পরস্পরবিরোধী কূটাভাস) সৃষ্টি হয়েছে ভাষারই অপপ্রয়োগ ও তার ত্রুটি হতে। সুতরাং দার্শনিকদের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী কাজ হলো সঠিক ভাষাতে সঠিক ভাবে প্রশ্নগুলিকে স্থাপন করা।

কিন্তু যে ব্যক্তি অক্সফোর্ড ধারার অনুগামী নয় সে ন্যায্যভাবেই প্রশ্ন করতে পারে যে অধিবিদ্যার সম্বন্ধে এই যে দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া হচ্ছে এটা ঠিক যুক্তিযুক্ত হচ্ছে কিনা, এটাই একমাত্র পন্থা কিনা এবং শেষ পর্যন্ত এটাই সর্বোত্তম পন্থা কিনা।

অক্সফোর্ড দার্শনিকেরা চাইছে বিশ্লেষণ ও পুনর্নিরূপণ, যুক্তিধর্মী অ্যাটমিয়ুম্ ইত্যাদি, অর্থাৎ অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানে পরিণত করা। তারা মনে করে যে জড়বস্তুর অ্যাটমের মতো এরও এমন ভিত্তিগত প্রত্যয়বস্তু আছে যাকে সাধারণ ভাষাতে ব্যক্ত করা যায়। অর্থাৎ যেমন বাস্তব অ্যাটমের দ্বারা বস্তুজগৎ গড়ে ওঠে তেমনি "যুক্তি অ্যাটমের" দ্বারা অধিবিদ্যার কাঠামো গড়ে তোলা যাবে। আর দর্শনের কথা এমন সহজ হয়ে গেলে আর অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট ভাষায় তৈরি অধিবিদ্যার দরকারই থাকবেনা, এই ওদের অভিমত। তার মানে ওরা প্রমাণ করতে চাইছে যে অধিবিদ্যাকেও বিজ্ঞানে পরিণত করা যায়। তাই ওরা সাধারণ ভাষা ও সাধারণ যুক্তি দিয়ে ওদের "বিশ্লেষণ" ও "পুনর্নির্মাণ" বোঝাতে চেষ্টা করে, তার ফলে উল্টে কিন্তু ওরা সাধারণ ভাষা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। যেমন হয়েছিল বিজ্ঞানের বেলায় গত শতাব্দীতে। বিজ্ঞানীরা আত্মা বা মহাপ্রাণীর কথা উড়িয়েই দিলে কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধের সাহায্য নিয়ে তারা জড়কে স্বীকার করলে এবং বললে যে এই জড়বিদ্যার গবেষণার দ্বারা তারা মডেল বিশ্ব তৈরি করে দেখাবে। দেড়শো বছরের বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে দেখা গেল যে জড়ের কোনো ব্যাখ্যা নিরূপণ করা যাচ্ছেনা এবং যে বস্তুবিশ্বকে সাধারণ মানুষও দেখতে পাচ্ছে তার মডেল করে দেখাবার বদলে এমন এক গাণিতিক ইকোয়েশন খাড়া করলে যা জগতের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ মাত্রই বুঝতে পারে। অক্সফোর্ডীয় দার্শনিকদেরও প্রায় সেইরূপ ব্যাপার, কারণ আমি কয়েকটি অধিবেশনে দেখলাম যে বড়ো বড়ো প্রফেসররা এমন

বিশিষ্ট ভাষায় বলছে যে দর্শনের ছাত্রদের পক্ষেও তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা। এ "বিশ্লেষণ"-রীতি যে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তা দেখলাম এক বৈঠকে, যেখানে ষাটজন ব্যক্তি নিলে চার ঘন্টা যাবৎ এই বিষয় নিয়ে ভাষণপাঠ ও আলোচনা করতে থাকল, "বাক্য কী ও বচন কী?" দার্শনিকরা যদি চিন্তা, বোধি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিবর্তে ভাষাকেই এমন গুরুত্ব দান করে তাহলে বৈয়াকরণিক ও ভাষাবিদ্ ও সমাজবিদ্দের করবার কি রইল।

আগেকার অধিবিদ্যার সম্বন্ধে ওদের এই নালিশ ছিল যে তার ভাষা অস্পষ্ট ও তা জীবন থেকে দূরে সরে যায়, কিন্তু ভাষার নির্দিষ্ট নিরূপণ করতে গিয়ে ওরা যে জীবনের কাছে আসতে পেরেছে তা মনে হয়না। ব্রাসেলের অনুগামী নেতারা তাদের জীবন-দর্শনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চায়। তারা বলে যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির দ্বারাই সকল মানব-সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু তার জন্য সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব বদলানো দরকার, সে পরিবর্তন কেমন করে আসতে পারে তা কিন্তু অজ্ঞাত।

অক্সফোর্ডের আলোচনাচক্রে প্রথম আলোচনার সময় কথা হলো "মানুষের ধারণা-যন্ত্র" এই প্রসঙ্গ নিয়ে। মোটামুটি সমগ্র যুক্তিতর্কগুলি হলো এই ভিত্তির উপরে যে মানুষের ধারণাযন্ত্র হলো একটা নির্দিষ্ট রকমের স্থায়ী জিনিস। সম্ভবত আলোচক এটাই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিলেন যে মানুষের—অন্ততপক্ষে সাধারণ মানুষের—এ যন্ত্র মানব ইতিহাসের পূর্বাপর এক ভাবেই আছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন রয়ে গেল এই যে মানুষের ব্যবহৃত জ্ঞানযন্ত্রের পরিবর্তন হতে পারে কিনা। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি-সীমাকে আমরা বাড়িয়ে নিতে পারি মাইক্রোস্কোপ ও টেলিস্কোপ প্রভৃতির দ্বারা। মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রকেও তেমনিভাবে বাড়াতে পারার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা? যদি তা থাকে তাহলে মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রের উন্নতির অনুপাতে বর্তমান অবস্থার জ্ঞানযন্ত্রেরও সেইরূপ সীমার প্রসার ও উন্নতি হতে পারবে।

আলোচনার মধ্যে আগাগোড়াই চিন্তারীতির উপরে ঝোঁক দেওয়া হলো, কিন্তু তদনুযায়ী কোনো জীবনরীতির উপর নয়। অবশ্য এমন কথা বলা যেতে পারে যে এই বিশ্লেষণধর্মী দর্শন হতেই পরে একটা জীবনরীতির সূচনা হবে। সে ক্ষেত্রে তাহলে অপেক্ষা করে দেখতে হয়।

বিশ্লেষণ প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় যে সমস্ত মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে কেবলই প্রযুক্তিকৌশলের দিকে, সমস্যা সমাধানের দিকে নয়। পরিষ্কার করবার জন্য বিশ্লেষণ তা বুঝলাম, কিন্তু তা কিসের? আগেকার যত দার্শনিক ছিলেন তাঁদের ও তাঁদের চিন্তার বিশ্লেষণ, কিন্তু অক্সফোর্ড বিশেষজ্ঞদের নিজস্ব কিছু আছে কিনা যা পরিষ্কার

করে সহজ করে বলা দরকার। তা ছাড়া কেবল বিশ্লেষণ করাই মানব-মনের একমাত্র বা প্রধান বৃত্তি কিনা। দর্শনের কাজ কি শুধুই বিশ্লেষণ করা?

আলোচনাগুলির ভিতর থেকে একটা বিশিষ্ট কথা যা বোঝা গেল তা এই যে যত্ন কোর্ড দার্শনিকরা সাব্যস্ত করে নিয়েছেন যে ভৌতিক যা-কিছু তাই কেবল সত্য বাস্তব। তারা প্রত্যেক দার্শনিক-তত্ত্বের ভৌতিক প্রমাণ চায়, কিন্তু তা হতে পারেনা যদি ভৌতিক ছাড়া অন্য কিছুই বাস্তব নয় এ কথা না মানি। কিন্তু তা যদি মানি তাহলে এই যে সব ক্রিয়াশীল বাস্তব, যেমন উচিত্যবোধ, ন্যায়বোধ, মুক্তিবোধ, গণতন্ত্রবোধ ইত্যাদি, এগুলো কি? যদি বলো যে ভৌতিকের মধ্যেই ওর বাস্তবক্রিয়া, তাহলে কোন ইন্দ্রিয়বোধের মধ্যে আমরা মুক্তিকে বা ন্যায়ধারণাকে এনে ফেলতে পারি? ও-বিষয়ে আমার যথেষ্টই সন্দেহ আছে। অবশ্য আগেকার অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে এই কথা বলবার আছে যে অস্তিত্বকে বোঝবার চেষ্টা না করে তারা অনস্তিত্বকে বাস্তব বলে প্রকট করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেখানেই তো আসল প্রশ্ন। অস্তিত্ব কোনটা? যদি বলি যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা প্রত্যক্ষ করা যায় তাই শুধু অস্তিত্বজ্ঞাপক তাহলে মানুষের অনুভূতিকে খুবই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা হয় এবং তাকে তার উচ্চতর ও সমৃদ্ধতর উৎকর্ষ ও অনুভূতির ক্ষেত্রগুলি হতে বঞ্চিত করা হয়।

আগেই বলেছি যে বিশ্লেষণ করা দার্শনিকের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো কাজ নয়, এবং বিশ্লেষণশক্তিই যে মানুষের সব চেয়ে বড়ো শক্তি তা নয়। বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা জিনিষটাকে তার পৃথক পৃথক অংশে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভালোভাবে বোঝবার চেষ্টা করতে পারি এবং তার সম্বন্ধে একটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারি, কিন্তু সংশ্লেষণই হলো তার চেয়ে বড় গুণ যার দ্বারা আমরা নতুন কিছুর সৃষ্টি করতে পারি এবং সমগ্রের দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে পারি। এই সব দার্শনিকরা বলে যে আগে আমাদের জানা দরকার যে ব্যাপারটা কি, কিন্তু সেখানেই তো সমস্যা কেমন ক'রে তা জানা যাবে? তাছাড়া যাকে আমরা দর্শন বলি তা হলো জীবনের একটা ধারা অথবা আজ পর্যন্ত জীবনের একটা ধারার নির্দেশ ক'রে থাকে। বিশ্লেষণ কি জীবনধারার কোনো বিশেষ রকমের নির্দেশ দিতে পারে, কেবল বৈজ্ঞানিক ও বস্তুতান্ত্রিক ভাবে বলা ছাড়া যে বাহ্য যা কিছু দেখছি তাই বাস্তব?

এই সব দার্শনিকরা কোন কথা পরিষ্কার করে বলতে চায় তাই বোঝা খুব কঠিন হলো। একজন কারো বক্তব্যকে বা প্রতিপাদ্যকে বা যাকে ওরা বলে প্যারাডক্স (কূট-ভাস) তাকেই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছে। অবশ্য তাতে এই সুবিধা হয় যে তাতে একটা বিধিবদ্ধ দর্শন নিরূপিত হয়। ওরা এই কথাই আমাদের বলতে চায় যে দর্শনের প্রকৃত কাজ কোনো সত্য বা মানবজাতিকে বা জীবন বা কোনো কিছুর সম্বন্ধেই একটা মতের নির্দেশ করা নয়, কেবল প্রত্যেকটি উক্তিকে বা প্রতিপাদ্যকে ও প্যারাডক্সকে নিয়ে

তারই পরীক্ষা করতে থাকা। দ্বিতীয়ত এরা সাধারণ বুদ্ধির উপরেই খুব ঝোঁক দেয় যা এই কথাই মানে যে ভৌতিক বাস্তবের জগৎই একমাত্র বাস্তব বলে স্বীকার্য। তাছাড়া কে তার বিচার করবে যে "সাধারণ ধারণা" ও "সাধারণ বুদ্ধি" বলতে কি বোঝায়?' ওরা একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ "নৈতিক" শব্দটিকে নিয়েছে। কিন্তু "নৈতিক" শব্দের সাধারণ প্রয়োগ কিরূপ হবে? আর কোনো একটা নতুন সৃষ্টি বা নতুন সত্য যদি উপস্থিত হয় তাকে মানুষের আত্মা জীবনের মধ্যে গ্রহণই বা করে কেন? এই প্রশ্নের জবাব নেওয়া উচিত যে কেবল কুটাভাস ও জটিলতাকে দূর করাই দর্শনের একমাত্র বড়ো কাজ কি না।

ব্রিটিশ দর্শন লক্ ও হিউমের বৈচারিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে বর্তমান অধিবিদ্যা-বিরোধী যুক্তিতে বলছে যে এটা হলো আগেকার আদর্শমূলক দর্শনের প্রতিক্রিয়া—সচেতন প্রতিক্রিয়া। ব্র্যাড্‌লি বললেন যে কাল হলো অবাস্তব জিনিস, এবং সাধারণ বুদ্ধি এ কথার প্রতিরোধ করলে। ব্র্যাড্‌লি বোধকরি বলতে চেয়েছিলেন যে সাধারণ বুদ্ধির তরফের কথা না হলেও কালের অবাস্তবতা আমাদের অনুভূতিগ্রাহ্য হওয়া চাই। তা কি কবি ও শিল্পীদের মধ্যে হয়না?

আদর্শবাদের ধারা চলেছিল ১৮৭০ সাল থেকে টি, এইচ, গ্রীণ হতে এফ, এইচ, ব্র্যাড্‌লি পর্যন্ত। ব্র্যাড্‌লির সিদ্ধান্ত হয়েছিল গুহ্যতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার ফলে। রাসেল কিন্তু ব্র্যাড্‌লির প্রতিবাদ করেন গাণিতিক বা প্রতীকধর্মী যুক্তিবাদের অবতারণা করে। এই যুক্তিবাদ তখন খুবই প্রাধান্যলাভ করেছে। ব্র্যাড্‌লি প্রভৃতি কন্টিনেন্টাল দার্শনিকদের মতবাদকে এই বলে সমালোচনা করা হয় যে তাদের উক্তি সবই "ভ্রান্ত উক্তি" এবং তা "অযৌক্তিক" বা "অপরীক্ষাসাধ্য"। নতুন মতবাদ এমন কি ঐ সব উক্তির প্রমাণ তলব করলে। এই সব দার্শনিকরা ঝোঁক দিচ্ছে "বাস্তব তথ্যের" উপর বা তারই "ভাষা নিরূপণের" উপর। সেটাই অধিবিদ্যার যেন প্রকৃত কাজ। এই সব তথ্যের কথা তারা বলে গাণিতিক নিদর্শনের ভাষাতে, যা সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধির কাছে অর্থহীন প্রলাপের মতো। কিন্তু কবি যখন তার কাব্যকথাগুলি বলে তখন আমরা তাকে প্রলাপ বলিনা। অধিবিদ্যার কাজ হলো জগৎ সম্বন্ধে এমন চিন্তা-ধারা অথবা ব্যাখ্যার নির্দেশ করা যাতে আমরা জগৎকে সমগ্রভাবেই এক বলেই জানব, —তার মধ্যে কোনো বিতর্ক বা মতভেদ থাকবে না। ব্রিটিশ দার্শনিক হয়তো বলবে যে সে সব হয় ভুল বোঝা যুক্তিবাদের ফলে। কিন্তু দার্শনিকের কাছে আমরা কেবল জানতে চাই না যে "কেমন দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে", কিন্তু আমরা জানতে চাই "কেন তেমন দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে।" আমরা যখন আগেকার দার্শনিকদের এই বলে সমালোচনা করি যাকে অক্সফোর্ড স্কুলের বর্তমান দার্শনিকরা বলে একটা তাদের মতো দৃষ্টিভঙ্গীর নির্দেশ

দেওয়া, তখন কিন্তু এ কথাও কি বলা চলেনা এরা এদের বিশ্লেষণ ও পুনর্গঠনের প্রণালীর দ্বারা নিজেদের ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর নির্দেশ দিচ্ছে। যখন বাস্তব তথ্য ও অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে এত কথাই বলা হচ্ছে, তখন তার উপরে এটা বলাই যুক্তিযুক্ত যে একই সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে মানুষের অনুভূতিকে সমগ্রভাবে দেখলে সে অনুভূতির স্তরবিভিন্নতার দ্বারাই তার সমুচিত ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ মানুষের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ধাপে ধাপে উঠে যায়, প্রথম স্থূলদেহ থেকে শুরু করে, তার পরে প্রাণের অনুভূতি, তার থেকে ভাববৈচিত্র্য ও বুদ্ধিবৃত্তির অনুভূতি, এবং সেখানেই তার শেষ নয়। বুদ্ধির পরেও আরও শক্তিগর্ভ অনুভূতি আছে যা বিবর্তনের বাধানে ক্রমশ প্রকট হয়ে তা মানুষের পক্ষে বাস্তব হয়ে উঠবে।

এই আলোচনা চক্রের কথাবার্তার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যে অধিবিদ্যা বিভাগকে ছেঁটে বাদ দিয়ে সবই বিজ্ঞানের মধ্যে নিয়ে আসা আধুনিক ব্রিটিশ দার্শনিকতার পক্ষে দরকার হচ্ছে কিনা। মূর বলেন যে দার্শনিক কূটাভাসগুলিকে বর্জন করাই উচিত যেহেতু তা সাধারণ-বুদ্ধির প্রতিরোধী, কিন্তু তাতে কি ওরূপ প্রশ্নকে টেনে আনা হয় না?

উপলব্ধি নিয়ে যে আলোচনা হলো তাতে প্রায় সাব্যস্তই হয়ে গেল যে জ্ঞানলাভ হলো ইন্দ্রিয়ানুভূতির জিনিস। সুতরাং দার্শনিকের পক্ষে ইন্দ্রিয়ানুভূতির জ্ঞান থাকা দরকার। অনুভূতির চর্চা করতে হবে তার দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হতে পারে তারই জন্য। আগেকার অনুভূতিতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্রিটিশ দার্শনিকদের আপত্তি এই যে তাতে তাদের নিজেদের মনের ভিতরকার জিনিসকেই টেনে আনে, নিছক অনুভূতিকে নয়। লক্, বার্কলি ও হিউম এই তিনজন ব্রিটিশ দার্শনিক দেখিয়েছেন যে অনুভূতির ভাবটি কেমন করে প্রকট হয়ে ওঠে।

১৭ই তারিখের আলোচনাতে একজন তরুণ দার্শনিক পুরো এক ঘন্টার অধিককাল ধরে কেবল যুক্তির কাটাকাটির খেলা দেখালে।

১৮ তারিখে বি. এ. ও. উইলিয়ম্‌স্ ব্যক্তিগত একাত্মতা নিয়ে আলোচনা করলেন। তাঁর গভীরতার চেয়ে চাতুর্য বেশি, কারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব ও তার একাত্মবোধ নিয়ে তাঁকে বিচার করতে হলো। বাড়ি এবং ছায়ার কথা বলে তিনি দেখাতে চাইলেন যে স্মৃতি কাজ করে ব্যক্তিগত একাত্মভাব সম্পর্কে। সনতাবোধের ব্যাপারে স্মৃতির অনুসরণই নির্ণায়ক হয়না। তার অনেক জলন্ত দৃষ্টান্ত আছে। দুটি জিনিষের ছায়া যদি একত্রে মিশে যায়, তাহলে কি তা একই জিনিস থাকবে না কোনো তফাৎ হবে? সেখানে কি একটি ছায়া হবে না দুটি? যদি বলি যে সেই একটাই ইংরেজের বাড়ি একজন আমেরিকান কিনেছে, তার মানে তা কি সেই একটাই বাড়ি থাকবে না? একই বাড়ি রইল কথাটার মানে কি? তার অংশগুলি ব্যক্তিগত বলেই কি তাই, যেমন বলা যেতে পারে যে ধার্মিক যদি মদ্যপায়ী হয় তথাপি সে একই ব্যক্তি?

কঠিন ডানায় ওড়া

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বীরবাহু

পুনরায় পট পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়া গেল। বিমানবহরে যতদিন ছিলাম, দিনের পর দিন পট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রত্যহই নূতন কিছু ঘটনার প্রবাহ ঘটিয়াছে। এমন কি দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারেও। নিত্য নতন এমন কিছু উপসর্গের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যে, কখনও পুরাতন কোন ঘটনার পুনরাভিনয় নিরস বোধ হইতে দেয় নাই। পুরাতনের মধ্যে নূতন কিছু দেখা বা অনুভব করা বোধ হয় তারুণ্যের একটা বিশেষ ধর্ম্ম। বিমান বহর চিরদিনই তরুণ। যেদিন তারুণ্যের অভাব হইবে সেদিন বোধ হয় বিমানবহরের প্রয়োজনও নিঃশেষ হইয়া যাইবে। সেদিন হয়ত আর শুধু এই পৃথিবী নয় দূরাকাশে ভ্রমণ করিয়া নূতন নূতন পৃথিবীর অন্বেষণে যাওয়ার আকাঙ্খাও ফুরাইবে। আর যদি দূরাকাশে ভ্রমণের প্রয়োজন বোধ না শেষ হয়, যদি এই মুহূর্ত্তে হাসিয়া খেলিয়া বাঁচিয়া রঙ্গ-তামাসা করিতে পারি, পরের মুহূর্ত্তের হয়ত শেষ খেলার কথা জানিয়া শুনিয়াও, তাহা হইলে বিমানবহরে তারুণ্যের অভাব হইবে না। তরুণ যন্ত্র কথিয়া ব্যবসায় করেনা। তরুণেরই গান "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাবিহীন।"

আমাদের চারবাটিয়ায় যাওয়ার পূর্ব্ব হইতেই বর্ম্মা এবং মালয় উপদ্বীপ হইতে জাপানীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া পুনরায় অধিকারের জল্পনা-কল্পনা নানা স্তরে হইতেছিল। একজন ব্রিটিশ ব্রিগেডিয়ার এই কাজের জন্য একটা খসড়া করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত সেই খসড়া তৎকালীন ব্রিটিশ সামরিক কর্ত্তারা, উপযোগিতার শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া, গ্রহণ করিলেন। শুনা যায় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিলও এই খসড়া দেখিয়া খুব খুসী হইয়াছিলেন এবং কিছুটা তাঁহার প্রভাবেই সামরিক কর্ত্তারা তাঁহাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া, একজন অপেক্ষাকৃত জুনিয়র সামরিক অফিসারের পরিকল্পনা গ্রহণ সাব্যস্ত করেন।

ব্রিগেডিয়ারকে জেনারেলের পদে উন্নীত করিয়া তাঁহাকেই এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্ম্মা উদ্ধারের উদ্যোগ পর্ব্ব ও যুদ্ধ পর্ব্বের ভার দেওয়া হয়।

জেনারেল উইন্‌গেট্ তাঁহার প্ল্যানের উদ্যোগে পর্ব্বে প্রথমে বর্ম্মার উপকূলে অবস্থিত জাপানের নৌবহরের উপর নজর দেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, বর্ম্মার উপকূলে অবস্থিত জাপানের নৌবহর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে জাপানী স্থল বাহিনীকে বিশেষ কিছু সাহায্য

করিতে সমর্থ হইবে না। তখন বিমান বহরের সাহায্য লইয়া ভারতীয় স্থলবাহিনী সহজেই জাপানের স্থলবাহিনীকে পরাস্ত করিতে পারিবে।

আমাদের হাড্‌সন্ বিমান এবং অন্য ছোয়াড্রনগুলির লিবারেটর বোমারু বিমানগুলি হইতে বর্ম্মার অভ্যন্তরে ও উপকূলভাগে অনবরতবোমা বর্ষণ হইল জেনারেল উইন্‌গেটের পরিকল্পনার উদ্যোগপর্ব্ব। অনবরত বোমা বর্ষণে জাপানের সামরিক শক্তির কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব। ইংরাজীতে বলে প্রসেস্ অব্ সফ্‌নিং (Process of softening); অনেকটা আমাদের "কিল মারিয়া কাঁঠাল পাকাইবার" মত ব্যবস্থা।

জাপানী সামরিক বিমানশক্তি আমাদের বিমানশক্তির তুলনায় ক্রমেই শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছিল। তাহার আভাষ তখনই আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছিলাম। আমাদের বিমানের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী বিমান একত্রিত না হইলে তাহারা আমাদের সাথে আকাশ-যুদ্ধ করিয়া বাধা দিতেছিলনা, তাহাতে আমরা যথেচ্ছ বোমা বর্ষণ করিতেছিলাম। এমন কি, অনেক সময় আমাদের একখানা হার্ডসন্ বোমারু বিমানকে একাকী পাইয়াও, তাহাদের দুইটি জিরো ফাইটার বিমান দূর পালা হইতেই অগ্র করিত। নিকটে আসিয়া বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিত না। আমাদের বিমান তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে গেলেই, তাহারা তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িত। তাহাদের ফাইটার বিমানগুলি সব সময় সংঘর্ষ হইতে গা বাঁচাইয়া দূরে দূরে অবস্থান করিবার প্রয়াসে ছিল।

আমরা কাজের ব্যস্ততাতে একেবারে মগ্ন ছিলাম। বিমানগুলি বোমা লইয়া উড়িয়া যায় আট দশ ঘন্টা পরে ফিরিয়া আসে। ফিরিবার পর কলকব্জা সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া যে সব অংশ বিকল হইয়া গেছে, সেগুলির পরিবর্ত্তে নূতন অংশ লাগাইয়া, বিমান চালু করিয়া, বিমান উড়িবার উপযোগিতা পরীক্ষা করিবার পর আর্ম্মারার বৈমানিক-দিগকে সাহায্য করা একটা প্রাত্যহিক কর্ম্মে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। আর্ম্মারার বৈমানিকরা বোমা ও বন্দুকের গুলির মালা পরীক্ষার পর বিমানে সুচারুরূপে সন্নিবেশ করিয়া রাখিত। তাহার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই বিমানের ক্রুরা আসিয়া সামান্য শিষ্টভাষণের পর বিমানের উড়িবার উপযোগিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিত। কখনও কখনও বিমানের বিশেষ কোন কলকব্জার কথাও জিজ্ঞাসা করিত। কেমন করিয়া সেই অংশ কাজ করে? কেন করে? বিকল হইয়া গেলে কি করা কর্ত্তব্য? গতবার বিকল হইয়া যাওয়ায় ক্রুরা বিকল অংশের কাজ এই উপায়ে সম্পন্ন করিয়াছিল; তাহাদের কাজ কি নির্দ্দেশ মাফিক হইয়াছিল না ভুল হইয়াছিল? এবং এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। অনেক সময় এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকদের সমাধান ক্রুদের

মনঃপুত হইত না। তখন বাদানুবাদ না করিয়া এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকরা পুস্তকের সাহায্য লইত। ক্রুদের পুস্তক দেখাইলে তাহারা ক্ষান্ত হইত।

ক্রুদের সাথে এঞ্জিনীয়ারদের একটা সৌহার্দ্য ছিল। এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকরা সব সময় বিশেষভাবে অনুভব করিত, উড়িবার কালে আট দশ ঘন্টা সময় ক্রুদিগকে যে বিশেষ কাজ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য কাজে মন দিবার মত সময় তাহাদের নাই। কোন অংশ বিকল হইলে কি করা কর্ত্তব্য, বা বিকল অংশ মেরামত করার কি উপায়, এত কথা ক্রুদের ভাবিয়া দেখারও সময় নাই। সর্ব্বোপরি আর একটা কথা বৈমানিকরা সব সময় উপলব্ধি করিত যে, ক্রুরা আট দশ জন মানুষ একটা ছোট বদ্ধ উড়ন্ত ঘরে বন্দী অবস্থায় কাজে ব্যস্ত রহিয়াছে। আর এই কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়াও সকলেই অস্পষ্ট ভাবে জ্ঞাত রহিয়াছে যে এই হয়ত শেষ বারের ফ্লাইট; যে কোন সময় জাপানী জিরোর আক্রমণে বা বিমান-মারা কামানের গোলায় বিমান শুদ্ধ ক্রুরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে। এত গুরুতর অবস্থার মধ্যে উড়িবার সময়, বিমানের কোন অংশ বিকল হইয়া যাওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, একথা এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকরা সব সময় নিজেদের মনে রাখিত।

এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকদের, যাহাদের সাধারণতঃ বিমানে উড়িবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তাহাদের পক্ষে সব ক্ষেত্রে এই সহানুভূতি বোধ করা কঠিন হইলেও, আমাদের স্কোয়াড্রনে নানা উপায়ে এই বোধ সব সময় জাগ্রত রাখার চেষ্টা হইত। যাহারা বিমানে উড়িবার জন্য প্রস্তুত, আর যাহারা বিমানকে উড়িবার জন্য প্রস্তুত করিবে, এই দুই দলের মধ্যে একটা হৃদ্যতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন; সব সময় ভাবের আদান-প্রদান প্রয়োজন, যাহাতে প্রত্যেক দলই অন্য দলের সুবিধা-অসুবিধা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বুঝিতে পারে। যে স্কোয়াড্রনে এই ব্যবস্থার অভাব হইয়াছে, যখনই একদল অন্যদলের সুবিধা-অসুবিধা না বুঝিয়া কানুন আর নৈতিক কর্ত্তব্যবোধের দ্বারা এই ব্যবস্থা চালু রাখার চেষ্টা করিয়াছে, সেখানেই নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত ত হইয়াছেই, তাহা ছাড়াও অনেক সময় অসম্ভব অবাবস্থার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকদের কর্ম্মে শৈথিল্যের জন্য বিমানশুদ্ধ বৈমানিকরা প্রাণ হারাইয়াছে, এবং তাহার পর এঞ্জিনীয়ার বৈমানিককে কঠোর শাস্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু শুধু শাস্তির ভয়ে কর্ত্তব্যের বোধ, সব সময় সাধারণ মানুষের বোধে আসে না। ভয় ছাড়া অন্য আর এক বোধ আছে, যার দ্বারা সব মানুষকেই সব সময় কর্ত্তব্যবোধে সজাগ রাখা সম্ভব। আমাদের স্কোয়াড্রনে স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরীর জন্য সেই বোধ সব সময় পুরা মাত্রায় জাগ্রত ছিল।

পরিষ্কার মনে নাই, বোধ হয় জুলাই-আগষ্ট মাসে একবার হেড্‌কোয়ার্টার হইতে হুকুম আসিল যে, চারঘাটিয়া বিমান-ক্ষেত্রে অবস্থিত তিনশত তিপ্পান্ন নম্বর স্কোয়াড্রন হইতে সমস্ত

ভারতীয় এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকদিগকে সুদূর করাচীতে বদলি করা হইল। বদলি করার কারণ হুকুমে কখনও থাকে না।

আমাদের মধ্যে যাহারা বিমানের মেরামতের কাজে সব মনপ্রাণ সঁপিয়া মাতিয়া রহিয়াছিল, তাহারা এই হুকুমে বিশেষ মনঃক্ষুন্ন হইল। কেহ কেহ মনে করিল যে তাহাদের কাজে শৈথিল্য আসিয়াছে; কেহ মনে করিল রয়াল এয়ার ফোর্সের কিছু ক্রু-বৈমানিক আমাদের ফ্ল্যাইটে থাকায়, তাহাদের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থার পত্তন করা হইল; ইত্যাদি নানারূপ জল্পনা-কল্পনার উদ্ভব হইল। অনেকে স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার উইং কমাণ্ডার লিলির নিকট দরখাস্ত পেশ করিল; তাহাতে লিখিল, যুদ্ধ জয়ের চেষ্টাতে তাহাদের যেন দয়া করিয়া বঞ্চিত না করা হয়। এই স্কোয়াড্রনে থাকিয়া তাহারা জাপানীদের বর্ম্মা হইতে হটাইবার কাজে কিছু সাহায্য করিতে পারিতেছে; কিন্তু করাচীতে গেলে, যুদ্ধ জয়ের কাজে এত সাহায্য করা সম্ভব হইবে না ইত্যাদি।" অনেকে স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর নিকটও অনুরূপ আবেদনপত্র দিল।

স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী তাহাদের সকলকে একত্রে ডাকিয়া কিছু সৎপরামর্শ দিলেন। হাসিয়া বলিলেন যে যেখানেই থাকুক না কেন, তাহাকে দেওয়া কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলে যুদ্ধজয়ের কাজই করা হইবে।

করাচীতে বদলি হওয়ার কারণ পূর্ব্বেই কিছু অনুমান করিয়াছিলাম। স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর সাথে চা পানের সময়ে সঙ্গোপনে কথায় সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল।

আমরা অর্থাৎ এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকরা করাচীতে যাওয়ার হুকুম পাইয়াছি। আর বৈমানিক ক্রুরা শীঘ্রই উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ক্যাম্বেলপুরে বদলি হইয়া যাইবার হুকুম পাইবে। উদ্দেশ্য নূতন ধরনের বিমানে পূর্ণ শিক্ষা। নূতন বিমান কি সে কথা এখনও অতি গোপন। কিন্তু বেশ পরিষ্কার ভাবেই বোঝা গেল এমন কোন বিমান যাহা ভারতবর্ষে এখন আসে নাই, কিন্তু সেই বিমানের তেজ নিশ্চয়ই খুব অসাধারণ হইবে।

এই সংবাদে কিছু গর্ব্ব বোধ হইল। ভারতীয় স্কোয়াড্রনগুলির মধ্যে শুধু নয়, অভারতীয় রয়াল এয়ার ফোর্সের স্কোয়াড্রনগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় আমরা এমন কিছু দক্ষতার পরিচয় নিশ্চয়ই দিয়াছি যাহাতে আমরা এই নূতন বিমানের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছি। পরে হয়ত আরও অন্য স্কোয়াড্রনদিগকে এই নূতন বিমানে শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু যে স্কোয়াড্রন নূতন বিমানে প্রথম শিক্ষা লয়, তাহাদের দক্ষতা ও দৃঢ়তার উপরেই নূতন বিমানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাহাদের শিক্ষানবিশীর সময় বিমানের উপযোগিতার মান জানা সম্ভব হয়। বৈমানিকরা যদি চরম সহযোগিতা না করে, তাহা হইলে যে কোন শ্রেষ্ঠ বিমানকেই শুধু যুদ্ধজয়ের নয়, আকাশভ্রমণের পক্ষেও অনুপযোগী প্রমাণ করা অতি সহজ। সেইজন্য প্রথম শিক্ষার জন্য এমন সব স্কোয়াড্রন ও বৈমানি-

দের নির্ব্বাচন করিয়া আহ্বান করা হয়, যাহারা চরমভাবে নিজেদের তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া, বিমানের সব রকম কৌশল ও বিমানের সব রকম খুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাসী করিয়া দেখে। এই তল্লাসী শুধু মাটির উপর চালাইয়া দেখিলে সম্পূর্ণ হয় না। বিমানকে উড়াইয়া, নানা ভঙ্গিতে উড়াইয়া, বিমানকে সমস্ত রকম বৈমানিক কসরতে ফেলিয়া তল্লাসী করিয়া দেখিতে হয়।

তল্লাসী করিয়া দেখার সময় যদি কোন খুঁত ধরা পড়ে, তখন কেমন করিয়া সেই দোষ ত্রুটি সংশোধন হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টিত হয়। অনেক সময় কিছুদিন উড়িবার পর নূতন বিমানের অনেক খুঁত বাহির হইয়া পড়ে। তখন বিমানের নির্ম্মাতাদের ডাক পড়ে। তাহারা ও বিমানের **designer**-রা তখন ঝোরাড্রনে আসিয়া বৈমানিকদের সাথে একত্রে থাকিয়া, আলাপ করিয়া, পরীক্ষা করিয়া নানাভাবে চেষ্টা করে যাহাতে দোষত্রুটি-গুলিকে সংশোধন করিয়া বিমানকে যুদ্ধোপযোগী করা যায়।

নূতন বিমানের শিক্ষানবিশীকালে বৈমানিকদের মধ্যে কয়েকজনকে নিজেদের উৎসর্গী করিতে হয়। কে উৎসর্গকৃত হইবে তাহা পূর্ব্বাহ্নে জানা সম্ভব নয়।

কসরতের সময় নূতন বিমান কিভাবে উড়িবে তাহা বিমান না উড়ান পর্য্যন্ত কিছুতেই জানা যায় না। হয়ত বিমানের বনায়টে এমন মারাত্মক ভুল রহিয়া গেছে যে একেবারে সোজাসুজি নামিয়া আসার সময় বিমান উল্টাইয়া যায়। সেই অবস্থা হইতে বিমানকে সোজা করিবার পন্থা হয়ত তখনও সঠিকভাবে জানা যায় নাই। এই অবস্থায় যে বৈমানিক বিমান উড়াইতেছেন, তাঁহার চেষ্টা হইবে সেই পন্থা আবিষ্কার করা, যাহাতে বিমানকে সোজা করা যায়। কিন্তু এই আবিষ্কার করার জন্য সময় মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। যদি আবিষ্কৃত হইল তবে ভাল। বৈমানিকরা বিমান লইয়া অক্ষত শরীরে মাটিতে অবতরণ করিলেন। আর যদি পন্থা আবিষ্কৃত না হইল, তখন, যাঁহারা মাটির উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিমানের আকাশ-যাত্রি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহারা পরদিন অপরাহ্নে ফ্লো-মার্চ করিয়া বিমান উড়াইয়া পরীক্ষাকারী বৈমানিকদের শেষ-কৃত্য সমাধান করিয়া বেসে আসিয়া দুঃখ-ভোলার ঔষধ সেবনে অতীত ঘটনার কথা বিস্মৃত হওয়ার বৃথা চেষ্টা করিবেন। এবং পরের দিনের জন্য অন্য বিমানে সেই ত্রুটি হইতেই বাঁচিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য প্রস্তুত হইবেন।

আমাদের স্কোয়াড্রন যখন একেবারে নূতন বিমানে শিক্ষানবিশী ও বিমান পরীক্ষা করিয়া তাহার উপযোগিতা প্রমাণের জন্য নিয়োজিত হইল তখন গর্ব্ববোধের সাথে একথাও মনে পড়িল যে গত এই কয়েক মাসের **operation**-এ, আমাদের স্কোয়াড্রনের শুধু একখানা বিমান ধ্বংস হইয়াছে, ও সেই সাথে বৈমানিকদের মধ্যে মোটে একদল ক্রু লোকসান গিয়াছে। এ ক্ষতির কারণ বৈমানিকদের ত্রুটি-বিচ্যুতিও নয়, বা বিমানের উড়নশক্তির অনুপযুক্ততাও নয়। এ ক্ষতির কারণ হইল বিমান ঘাঁটির কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যে শৈথিল্য। বারে বারে মনে হইতে লাগিল নূতন বিমানে শিক্ষানবিশীর সময় ক্ষতির পরিমাণ কত হইবে?

নূতন প্রকাশিত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের

কবির্মনীষী

রবীন্দ্রনাথ

বেদমন্ত্র

সমীরকান্ত গুপ্তের

মনের মন মুকুর

দাম তিন টাকা

[দার্শনিক, কবি, চিত্রকর, সুরশিল্পী, বৈজ্ঞানিক, কর্মবীরের
জীবন থেকে অসামান্য কাহিনীমালা]

KULJIAN'S COMPLETE METALLURGICAL SERVICES

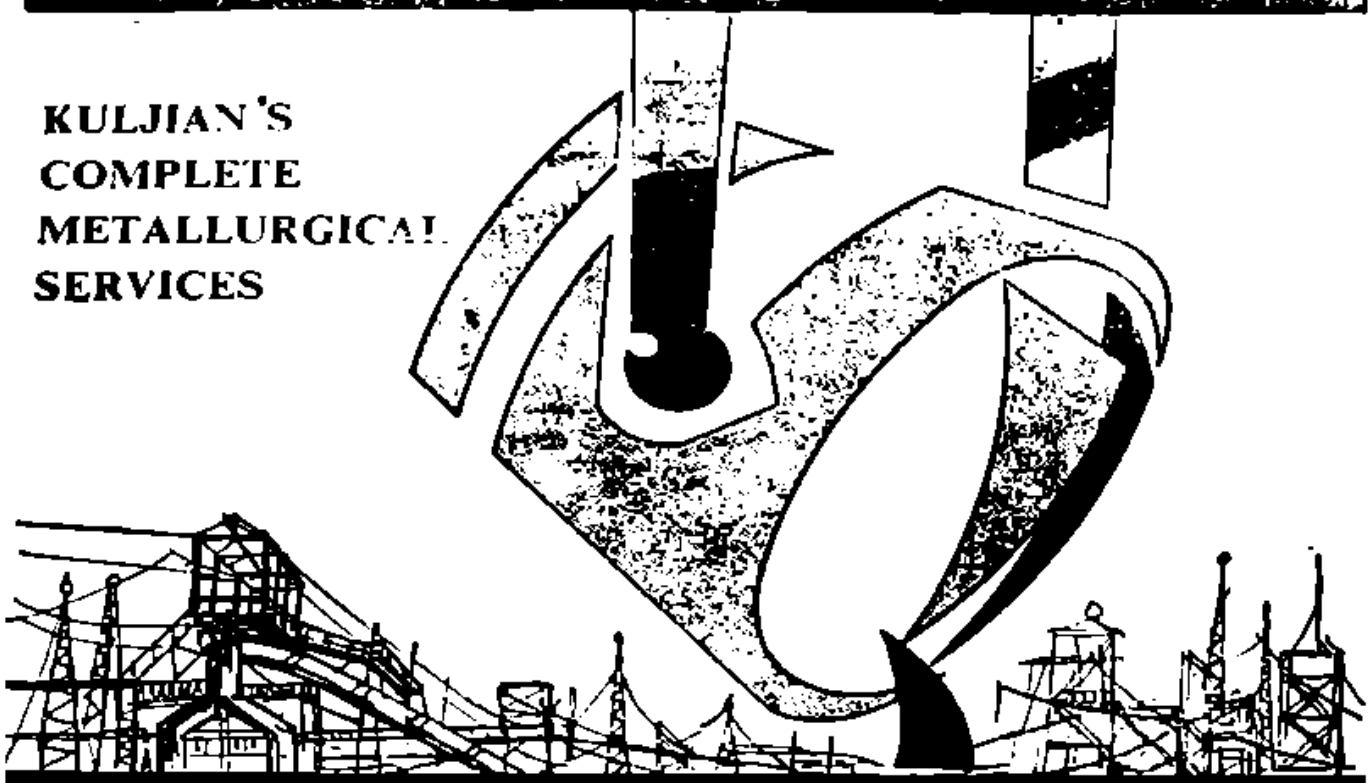

Kuljian-India offers comprehensive consulting engineering in the specialised art of steel-making and steel-shaping. Kuljian's metallurgical services cover the complete spectrum of metals-industry activities — feasibility study and project reports; heavy industrial design, engineering and construction-management; mining and transportation, pelletization and sintering; smelting and refining; finishing and shaping of metals; personnel training, heat-up and initial plant operation. ■ Kuljian consultancy is backed by world-wide experience. If you have an iron or a steel project, entrust it to Kuljian.

INTEGRATED STEEL PLANT ★ BLAST FURNACE IRON PLANT ★ ALLOY STEEL PLANT ★ EXTRACTIVE METALLURGY ★ NON-FERROUS METALLURGICAL PLANT ★ FOUNDRIES AND MACHINE SHOPS

AN INDO-AMERICAN JOINT ENTERPRISE

The Kuljian Corporation (India) Private Ltd.

CONSULTING ENGINEERS

24-B, PARK STREET, CALCUTTA-16

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

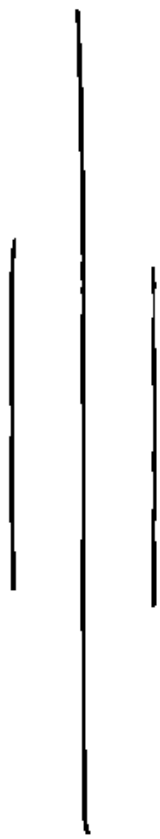

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

The value of our actions lies not so much in their apparent nature and outward result as in their help towards the growth of the Divine within us.

—Sri Aurobindo

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

God is infinite possibility. Therefore Truth is never at rest; therefore, also, Error is justified of her children.

—Sri Aurobindo

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

PHONE : 34-2665 GRAM : Boxboard

With Compliments of : —

INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,

57, Radhabazar Street,
CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA–33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

OFFICE PHONE:
22-4972.

Eliminate egoism in all its form; eliminate it from every movement of your consciousness.

—Sri Aurobindo

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 **TELE: 'Kenabecha'**

Telegrams: 'Vessel' Cal
Codes { Scotts 10th. Ed., A. B. C. 5th. Ed., Bentley's

Telephones { Office : 23-1393 Dock Office: Residence: { 55-6464 55-9724 55- 503

SARAT CHATTERJEE & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS

3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Regular Services:

AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of:

LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO., LTD.
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম জীবন-কথা

[শ্রীনারায়ণপ্রসাদ লিখিত "Life in Sri Aurobindo Ashram এর অনুবাদ]

পশুপতি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনূদিত

দাম ছয় টাকা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই সাত টাকা

হাবড়া "মাতৃমন্দির" হইতে প্রকাশিত এবং
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে (পণ্ডিচেরী) ও
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে (১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২) প্রাপ্তব্য।

Very often it so happens that the things a man does not really need are just the things that cause him most harm.

—The Mother

BENGAL IMMUNITY

COMPANY LIMITED

CALCUTTA-13

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্ত্তিকা

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও দর্শন বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির প্রকাশনা

মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৩.৭৫
শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্ত্তমান জগৎ	শ্রীঅনিলবরণ রায়	২.০০
কবির্মনীষী	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩.৫০
রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিবর্দ্ধিত ৩য় সংস্করণ)		৩.০০
সাধনার জীবন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	২.৯০

: শ্রীঅরবিন্দ :
বিবিধ রচনা

মূল বাংলায় লেখা পুরাতন খাতাপত্র হইতে সংগৃহীত ও প্রথম মুদ্রিত মূল্য ১.০০

ভারতের নবজন্ম ১.৫০

কর্ম্মযোগী ১.৫০

জগন্নাথের রথ ১.৫০

গীতার ভূমিকা ২.০০

শ্রীঅরবিন্দের পত্র ১.০০

পত্রাবলী ১.৫০

দিব্য-জীবন (দুই খণ্ডে সমাপ্ত) ১ম খণ্ড ৮.০০ : ২য় খণ্ড ১৪.০০

: শ্রীমা :
উত্তম রহস্য

[একাঙ্ক নাটিকা]

রাজনীতিজ্ঞ, লেখক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী ও বাহ্যজ্ঞানী এই ছয়জনের ছয়টি আত্ম-কাহিনী ও তার উপসংহার

মূল্য ১.০০

ছোটদের গল্প ১.৫০

পুরাণো লেখা ১.৫০

শিক্ষা ১.৫০

মায়ের আলাপ ২.৫০

1. Loving Homage ... Rs. 10/-

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্তিকা

২৪শে এপ্রিল, ১৯৬৭

ক্র—১০ সংখ্যা—২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৯ এপ্রিল ১৯৬৭)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

মাতৃবাণী		১
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী		৩
নারীর শিক্ষা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৭
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	১৩
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	২৩
প্রসঙ্গ ৩	শ্রীমা	৩৭
পথের কথা	শ্রীমা	৪০
বিলাতের ডায়েরীর কয়েক পাতা	এ. বি. পুরাণী	৪৭
কঠিন ডানার ওড়া	নীরদবরণ	৫৪

বর্ত্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৭শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	৬০.০০	বার্ষিক	২০০.০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫.০০		১২০.০০
প্রতি সিকি পৃষ্ঠা	২৫.০০		৮০.০০
ভিতরের মলাট	১০০.০০		৩২০.০০
বাহিরের মলাট	১২৫.০০		৪০০.০০

শাখা :

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম—দেড় টাকা

Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12

Edited by : NOLINI KANTA GUPTA

Printed by : AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

PRINTED IN INDIA

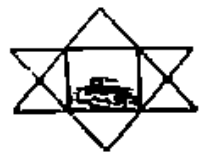

২৪ এপ্রিল, ১৯৬৭

পরিশেষে কিন্তু সত্তার আত্মরক্ষার সংকল্পই দেয় যাহা অবশ্যার মূল্য, অনেক সময় একটা আপাতীত মূল্য—আপাত-বাস্তবতার জৌলুস হল প্রমাদের লক্ষণ। একটা জাতির বা সংস্কৃতির সংকল্প যদি হয় মৃত্যুর দিকে, যদি সে ক্ষয়িষ্ণুর নিষ্প্রাণতা আর মুমূর্ষুর নিশ্চেষ্টতা আঁকড়ে ধরে থাকে, সামর্থ্য থাকলেও অন্ধভাবে প্রাধান্য দেয় ধ্বংসমুখী প্রবৃত্তিসকলকে, যদি সে পোষণ করে বিগতকালের যত শক্তি, সরিয়ে রাখে ভবিষ্যৎ শক্তিকে, অতীতের জীবনকে বরণ করে আগামী জীবনের পরিবর্তে তাহলে প্রচুর সামর্থ্য উপকরণ ও বুদ্ধিমত্তা সব থাকলেও, এমন কি বেঁচে থাকবার জন্যে বহু আমন্ত্রণ সত্ত্বেও, প্রতিনিয়ত সুযোগ লাভ সত্ত্বেও কোন কিছুই তাকে অনিবার্য্য ভাঙ্গন থেকে বিলয় থেকে বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু তার যদি এসে থাকে নিজের উপর দৃঢ় আস্থা আর বলিষ্ঠ সংকল্প বেঁচে থাকবার জন্যে, যদি সে নিজেকে খুলে ধরে থাকে আগামী সম্পদের অভিমুখে, তার প্রবল ইচ্ছা যদি থাকে ভবিষ্যৎকে এবং ভবিষ্যতের অবদানকে অধিকার করবার জন্যে আর তাতে বাধা-বিপত্তি এসে দাঁড়ালে আপন সামর্থ্যের বলে তাকে স্ববশে আনতে পারে, তাহলে দুর্যোগ থেকে পরাজয় থেকে অদম্য বিজয়ের শক্তি আহরণ করতে পারে, আপাতদৃষ্ট নৈরাশ্য ও অবক্ষয় থেকে একটা নব সৃষ্টির প্রোজ্জ্বলন্ত শিখারূপে উঠে চলতে পারে, একটা ঐশ্বর্যময় জীবন-জ্যোতির দিকে। ঠিক এই কাজটি করবার জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুত্থান হয়েছে—এ কাজ চিরকাল সে করে এসেছে, তার অধ্যাত্ম-পুরুষের শাশ্বত বীর্য্যে।

—শ্রীঅরবিন্দ

মাতৃবাণী

"যে কোন কাজ, যে কোন কর্ম্ম তুমি শেষ করেছ তাতে তোমার সিদ্ধির মাত্রা নির্ভর করবে তোমার চেতনার মাত্রার উপর।"

১৩-১-৬৭

সত্যকে কথায় ধরা যায় না, তার কোন সংজ্ঞা নাই, জীবনে তাকে ফলাতে হয়। সত্যের কাছে যে পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করেছে, যে চায় জীবনে সত্যকে ফলিয়ে ধরতে, সত্যের সেবা করতে, প্রতিমুহূর্ত্তে সে জানবে তার কি করতে হবে।

সত্য হ'ল সজীব সচল জিনিষ, প্রতিমুহূর্ত্তে সে আপনাকে প্রকাশ করে চলেছে, তা হল ভগবানের কাছে পৌঁছিবার একটা উপায়।

সকল সময়ে হাসবে, সকল সময়েই। ভগবান হাসছেন আর হাসছেন, তাঁর হাসি এত মধুর, এত সুন্দর, এতখানি ভালবাসায় ভরা। এ হাসি তোমায় ঘিরে রাখে একটা অপরূপ মাধুর্য্যে।

যা কিছু ঘটে, স্থির জানবে তা ঘটে আমাদের ঠিক সেই শিক্ষাটি দিতে যা দরকার আমাদের পক্ষে; আর তাকে আনন্দের সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া উচিত আন্তরিকভাবে যদি আমরা সাধনা করতে চাই।

দিব্য জীবন যার কাম্য, তার কাছে অন্ধ অজ্ঞান মানুষের ব্যবহারে কি মূল্য থাকতে পারে?

১৮-১-৬৭

পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধি আসবে তখনই যখন ভগবৎ-ভাব তোমার হবে স্বতঃসিদ্ধ—স্বতঃই যখন তোমার ভগবৎ-ভাব, ফিরে যখন তুমি তাকিয়ে দেখ না তুমি তা পেয়েছ, যখন তুমি পার হয়ে গিয়েছ তা হয়ে উঠবার ইচ্ছাটি পর্য্যন্ত।

তোমার ব্যক্তিগত মূল্য যাই হোক, তোমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি যাই হোক, যোগ সাধনায় প্রথম গুণটি হ'ল বিনয়।

জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন : বিশ্বযুদ্ধ যদি একটা বেধে যায় তাতে মানবজাতির বেশির ভাগ অংশটাই ধ্বংস পাবে, শুধু তা নয়, যারা বর্ত্তে থাকবে তাদের জীবন-ধারণের ব্যবস্থাও অসম্ভব হয়ে উঠবে—আণব রেণু বর্ষণের ফলে। এমন একটা মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা যদি এখনও থাকে, তবে কি পৃথিবীর উপর অতিমানস সত্যের এবং নব মানবজাতির আবির্ভাব ব্যাহত হবে না?

মায়ের উত্তর—এ সব হ'ল মানস কল্পনা; আর একবার যদি তুমি এই মানস কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ কর, তাহ'লে সমস্যা ও সমস্যা-পূরণের শেষ নাই। এ সব তোমাকে এক পাও সত্যের কাছে নিয়ে আসে না।

মনের পক্ষে সবচেয়ে সুস্থ সবচেয়ে স্বস্তির ভাবটি হবে এই রকম: মূলভাবে পরিষ্কারভাবে আমাদের বলা হয়েছে অতিমানস সৃষ্টি আসবে এই বর্ত্তমান সৃষ্টির পরে। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য যা কিছু তৈরী হয়ে চলেছে তা হ'ল এই আগমনীর জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা, সে অবস্থা যাই হোক না। এই সব অবস্থা কি হবে তা নির্ভুলভাবে দেখবার মত ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি আমাদের নেই যখন, তখন এ বিষয়ে উচ্চ-বাচ্য না করাই সবচেয়ে ভাল।

মানুষী বিধান অনুসারে দোষীকে দণ্ড দিতেই হবে। কিন্তু এই মানুষী বিধানের চেয়েও আরও এক বলবত্তর বিধান আছে, তা হ'ল ভাগবত বিধান—দয়ার, করুণার বিধান। এই বিধানের কল্যাণেই জগৎ বর্ত্তে থাকতে পারে, ক্রমোন্নতির পথে চলতে পারে।

নিয়ম মেনে চলা যদি তোমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তা হ'লে জীবনে স্থায়ী কিছু, খাঁটি কিছু করাও তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।*

* অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী

[গতবারে বলেছি, সাবিত্রী হয়েছেন মৃত্যুবিজয়িনী অর্থাৎ মৃত্যু আর মৃত্যু নাই, পরিণত হয়েছে অমরত্বে, অমৃতত্বে, অনন্ত জীবনে অন্ধকার পরিণত হয়েছে চিরস্থির আলোতে। সাবিত্রী এমন একটা লোকে এসে গিয়েছেন যেখানে শুধু আলো আর আনন্দ আর সুষমা আর সৌন্দর্য্য। তবে তার অর্থ এমন নয় যে আলো আনন্দ সৌন্দর্য্য একটা সাধারণ সর্ব্বত্র বিস্তৃত ভাব শুধু, সেখানে আছে ব্যষ্টিরূপ আকৃতিগত বৈচিত্র্য; এই পৃথিবীর অনুরূপ সেখানেও আছে নানাত্বের মূর্ত্ত লীলা, রং ও রেখার অবয়বের অফুরন্ত বিলাস—তবে সে সবই পরম সুন্দর পরম জ্যোতির্ম্ময় পরম আনন্দময়—কোন দোষ-ত্রুটি নাই, কোন অভাব নাই, কোন ন্যূনতা নাই, অনন্ত কিছু নাই, সব নিটোল পরিপূর্ণ]

একাদশ পর্ব্ব

প্রথম সর্গ

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(২)

সাবিত্রীকে ঘিরে রয়েছে দিব্যদিনের সন্তানেরা
অনির্ব্বচনীয় এক মহানন্দের মধ্যে;
সে সুখ কখনও হারায় না, অনন্তায়
আনন্দময় স্বাচ্ছন্দ্যের রভসাপ্লুত জনসংঘ তারা,
চারিদিকে মৃত্যুজয়ী জাতিদের পদশব্দ কণ্ঠস্বর,
স্বর্গের জ্যোতির্ম্ময় আনন্দময় জীব যত
পূর্ণ সুন্দরের প্রতিমা,
গলিত কিরণে গঠিত অঙ্গরাজি,
নগর সব জ্ঞানবন্ত রত্নের পাথর কেটে যেন তৈরী
অপরূপ গোষ্ঠসব, প্রদীপ্ত তীরভূমি
দীপ্যমান আকৃতি সকল শাশ্বতের ভাস্বর জনসংঘ।
সাবিত্রীর মাথার উপরে দেবতারা
সুছন্দে ঐ জ্যোতিষ্কমণ্ডল ঘূর্ণিপাকে চালিয়েছে,
এখানে যারা বিমুগ্ধ সচল স্থিতিসব

অন্ধভাবে যাদের টেনে নিয়ে চলেছে
আমাদের তারকারাজির বিপুল বিভ্রান্ত কক্ষপথ ;
শ্রবণের তন্ত্রীকে কঠোর আঘাত করে
আনন্দমত্ত কণ্ঠ সব,
প্রত্যেক গতিধারায় ফুটে ওঠে তার একান্ত আপন সঙ্গীত ;
বিহঙ্গের গান শিহরিত হয়ে ওঠে চিরসবুজ শাখার উপর,
তাদের পালক-ব্যূহের রং সব গৃহীত
কল্পনার পাখার রামধনু হতে।
কম্পিত সমীরণ অমর সৌরভে প্রগাঢ় পরিপূর্ণ।
কুঞ্জবনে-বনে যেন দোদুলবক্ষ আর শিহরিত দহর মধ্যে
চিরবসন্তের অগণিত সন্তানেরা
প্রস্ফুটিত যেমন বর্ণিল-আনন্দের
অগণিত সুনির্মল তারাদল ;
ইন্দ্রনীল আকাশে আশ্রয়ের জন্য সমবেত সকলে
ফুলের পুঞ্জসব চেয়ে আছে যেন পরীদের চোখের হাসি।
শৃঙ্খলহারা নৃত্যোৎসব এক, বর্ণবিভঙ্গ সাগর এক
স্বর্গের চিরজাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখে
চিরকালের জন্য ধরে রেখেছে
বর্ণ-বিন্যাসের পুঞ্জীকৃত সেই পলাশ-প্রভা
ভেসে চলে যায় সে স্বপ্নের
নিমীলিত নয়ন-পল্লব পার হয়ে।
সাবিত্রীর উৎসুক শ্রবণ ভরে ওঠে অমর সুরধারায়,
ঊর্ধ্বের স্বতঃস্ফূর্ত মহাবাণী এক
দুলায়িত মহিমার বিপুল পক্ষে ভর করে উঠেছে,
ধ্বনির কোন চিন্ময় হৃৎকম্পন হতে ঠেলে দেয়
দেবতাদের মহাসাগরে স্পন্দিত সঙ্গীত-স্রোত।
বাতাসে সুখে বিচরণ করে সচেতন সত্তা এক ;
পল্লবে প্রস্তরে ধ্যানস্থ সজাগ সত্তা এক ;
চিন্তা-চেতন যন্ত্রাবলীর কণ্ঠধ্বনি
নৈঃশব্দ্যের জীবন্ত তীর বেয়ে চলে যায়,
আর কোন গভীর হতে অতলের অপ্রকাশের
বাকহারা কণ্ঠ হতে ফুটে ওঠে স্তুতিগান
অজ্ঞাতেরে দেয় যেন স্ফুট ভাষা।

ধ্বনির অদৃশ্য সোপানাবলি বেয়ে বেয়ে উর্ধ্বে যে উঠে চলেছে
তার ঈপ্সিত নয় এমন সঙ্গীত চলে যা
স্বল্পমাত্র কষ্টকৃত পদসঞ্চারে
ক্ষণিকের তন্ত্রীর আশ্রয়ে;
রূপান্তরিত করে ধরেছে সে তার চিরনব অগণিত সুরবালা
অভাবিত আবিষ্কারের প্রবল আবেগে,
ধরে রাখে তবু তার পুরাতন অবিস্মৃত পুলকরাজি,
নেপথ্য হৃদয়ে ক্রমবর্দ্ধমান সম্পদের মত।
তার অধিকারে এক চেতনা এল ব্যাকুল হয়ে উঠেছে যে
অজানা প্রতি-আকর্ষণ প্রতি-বাসনার কণ্ঠধ্বনির মধ্যে
খুঁজেছে সে আবার অতৃপ্ত অতল সব,
একটা গভীর গোপন হৃদয়ের তলে
শিকারে চলেছে সে
খুঁজেছে সে আবার হারান এক অনন্ধ এক মহাতৃপ্তি।
ওই যত সুরলীলা সুদূরে মিলিয়ে যায়
তার মধ্যে শোনে সাবিত্রী
তার বিমুগ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রামের ইন্দ্রজাল ভেদ করে
শোনে সে দিব্যজীব এক সঙ্গীত সাগরে যাত্রা করেছে
ফেনপুঞ্জ আর হাস্যচূর্ণ পার হয়ে,
তরণীর মুখখানি ঘুরিয়ে চলে আমন্ত্রণ করে
নিষ্পাপ মায়াবীর দীপাবলির কুহক—
নির্বিঘ্নপদ মনোহর অভিযান যত
এমন দেশে যেখানে অপরূপ সৌন্দর্য্য এক
তার যাদু ছড়িয়ে
গায় গান ছন্দায়িত পাহাড়খণ্ডের উপর থেকে
নিত্যফেনায়িত সাগরের মধ্যে।
আদিসৃষ্টি এক আবাদের বন্ধনী চিন্তালেখা হতে মুক্ত,
মুক্ত আমাদের অন্ধ হৃদয়ের অনিচ্ছা হতে,
চায় না যে দেবত্বের কোন আলিঙ্গন,
সেই দৃষ্টির সুষমায় দেখে সাবিত্রী সমস্ত প্রকৃতি নির্দ্দোষ সুন্দর
সৌন্দর্য্যের বিপুল বিশ্ববিলাসে পরিপ্লুত;
তার সত্তার তন্ত্রী স্পন্দিত প্রসারিত হয়ে যায়,
কামনা করে গাঢ় মিলন তার প্রতি বহিরাত্মার সঙ্গে।

হৃদয়-বীণা তার বিশুদ্ধ এখন, যাবতীয় সুর ধরবার জন্য ;
স্বর্গের সূক্ষ্ম স্পর্শ সব শ্রান্ত আঘাতে তুলে দেয়
জীবন্ত এমন উল্লাস পার্থিব জীবন যা ধারণে অসমর্থ।
এখানে দেখায় যা বেদনা তা হয়েছে প্রজ্বলিত আনন্দ,
যা কিছু এখানে সব হ'ল আবেগ-ইঙ্গিত রহস্য-ছায়া,
ত্যক্ত তারা কেবল আন্তর দ্রষ্টার কাছে
সাক্ষাৎ করে যে
ইন্দ্রিয়গত বস্তুর মধ্যে আনন্দময় পুরুষ,
স্বপ্নেরও অগোচর এমন মধুরতর মাধুর্যে পরিণত হয়েছে তারা,
মহৎ ইঙ্গিতের ভার যত পৃথিবী ভয় করে,
ভয়ে কম্পমান, কারণ অর্থগ্রহণ হয় না
তাদের ঢেকে রাখতে হয় অদ্ভুত অপরূপ সব রূপ দিয়ে,
এখন তারা হ'ল অসীম এক মানসের
প্রথম শব্দকোষ
অর্থ করে দেয় একটা অনন্ত আনন্দসার ভাষার।
আনন্দ এখানে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা,
এখানে রয়েছে মাধুরীরাজি যাদের
আলিঙ্গন শিহরণ হতে
বিচ্ছুরিত কণিকা এক হ'ল মানুষী সুখ—
রয়েছে যেন রূপক রূপাবলি, হেলায় পরিহিত অলংকার
ভগবানের রাজপরিচ্ছদে ভূষণরূপে সংগ্রথিত।
আকার সব গড়া হয়েছে কল্পনার নীড় যেন
মন যেখানে এসে গভীর এক শারীর আনন্দে ডুবে যেতে পারে।
হৃদয় হয়ে উঠেছে অনন্ত হতে প্রজ্বলিত মশাল এক,
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্তরাত্মার প্রকম্পিত প্রগাঢ়তা।
এ সবই হ'ল প্রথম মহল, বাহিরের চত্বর—
বিপুল আয়তন তবু স্বল্পতম তাদের প্রসার
স্বল্পতম তাদের মূল্য,
বৃত্তাহীন দেবতাদের ক্ষীণতম উল্লাস।

নব রসায়ন

শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত

বাইবেলে আছে, ভগবান বললেন, "সৃষ্টি হোক," আর সৃষ্টিটা হয়ে গেল। ভগবান খুশী হলেন সৃষ্টিটা হ'ল বলে কেবল নয়, সৃষ্টিটা হয়েছে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অদল-বদল করবার কিছু নেই; ইমারতটি পাকা-পোক্ত নিখুঁত, চিরকাল তা ওইরকমই ধরা-বাঁধা অচল-অটল হয়ে থাকবে অবিকল প্রথম দিনকার মত।

উপনিষদের ঋষি বলছেন কিছু অন্যরকম। প্রথমে যে সৃষ্টি হ'ল, যে রকম আকারের জন্তু-জানোয়ার, ভগবান তাতে খুশী হ'লেন না; আবার সৃষ্টি করলেন, তাতেও খুশী হ'লেন না। এ রকমে কয়েকবার চেষ্টার ফলে খুশী হ'লেন তাঁর সৃষ্টি দেখে যখন মানুষের সৃষ্টি হ'ল। সুকৃতং এতৎ।

সৃষ্টিটা আসলে গতিশীল, প্রগতিশীল; পৃথিবী চলেছে এগিয়ে প্রতিনিয়ত, নিত্য নব রূপায়ণ ধারণ করে। এই যে ক্রম-বিবর্ত্তনের ইতিহাস বর্ত্তমান মানুষী জ্ঞানের তা হ'ল একটা প্রধান বিশিষ্ট আবিষ্কার। এর ফলে অনেক রহস্যের অর্থ উদ্‌ঘাটন হয়েছে, অনেক সমস্যার মীমাংসা হয়েছে।

আর সৃষ্টির মধ্যে সকল রহস্যের প্রধান রহস্য, সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ় জটিল সমস্যা দুঃখের সৃষ্টি ও স্থিতি—মানুষের আদি সনাতন জিজ্ঞাসাই এসেছে এই পথে—"দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা—"

প্রশ্ন—ভগবান যদি থাকেন, যদি তিনি দয়াময়, যে শক্তি বা সত্তা সৃষ্টির অধিকর্ত্তা তা যদি হয় মঙ্গলময়, অশিব নয়, শিব—তবে পৃথিবী রোগে শোকে দুঃখে কষ্টে জর্জ্জরিত কেন? মৃত্যুর বিভীষিকা সর্ব্বোপরি ছেয়ে আছে কেন এই মর্ত্ত্যবাসীকে? ভগবান নয়, শয়তানই কি তবে সৃষ্টির স্রষ্টা বা পরম নিয়ন্তা?

পাশ্চাত্যের একজন সাম্প্রতিক সুপরিচিত মনীষী ও জ্ঞানী* এ বিষয়ে তাঁর এক অভিনব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। তিনিও বলছেন, জগৎটা যে স্থিতিশীল অর্থাৎ এখানে পাকাপাকি চিরকালের জন্যে যে বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে, সে রকম কিছু নয়।

---

* ফরাসী জেসুইট্ সন্ন্যাসী Pièrre Teilhand de Chardin (১৮৮১-১৯৫৫)। কর্ম্মজীবনে এই বিজ্ঞানব্রতী সন্ন্যাসীর বিশেষ ক্ষেত্র ছিল প্রত্নজীববিদ্যা (Palaeontology)। তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক দার্শনিক মননের ফল The Phenomenon of Man নামক বিখ্যাত পুস্তকে সংগ্রথিত।

জগৎ গতিশীল, তা চলেছে আবার এগিয়ে ক্রমোন্নতির পথে, উর্দ্ধের ক্রম-প্রকট সমুন্নততর চেতনার দিকে। এই যে উর্দ্ধায়নের বেগ তার ফলে প্রথমে দেখা দিয়েছে যত চিড়, ফাটল, তীব্র তীক্ষ্ণ টান, তারই অর্থ হল দুঃখ-কষ্ট, দৈন্য ও মৃত্যু। পৃথিবী বা মানব-সমাজ একটা সুসজ্জিত বাগান নয়, সব সেখানে যথাস্থানে নির্ব্বাচিত করে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা প্যাটার্ণ, স্থায়ীরূপ দিয়ে রাখা হয়নি। তা হ'ল বরং একটা ঝাড়-জঙ্গলের মত, লতা-পাতা গাছ-গাছড়া অজস্র, আর তারা বেড়ে চলেছে—পাতা ডাল ঝরে ঝরে পড়েছে কত, কত ফুল শুকিয়ে গিয়েছে; কিন্তু ক্রমে উপরে নূতন শাখা-প্রশাখা নবীন পল্লব সবুজ পত্র প্রস্ফুটিত ফুলের বাহার ছড়িয়ে চলেছে। দুঃখ-দৈন্য, কষ্ট ও বেদনা হ'ল এই সব শুকনো ঝরা পত্রপুষ্পের মত, ভগ্ন শাখা-প্রশাখার মত—এ হ'ল সবজের অগ্রগতির গোড়াকার আনুষঙ্গিক ফল, হয়ত অব্যর্থ প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবেও এই ক্ষয় অপচয় কোনো ব্যর্থতার লক্ষণ নয়, কারণ তাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে ঐ উর্দ্ধগামী চেতনার ধারা, তাদের নিজেদেরও রয়েছে একটা প্রচেষ্টা প্রবেগ, ঐ স্রোতে চলবার, তার সহায়ক হয়ে—বাহ্যতঃ তার যে রূপই হোক না। অথবা ব্যাপারটির তুলনা হতে পারে যুদ্ধে সৈন্যদলের কৃতির সঙ্গে—যুদ্ধের সমবেত লক্ষ্য হ'ল জয়। এই জয়ের জন্য রয়েছে প্রত্যেক সৈনোর সমান আত্মনিয়োগ, নিষ্ঠা, কর্ম্মঠতা—কিন্তু সকলেই পূর্ণ জয় অবধি বর্ত্তে থাকে না, বহুকে জীবনদান করতে হয়, এবং এই বহুর দেহোৎসর্গের উপরই ভাবী বিজয় প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর মানবজাতির ক্রম-বিবর্ত্তনে তাই প্রথম সোপান হ'ল বহুজনের দুঃখ-দৈন্য, কষ্ট-বেদনা, তাই হ'ল উর্দ্ধমুখী আবেগের প্রকাশ ও পরিচয়। যারা দুঃখ-দৈন্য কষ্ট-বেদনা সহ্য করে বা যতখানি এসব দুর্ভোগ দুর্গতি সহ্য করা যায় তা কেবল অনিচ্ছায় অসহায়ভাবে নয়। এই দুঃখের আন্তর রূপ হ'ল নিবিড় স্পৃহা প্রবেগ সামর্থ্য, উর্দ্ধের ধারক ও বহ হয়ে চলবার। ব্যক্তির দিক দিয়েও এক হিসাবে যা অভাববাত্র দেখায় তা হ'ল আসলে একটা গভীর ভাব-নিবিড় বস্তু। শার্দ্যা (Chardin) খ্রীষ্টীয় দুঃখভোগের একটা আধ্যাত্মিক সার্থকতা দেখেছেন, খ্রীষ্টের ক্রুশ পরিণামে নিয়ে আসে একটা চিরন্তন জীবনের সিদ্ধি।

শ্রীঅরবিন্দও দিয়েছেন দুঃখের একটা গোটা তত্ত্ব ও ইতিহাস। তবে এক জায়গায় তিনি বলছেন জগতের দুঃখভোগ—পাপ—সম্বন্ধে এই কথাটি: "অতি পাপী যারা—চোর, খুনী, গুণ্ডা—তারাও নবস্য, এই জন্য যে তারাই স্বীকার করে নিয়েছে নিজেদের উপর পাপের ভার, জগৎ-সাগর-মন্থনের ফলে উঠেছে যে বিষ তার বেশির ভাগ এই হতভাগ্যেরাই পান করেছে।"

শ্রীঅরবিন্দের এই বাক্য পাশ্চাত্য মনীষীর সিদ্ধান্তকে এক হিসাবে সমর্থনই করেছে

বলে মনে হয়। দৃষ্টিতেই অনুরূপ ভাবের প্রতিধ্বনি প্রায় তুলে দেয়। তবে শ্রীঅরবিন্দের বাক্য তাঁর পূর্ণ বাক্যের খণ্ডমাত্র, সর্ব্বশেষ কথা নয়। দুঃখ-কষ্ট দৈন্য-দুর্ভোগ পাশ্চাত্ত্য মনীষীর দৃষ্টিতে শেষ কথা যেন; ব্যক্তির পক্ষে—বহুজনের বাহ্যজীবনের পক্ষে; ব্যক্তির এখানে এইভাবে পূর্ণ আত্মবলি সমবেত সিদ্ধির উদ্দেশ্যে—যুদ্ধে যেমন বহু সৈন্যের বা সৈন্যদলের আত্মবলি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ব্যক্তির পক্ষেও, যে-কোন ব্যক্তির পক্ষেই এই আত্মবলি তার শেষ পরিণতি বা শেষ কৃতি নয়। এ হ'ল ব্যক্তির পক্ষেও তার এক জীবনের বা কয়েক জীবনের ইতিহাস মাত্র। এই আত্মবলির ভিতর দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনাকে বিকশিত করে চলেছে সমবেত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে—নিজেকে বিলুপ্ত করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নয়। কেউ পরিত্যক্ত হয় না, হারিয়ে যায় না, ঝরে পড়া শুষ্ক পত্রপুষ্পের মত। ব্যক্তির পক্ষেও আছে নানা ক্রম, নানা স্তর। একদল সৌভাগ্যবান শুধু যে আছে তা নয় যারা চরম সিদ্ধির মধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে—খ্রীষ্টীয় মনীষীর ভাব অনুসারে—ভগবানের সঙ্গে সমান সমান আসন পেয়েছে স্বর্গের চেতনায়। তাদের অনুসরণ করে সকলেই আসছে ক্রমে পরে পরে, একই সিদ্ধির অংশগ্রহণের জন্য। একটা অংশের উন্মীলন ও পরমসিদ্ধি আর একটা অংশের আত্মবলির উপর যে প্রতিষ্ঠিত হবে তা অনিচ্ছাকৃত হোক বা যতই ইচ্ছাকৃত হোক, বিধির বিধান একে বলা চলে না। অনেকের প্রত্যাখ্যানের, আত্মবলির ভিতর দিয়েই যদি বিবর্ত্তনকে এগিয়ে চলতে হয় তবে কি তা পরিশেষে কতিপয়ের উত্তর্ত্তন নয়—সে কতিপয় যতই বৃহৎ বা সমগ্র হোক না—তবুও তা অংশ।

ঠিকই বটে, দুঃখ-দৈন্য জরা-মৃত্যু হ'ল বিবর্ত্তনের প্রথম দিকের—অর্থাৎ অপরার্দ্ধের সত্য। যখন তমো আসীৎ তমসা গূঢ়ম্ অগ্রে, যখন সবই অপ্রকেতম্ সলিলম্ (অচেতনা-জলরাশি)—জড়ত্বের গাঢ় অবচেতনা যখন সৃষ্টির গোড়ায়, তখন এই জমাট নিরেট তামসিকতাকে দীর্ণ করে প্রাণাবেগের প্রথম চাঞ্চল্য দেখা দেয় একটা তীব্র বেদনার চাপে। দুঃখের অভিঘাতই সেই রজঃশক্তি যা তামস-প্রতিষ্ঠাকে নাড়িয়ে দেয়, ভেঙ্গে দেয়। দুঃখের নানা প্রকাশে অজ্ঞানকে অচেতনাকে ক্রমে সচেতন ও সজ্ঞান করে তোলে। দুঃখের প্রহারেই শেষে মানুষের দেখা দেয় অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা এবং এই দুঃখেরই পরিবর্ত্তন সাধনায় ঘটে অধ্যাত্মের চেতনায় ক্রমবিকাশ। দুঃখের ত্রাণ নয় শুধু, দুঃখের পরিবর্ত্তনই আসল সমস্যা ও মহত্তর সিদ্ধি। কবি যে বলছেন "দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ"—এ হল Martyr-এর শহীদের সৈনিকের আত্মলোপে আত্মতৃপ্তি। একে বলা যেতে পারে বীরভাবের সিদ্ধি কিন্তু দেবতাত্ম-সিদ্ধি ভিন্ন প্রকৃতির। দুঃখের ভিতর দিয়ে সে যায় বটে

কিন্তু তার মধ্যে থেমে যায় না, বা তাকে কেবল শেষ করেই তৃপ্তি পায় না; তাকে পার হয়ে একটা ওপারে চলে যায়—মুক্তির মত—লাভ করে আলোর হাস্য, আনন্দের সন্তুষ্টি। দুঃখের পরিণতি ও সার্থকতা দুঃখের মধ্যে নয় কিংবা দুঃখের আশ্রয়ে দুঃখের কল্যাণে লাভ হয় যে সদ্‌গুণাবলি—সাহস, সামর্থ্য, আত্মদৃঢ়তা, নিষ্ঠা—তাও নয়। দুঃখ আসলে হ'ল আনন্দই, আনন্দের বিকৃতরূপ যদিও। যে আনন্দ এত তীব্র যাকে আর সহ্য করা যায় না তাই দুঃখ হয়ে দেখা দেয়—দুঃখের ভিতরে অন্তরের অতলে চলে যাও তখন দেখবে অনুভব করবে, দুঃখ নয় তা আনন্দই, আনন্দ, পরমানন্দই—মায়াকে ভেদ করে চ'লে পিছনে অন্তরালে যেমন দেখতে পাওয়া যায় শুধু চিরন্তন একমাত্র ব্রহ্ম। মৃত্যুও ব্যক্তির মৃত্যু নয়, অন্ত নয়, তা হ'ল রূপের রূপণের পরিবর্ত্তন মাত্র। এই পরিবর্ত্তন ক্রমোন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য প্রয়োজন। সর্ব্বশেষে দুঃখ থাকে না, দুঃখও পরিবর্ত্তিত হয় আনন্দে; মৃত্যুও থাকে না, মৃত্যুরও হয় মৃত্যু, থাকে শুধু অমরত্ব, অমর জীবন।

শার্দ্যা বলছেন একটা আধ্যাত্মিক চেতনার ক্রমবিকাশ ও ক্রমসিদ্ধির কথা। তা হ'ল অবিরল একমুখী ঊর্দ্ধায়ন—পার্থিব চেতনা ও সত্তা সবেগেতভাবে ক্রমে উঠে চলেছে শুদ্ধতর পূর্ণতর নবতর সৃষ্টির মধ্যে। এইভাবে পৃথিবীকে, জড়-জগৎকে ছাড়িয়ে বা কাটিয়ে সে আর এক রকমের জগতে চলে গিয়েছে, ভিন্ন এক লোক সৃষ্টি করেছে বা হয়ে উঠেছে। একটা অগ্নিপিণ্ড যেন জড়স্তর ভেদ করে তার শিখারাজি প্রসারিত করে উঠে চলেছে এবং যত বিপুল স্ফুট স্বরূপস্থ হয়ে উঠেছে, ততই তা স্তূপীকৃত ঘনীভূত উত্তাপে ক্রমে সৃষ্টির অবশিষ্ট যা কিছু তাকে যেন ভস্মীভূত করে চলেছে। মনে হয় শার্দ্যার সিদ্ধান্ত যেন এই রকম যে একদিন পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার প্রকাশে ও প্রতিষ্ঠায় সমস্ত পৃথিবী, জড়দেহের আয়তন জ্বলে উঠবে। এ হ'ল যেন আর একটা লোক কিন্তু তার পূর্ণ প্রকাশ হ'লে তার তপ্ত তেজে পৃথিবী ভস্মীভূত হয়ে যাবে—হয়ত তার আদিরূপে পরিণত হবে—একদল বৈজ্ঞানিকেরা যেমন বলে থাকেন যে সৃষ্টির আরম্ভে ছিল তীব্র উত্তাপকণা-সমাকীর্ণ অনন্ত ব্যোম। না ছিল সংহতি না ছিল রূপ, ছিল একটা বাষ্পীয় ছায়াকার; এবং তার শেষ পরিমাণেও তাকে ফিরে হতে হবে আবার সেই নিরাকার আকার। জড় জগৎ অধ্যাত্মের খোলস। এই খোলস বা আশ্রয়কে ক্রমে দীর্ণ করে বিকীর্ণ বিচূর্ণ বিক্ষিপ্ত করেই প্রকটিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে অধ্যাত্মের সাম্রাজ্য। এ কি তবে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মত? বিবর্ত্তনের ক্রম ঊর্দ্ধায়ন উত্তরণ যেন একটা অগ্নিগর্ভ পর্ব্বত মাথা তুলেছে ক্রমে, ভিতরে তার বেড়ে যায় তাপ তেজ, শেষে চূড়াটি ছিন্ন হয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে একটা গলিত ধাতুস্রাবের বন্যায়, বাকী সব কিছুকে ভাসিয়ে

ডুবিয়ে ধ্বংস করে নিজের প্রথমত্ব মহিমা ছড়িয়ে দেয়—এই সকলেই কি পুরাতনের পরিবর্ত্তে দেখা দেবে নূতন ও অভিনব?

এই যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি বা সৃষ্টি তা কোন জগৎ? কোথায়? মনে হয় এ হল অতি-লৌকিক ঊর্দ্ধদৈহিক সিদ্ধি। শার্দ্যাঁ স্পষ্টই বলছেন নব পৃথিবী যে একটা নবীভূত জ্যোতিষ্ক—নিজের আলোকে আলোকিত—পরের আলোকে নয়—একটা তারকানওলের মত*—তা কিছু নয়—স্থূল জাগতিক আধিভৌতিক বস্তু এ নয়—তাকে ভেদ করে, নষ্ট করেই যেন—প্রায় একটা প্রলয়ের ফলে এর আবির্ভাব। এ তবে আধিদৈবিক অর্থাৎ সূক্ষ্ম-ভৌতিক কিছু? যদি তা হয় কেবলমাত্র চিন্ময়, বিশুদ্ধ চৈতন্য, তবে তার নাম দিতে পারি ব্রহ্মসিদ্ধি, ব্রাহ্মীস্থিতি। সৃষ্টির বিবর্ত্তন কি তবে এই শেষ প্রলয় বা মুক্তির দিকে চলেছে? না, তা হ'ল সূক্ষ্মভৌতিক তন্মাত্রিক লোক? তবে এই সূক্ষ্মেরও বহুতর স্তর আছে—আধ্যাত্মিক সিদ্ধিরও রাজ্য হতে পারে প্রাণের মনের মনাতীতের বিভিন্ন স্তরে কোথাও। বেদান্তীরা বলেন ব্রহ্মলোকের কথা—ব্রহ্মলোকে মহীয়তে—তাঁরা লাভ করেন ব্রহ্মের মহা স্থিতি। তবে এ হ'ল সৃষ্টির বাহিরে, প্রকাশের বাহিরে—সৃষ্টির ভিতরে অধ্যাত্মলোকের কথা বৈষ্ণবরা বলছেন, গোলোকের কথা—খ্রীষ্টানেরাও তাঁদের স্বর্গের কথা বলেছেন। আমরা আরো জানি শিবলোক, বিষ্ণুলোক—এ সবও প্রকাশের অর্থাৎ সৃষ্টির একান্ত বাহিরে নয়—শার্দ্যাঁর লক্ষ্য একান্ত মানসোত্তর মানসাতীত অধিমানস কিছু?

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি অনুসারে সৃষ্টি কেবল উত্তরণ, ঊর্দ্ধে উঠে চলা নয়, তার আছে অবতরণ—স্তরের পর স্তর পার হয়ে চলে যাওয়া নয়, চেতনাকে স্থিতিকে কেবল শুদ্ধতর বৃহত্তর গভীরতর নিবিড়তর তীক্ষ্ণতর করে চলে যাওয়া নয়, পূর্ণ ভাগবত সত্তায় বিলিয়ে যাওয়ার জন্য; তা হ'ল ঊর্দ্ধে উঠে গিয়ে আবার ঘুরে ঊর্দ্ধের ধর্ম্মে নিম্নকে নূতন করে ঢেলে গড়া—নেতি নেতি করে ব্রহ্মলোকে নির্ব্বাণ নয়, ব্যক্তিগতভাবেও নয়, সমষ্টিগতভাবেও নয়। সৃষ্টির কোন স্তরই অতিক্রম করে যাওয়া লোপ সাধন করা হবে না, নিম্নতন জড় স্তরটিকে পর্য্যন্ত নয়; বরং এই জড় স্তরটিকেই আশ্রয় করে তাকে নূতন জড়ে পরিণত করা—সিসাকে যেমন সোনায় পরিণত করবার প্রয়াস ছিল প্রাচীন রসায়ন বিদ্যার রহস্য।

আর আমরা ত জানি আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে স্থূল নিরেট জড় যে রূপ নিয়ে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে তার আসল স্বরূপ হ'ল বিদ্যুন্ময়, জ্যোতির্ম্ময়—কিন্তু বিদ্যুৎ-ধর্ম্মী জ্যোতিঃ-ধর্ম্মী হ'লেও তা জড়ই। আরও গভীরে

---

* Siderial—শার্দ্যাঁর কথায়।

নিবিড়ে গেলে তা হয়ে ওঠে চিৎ-ধর্মী, তবুও তখনও সে থাকতে পারে জড় হয়েই। জড়ত্ব যে চিন্ময়ে লোপ পাবে তা নয়, আধ্যাত্মিক জগতেও জড়াতীত হয়ে পড়বে না, আধ্যাত্মিক জগৎ স্থাপিত জড় জগৎ প্রলয়ে লোপ পাবে না।

এই দ্বিবিধ গতি, এই যুগল ধারা সমগ্র সিদ্ধিকে—পৃথিবীতে মানুষকে সমবেতভাবে, সৃষ্টির যাবতীয় অংশকে নিয়ে চলে একটা সামঞ্জস্যের সমন্বয়ের ভিত্তর দিয়ে—অনিবার্য্য-ভাবে বিপুল সংঘর্ষের প্রলয়ের ধ্বংসের ভিত্তর দিয়ে নয়।

বৈদিক ঋষিরা যেমন বলতেন অগ্নির হ'ল ঊর্দ্ধমুখী আস্পৃহা, তার শিখা উপরের দিকেই উঠে চলেছে, চেতনাকে শুদ্ধ শাণিত প্রোজ্জ্বল প্রবল করে স্তরের পর স্তরে প্রবাহিত হয়ে চলে দেবতাদের স্বধামে দেবাদিদেবের সানীপ্যে সাযুজ্যে। কিন্তু অগ্নির সহকারী দোসর হল পর্জন্য। পর্জন্যদেবের কাজ হ'ল অবরোহণ অবনমন—বর্ষণের ধারায় মত; ঊর্দ্ধে যা উঠেছে, ঊর্দ্ধে যা রয়েছে তাকে এখানে এই ভূতলে প্রতিষ্ঠিত করাই পরিপূর্ণ চরম সার্থকতা।

মানুষের অধ্যাত্ম-পরীর অধ্যাত্ম-চেতনা মাত্র নয়—তা চিন্ময় বটে কিন্তু তবুও মৃন্ময়। এই নবমৃত্তিকা প্রস্তুত করাই হ'ল নবযুগের নব রসায়ন।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ*

সুধা বসু

(৭)

পূর্ণযোগের সাধন তো সহায়চতুষ্টয় নিয়ে শুরু করা গেল। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার শুনলাম নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে দেওয়ার কথা। সেই আত্মোৎসর্গ বলতে কি বুঝব তা আলোচনা করে দেখা এখন আবশ্যক।

আত্মোৎসর্গ (Self-consecration) হল সমর্পণের দীক্ষা। এতে দুটি ভাবের সমন্বয় আছে; আত্মবলি বা ত্যাগের কথা একেত্রে যেমন আসে তেমনই তাঁর প্রসাদের অমোঘ শক্তি বা তাঁকে পাওয়ার কথাও এসে পড়ে। আমি একান্তভাবে তাঁতেই উৎসৃষ্ট, তাঁরই হয়ে গেলাম—এটা যখন হল, তখন দেখি তাঁর দিক থেকে বিচ্ছুরিত প্রসাদ আমাকে ভরিয়ে উপচে পড়ছে। এই পরম প্রাপ্তিকে স্বীকার করতেই হবে। এক কথায় এই অবস্থার পরিচয় হল দীক্ষা।

বৈদিক যুগ থেকেই দীক্ষা প্রচলিত। যজ্ঞে দীক্ষা নিতে হত। দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করে সমস্ত জীবনকালব্যাপী সেই পথ ধরে চলা, একেই বলা যায় যোগ-জীবনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তার অর্থ হল অতীতের সব সংস্কার দহন করে এক নবজন্মে ভূমিষ্ঠ হওয়া। প্রাকৃত চেতনার শেষ পর্যন্ত রূপান্তর ঘটে দীক্ষালাভের ফলে। তাই দীক্ষা হল দ্বিজত্ব বা গোত্রান্তর। প্রাকৃত জীবন তো পশুজীবনেরই এক উন্নততর আবর্তন মাত্র। পরম সত্তা থেকে উদ্ভূত হয়েও তার চলার বেগ নীচের দিকে বা একান্তভাবেই বহির্মুখ। আর যোগজীবনের দীক্ষা এই মানুষকেই এক নবজীবনের প্রবেশদ্বারে এনে উপস্থিত করে। তখন চারিদিক খুলে গিয়ে তার দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই নবজীবনের দীক্ষায় মানুষের গোত্রান্তর হয়, প্রাকৃত জীবনে সে আর ফিরে যেতে পারে না—মেয়েরা যেমন বিবাহের ফলে স্বামীর গোত্র হয়ে যায় আর পিতার গোত্রে তাদের স্থান থাকে না। তাই বৌদ্ধেরা দীক্ষাকে বলতেন "গোত্রভূ" হওয়া। দীক্ষার পর তুমি হলে 'বুদ্ধগোত্র', তোমার 'পৃথক গোত্র' আর থাকল না।

এখন আমরা দীক্ষা বলতে সাধারণত মন্ত্রী দীক্ষাই বুঝে থাকি। সাধারণের মধ্যে এ বিশ্বাস আজও প্রচলিত যে, কোন একটি বীজমন্ত্র গুরুমুখে শ্রবণ করলে পরে দীক্ষা হয়।

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

কিন্তু এ ছাড়াও দীক্ষা আছে। কেননা যে পর্যন্ত না শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, দীক্ষাও ঠিক মত হয় না, গোত্রান্তরও হতে পারে না। তাহলে শ্রদ্ধাকে কি উৎপন্ন করা যায়? আমরা আগে বৈদিক ধারণার কথা আলোচনা করেছি যে ঠিক সময় এলে শ্রদ্ধার আবেশ হয়। এ হল গভীরের ভাব, প্রাণের কথা। হৃদয়ের ব্যাকুলতায় তাঁর প্রসাদ লাভ হয় কালের আহ্বানে। সেটা কখন আসে আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। দীক্ষারও তাহলে একটা সময় আছে, সেই বিশেষ মুহূর্তের অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এমন বিশ্বাসও ছিল যে প্রচেষ্টা দিয়ে শ্রদ্ধাকে আবারে জাগানো সম্ভব হয়। এ তত্ত্ব বুদ্ধি-গ্রাহ্য। অশ্বঘোষের 'শ্রদ্ধোৎপাদ সূত্রে' এর পরিচয় আছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক সময় দেখা যায় যে ভোগময়জীবনে মানুষের বিতৃষ্ণা আসে, মন ঘুরে যায়। একে বলে ভুক্তবৈরাগ্য। রামকৃষ্ণদেব বলতেন যে ছোটছেলে চুষিকাঠি নিয়ে খেলায় ভুলে থাকে। হঠাৎ সব ফেলে দিয়ে বলে "মা যাব"। এরকম ভাবে আপনা থেকে সময় এসে গেল এও হয়। কিন্তু তা ছাড়াও নিজের চেষ্টার প্রয়োজন আছে। যখন দেখা যায় অন্তরে অস্ফুট আকুলতা ও অস্থির ভাব, যা নিয়ে ছিলাম তাই দিয়ে আর বাঁচতে পারি না তখন জিজ্ঞাসা জাগে। বুদ্ধিকে সজাগ রেখে তারই সাহায্যে অগ্রসর হতে হয়। সৎসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ এসব ভাল লাগে আর সেই নিয়ে চলা শুরু করে খানিকটা প্রস্তুতি এল, তখনই হঠাৎ সব আলো করে আগুন জ্বলে উঠল। আর সেই বিস্ময়কর পরম আবির্ভাবে সমস্ত সত্তা আপ্লুত হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথাটি—হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে একটি মাত্র দেশলাইএর কাঠি দিয়ে কে যেন আলো জেলে দিল। এই শক্তিপাত তাঁরই অনুগ্রহ শক্তি বা প্রসাদ (Grace)। দীক্ষার উৎকৃষ্ট লক্ষণ হল এই। যে তাঁকে চেয়েছে, তাকে তিনি স্বয়ং এসে বরণ করে নিলেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"।

তন্ত্রে তিন রকম দীক্ষার কথা আছে, মান্ত্রী শাক্তী ও শাম্ভবী। অনেক সময় কোন মহাপুরুষ দর্শন করে বা তাঁর কথা শুনেই খানিকটা গড্ডলিকা প্রবাহে পড়ে লোকে মান্ত্রীদীক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু শাক্তীদীক্ষা আবার এমনও হয় যে যাঁর কাছে দীক্ষিত তাঁর সঙ্গে চোখের দেখাও হল না। শুধু তাঁর কথা কানে শুনেই সমগ্র চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠল, আর তখনই তাঁর দিক থেকে এক শুচি শুভ্র শক্তিকিরণ এসে আমাকে বিদ্ধ করে দিল। আমি তাঁর নাম শুনেই তাঁর হয়ে গেলাম। এরকম শক্তিসম্পাতকেও দীক্ষা বলা যায়। সর্বোৎকৃষ্ট দীক্ষার নাম শাম্ভবী দীক্ষা। বলা হয় যে স্বয়ং শিব গুরু হয়ে এসে দীক্ষা দেন আর সাধকের মধ্যে এক অঘটন সংঘটিত হয়, তার আমূল রূপান্তর শুরু হয়। দিগন্তব্যাপী আলোর প্লাবনে সব ভেসে গেল। দর্শন, স্পর্শ, মন্ত্র বা মহাবাক্যশ্রবণ ইত্যাদির যে কোন একটি উপলক্ষ্য হয়ে সাধকের একেবারেই গ্রন্থিভেদ হয়ে গেল। গোত্রান্তর হতে আর

সময় লাগল না। বলা বাহুল্য এরকম অধিকারীর সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প—তাঁরা নির্বাচিত হয়েই আসেন। কিন্তু মান্ত্রী বা শাক্তী যাই হক না কেন, তা শাম্ভবী দীক্ষার পরিণাম শেষ পর্যন্ত সাধককে নিয়ে যাবে, না হলে দীক্ষা সম্পূর্ণ হল না। উপনিষদে যেমন বলা হয়েছে "বিদ্যুতো ব্যদ্যুতৎ আ ; ন্যমীমিষৎ আ", সেই রকম এই আদেশ বা দীক্ষা একেবারে বিদ্যুৎ চমকের মত চোখের নিমেষে অতিক্ষিপ্রবেগ সঞ্চারী আলোয় সবটা যেন উদ্ভাসিত করে দিয়ে গেল। বোধিদীপ্ত এই আধারে নিষণ্ণ চৈত্যগুরু তখন উন্মেষিত হতে থাকেন। এই চৈত্যগুরুর পূর্ণরূপই জগদ্‌গুরু। তাই এই পর্যন্ত হলে দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়। তখন মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরুর অভ্রান্ত নির্দেশে মদাত্মা সর্বভূতাত্মা হয়ে বিচরণ করার আর কোন বাধা থাকে না।

দীক্ষালাভের জন্য সাধারণ মানুষকে অনেক সময় যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। বাহির থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা করে ঠিকমত শক্তিলাভের চেষ্টায় তিলকে তাল করার মত অসীম ধৈর্য নিয়ে লেগে থাকলে শাক্তীদীক্ষা হয় এবং পরে সেটা শাম্ভবীতে পৌঁছেও দেয়। তখন তো শুধু তাঁতে উৎসৃষ্ট হয়েই চলা—তাই তাঁর সঙ্গে নিত্যযোগ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাই তীব্র হয়ে সাধককে তাঁর দিকে নিয়ে চলে। বীজমন্ত্র না নিলে দীক্ষা হয় না, এ এক লোকায়ত সর্বজনীন মনোভাব। কিন্তু এরও ব্যতিক্রম আছে। মান্ত্রীদীক্ষাও তিনরকম ভাবে দেখা যায়—তন্ত্রের বীজমন্ত্র, বৈষ্ণবদের নাম আর জ্ঞানীর মহাবাক্য। এ সকলেরই সাধারণ সাধনা জপ। 'তত্ত্বমসি' 'অয়মাত্মাব্রহ্ম', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই সব মহাবাক্যের মনন করতে হয়। ওঙ্কার জপের মতই এগুলির জপ ও অর্থভাবনের নির্দেশ আছে এবং জীবনও ওই সূত্রে বেঁধে চলতে হয়। আবার ভগবানের নাম জপ ও বীজমন্ত্রের জপও সেইরকম সাধন করে করেই সাধক সিদ্ধিলাভ করে। বাইরে থেকে গুরুমুখে বীজমন্ত্র না পেলেও দীক্ষা হয়। আসল কথা হল, অভীপ্সার আগুনটি ঠিক পরশমণির মত প্রাণে জ্বলতে শুরু করলেই দীক্ষার প্রয়োজনীয় অন্য শক্তিসম্পাত ও মন্ত্রের আবির্ভাব ইত্যাদি সবই সমাহৃত হতে বিলম্ব হবে না।

এই বিশ শতকে আমরা যে কয়জন জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছি তাঁরা কেউ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নন। তাঁরা স্বয়ম্ভূ, সম্প্রদায় তাঁদেরই ধরে চলে। দীক্ষাজগতেও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। আমরা বুঝতে শিখেছি আত্মদীক্ষা ও আত্মশুদ্ধি প্রথমে চাই, সেটাই প্রধান। আমি নিঃশেষে তোমারই হয়ে চলেছি, তোমাকেই শুধু চাই। আমি জানি আমার আত্মা তোমাতেই উৎসৃষ্ট। পরাঙ্মুখ আমার এই দেহ প্রাণ মনের ক্ষুদ্র ভোগায়তনের যা কিছু দাবি সবই তোমাকে উৎসর্গ করে তোমার পথে নেমেছি। এই ভাব নিয়ে আত্মোৎসর্গের পথে চলার সময় কার পক্ষে ঠিক কোনটা

অপরিহার্য সে কথা জোর করে বলা যায় না। দ্বিজাতির সাবিত্রী-দীক্ষায় প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটে আত্মাহুতির আগুনটি জ্বলে গেলে তো সবই হয়ে গেল। তা না হলে আবার সেই কালের অপেক্ষা করে তান্ত্রিক গুরুর কাছে বীজমন্ত্র গ্রহণ করতে হয়, এও আমরা দেখেছি। তাহলে বুঝতে পারছি যে অধ্যাত্ম পিপাসা না জাগলে দীক্ষা গ্রহণে কাজ হয়না, আত্মদীক্ষাও হয় না। তাঁর দিকে আমাদের অভিযান ও তাঁকে পাওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুতি, এর দুটো দিক আছে—তিনি আর আমি। আমরা নিজের দিকটা প্রথমে ভাল করে যেন দেখতে চাই না, আত্মবিচার করতে চাই না। অস্ফুট এক ব্যাকুলতা নিয়ে যাত্রা শুরু করে শেষে নিজের বরোই ঘুরপাক খেতে খেতে অনেক সময় হাল ছেড়ে দিয়ে এলিয়ে পড়ি নয়তো খাবি খাই। সেজন্য আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মবিচার যোগের পথে একান্তই প্রয়োজনীয়। অন্তরাবৃত হয়ে নিজের সব কিছু জানতে হবে, হৃদিস্থিত গুহাহিত অধুনক জ্যোতির শিখাটিকে দর্শন করতে হবে। এই আত্মপরিচয় যেমন দরকার তেমন ব্রহ্মের লক্ষণও ভাল করে বুঝে নিতে হবে। বেদান্ত বলেছেন তৎ ও ত্বং পদার্থেরও শোধন করে নিতে হয়।

আত্মবিশ্লেষণ করে করে চৈতন্যের বিভিন্ন স্তরগুলি শ্রীঅরবিন্দ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়ে দিয়েছেন যে কেমন করে আত্মপরিচয় লাভ করতে হবে। আত্মাকে বা নিজেকে জানতে গিয়ে অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়। ধ্যানে বসে এত আজে-বাজে চিন্তার আক্রমণ হয় যে তাতে ভয় পেয়ে যেতে হয়। কিন্তু নিজেকে জানার শুরুতেই ভয় পেলে চলবে না। এরকম আক্রমণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে পারে। আমাদের কারবার তো শুধু জাগ্রত মনটুকু নিয়ে। নির্জনতার ফাঁকা পেলেই অবচেতনার গুহায় গুহায় (ante chamber) যা সঞ্চিত ছিল সে সব কিছু সংস্কার বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে যে এরকম হবে এটা জেনে নিয়ে এটাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রথমে Sulphur দিয়ে পূর্বেকার দীর্ঘকালসেবিত ঔষধের প্রতিক্রিয়া সারিয়ে নিতে হয়। তখন রোগটা খুব বেড়ে সঙ্গীন (aggravated) হতে পারে। চিকিৎসকের মতে এটা ভাল লক্ষণ, ভিতরের জমানো কোনঠাসা সব রোগের আক্রমণগুলি বেরিয়ে পড়েছে; তাদের সম্মুখ সমরে শেষ করতে হবে। এরপর high potency-র ওষুধ পড়লে রোগের মূল পর্যন্ত উপড়ে বেরিয়ে যাবে এবং তাহলেই রোগী সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করবে। ঠিক এইরকম ভাবে আত্মনিরীক্ষায় নিজের ভিতরের সব কিছু বৃত্তিকে বেরিয়ে আসতে দিতে হয়। একান্তে নির্জন স্থানে আসন করলে নিজের বহু জটিলতা ও complexগুলি সব অন্তর্মুখীনতার পথ থেকে যে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় নিয়ে যায় এটা দেখা যায়। ভিজে কাঠে আগুন লাগালে ধোঁয়ানো

বেরোতে থাকে আর ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু তখন হাল ছেড়ে দিলে চলে না। পূর্বযোগে সব কিছুই এক সূত্রে গাঁথা, কাজেই আত্মপরিচয়ের মুখ্য ও ইতর সব বিবৃতিই চাই। আমাদের চিত্ত বহুসংস্কারে দীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে। তারপরে আবার তাতে ভাবনা (thought), অনুভব, উদ্বেলতা (emotion) এবং সংকল্প বা সংবেগ (Will) এই তিনে ধস্তাধস্তি লেগে আছে। ভাবাবেগ আছে তো সংকল্পের দৃঢ়তা নেই, ভাবনা স্বচ্ছ নয়; আবার সংকল্পের দৃঢ়তা আছে কিন্তু ভাবনা ভাবাবেগে আচ্ছন্ন—এরকম ব্যাপার লেগেই আছে। তাই দেহ প্রাণ মনের সমন্বয় করে নিতে হবে, সে এক প্রধান দায়। দেহ চায় তো প্রাণ চায়না আবার প্রাণ চায় তো মন চায় না; এইসব ঘরের ঝামেলাগুলি ভাল করে চিনে নিয়ে সবটাই খুলে মেলে তাঁর কাছে ধরে দিতে হবে। সেজন্য প্রথম নিজের ঘরেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, যত বেশী গ্লানি ও আবর্জনা বেরিয়ে আসে সেটা ভাল হওয়ার লক্ষণ বুঝে উৎসাহে ভাটা পড়তে দিতে নেই। বহুদিনের বন্ধ ধূলিমলিন একটি ঘর ঝাঁটা দিয়ে মার্জিত করতে গেলে ধূলায় ঝড়ে নাক চোখ মুখ বুঝি বা বন্ধই হয়ে আসে। এরকম হলেও এর পরেই ধীরে ধীরে গৃহ মার্জিত হবার মতই অন্তরটি নির্মল হয়ে আসে। ভাবনা, বেদনা এবং সংকল্পেও সামঞ্জস্য এসে যায়। ভাবনাটা সর্বদা তাঁকে নিয়ে এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই কম্পাসের কাঁটার মত ঘুরে থাকে। তাই তিনি ছাড়া যে আর কিছু নেই এবং জ্ঞান, কর্ম, সংবেদন সবই তাঁর দেওয়া এবং তাঁকেই সব দিতে হবে এই বোধ আসে।

কিন্তু এরপর বাহিরের বাধাগুলি আবার আসতে থাকে। সিদ্ধযোগীদের আসন ঘিরেই যেন ভয়ঙ্কর বাধার এক পরিমণ্ডল দেখা দেয়। সত্যশিব সুন্দরকে ঘিরে যেমন ভূত ও প্রেতরূপী অপশক্তিগুলিকে দেখা যায় এও তেমনই ব্যাপার। কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তা নিয়ে এগুলি গুছিয়ে নিয়ে বসতে হবে। একমাত্র তাঁকেই মন দেওয়া হয়েছে, কাজেই এসব বস্তুর অপচ্ছায়া থেকে মন তুলে নিয়ে এগুলি কাটাতে হবে। সাধারণ জীবনে দেশাচার লোকাচার ইত্যাদির কাছে আপনাকে বড় অসহায় লাগে এবং বাহিরের চাপে চরিত্র-বলও পিষ্ট হতে থাকে। কিন্তু তাঁকেই যখন মন দেওয়া হয়েছে তখন দেশের ও দশের কাছে যে মন দেব সেটা তাঁতে নিবেদিত ও তাঁর প্রসাদী মন। এ অবস্থায় বাকসংযম একটা বড় কথা। উত্তেজিত হয়ে কথা বলে আমরা মূল্যবান অনেক সম্পদ খুইয়ে ফেলি। বাকসংযমে ছোট খাট বাধাগুলি সরে যায়। কারণ বাধাগুলি আমরাই অনেক সময় অসতর্ক ও অসংযত হয়ে ঘটিয়ে তুলি। বন্ধু বলে যাদের মনে করেছি তারাই আবার জোরালো বন্ধনের কারণ হয়ে পড়ে। তাই সবসময় সেই দিকে মনটিকে ওই কম্পাসের কাঁটার মত ফিরে থাকতে দিতে হবে, কিছুতেই যেন স্থানচ্যুত না হয়। এ পর্যন্ত প্রচেষ্টা দিয়ে নিজেকেই সামলাতে হয়।

এর পরেও চেতনার সূক্ষ্মস্তর থেকে প্রবল বাধা সব এসে উপস্থিত হতে পারে (environmental consciousness)। কিন্তু তখন খুঁটি নিলে গেছে, শুধু সেটিকেই ধরে বসে থাকা। অন্ধ আসুরীশক্তি যন্ত্র পণ্ড করে দিতে চায়, ভরাঘট যেন উলটে দেয়। তাই এসময় চাই এক জোরালো ধৃতিশক্তি। বানরছানা যেমন মায়ের বুকটি আপটে ধরে থাকে, তেমনি করে তাঁকে আত্মসমর্পণ করে সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই খুঁটি ধরে থাকার মত বীর্য তখনই চাই। সমস্ত জগৎব্যাপী অন্ধশক্তির প্রতিরোধকেও সিদ্ধ মহাযোগী হটিয়ে দূর করে দিয়ে দেবতার আসন মুক্ত করেন; সেটা উচ্চস্তরের কথা। সে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের শেষ নেই। সিদ্ধযোগী যাঁরা এটা করেন তাঁরা বীর। শুদ্ধ স্ফটিকের মত স্বচ্ছ সে হৃদয়—তাকে ঘিরে বাহিরে ইষ্টগোষ্ঠির বন্ধনী বা পুণ্যপরিবেশ। কিন্তু তার বাহিরেই থাকে বিরাটের বাধা এবং তার সঙ্গে প্রবল শক্তি নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়। এই অন্তর্বিস্তার বাধাগুলিও অনাদি। এ সম্বন্ধে পূর্ণযোগের সাধকের ধারণা ও ভাবনা গোড়া থেকেই যথাসম্ভব স্বচ্ছ থাকা দরকার।

এর জন্য কি করতে হবে? বৌদ্ধদের যে মৈত্রীভাবনার কথা আছে, ব্রহ্ম বিহারের অঙ্গীভূত সেই মৈত্রীভাবনার সাধন করাটা এ ক্ষেত্রে এক অনুকূল ব্যবস্থা। ধ্যানে বসে চিত্ত যখন জমতে চায় না, তখন শান্ত হয়ে মৈত্রী বা সম্প্রীতির ভাবে আপ্লুত হয়ে যেতে হবে। তখন দেহবোধ পর্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে ভালবাসার এক dynamo-র মত কাজ করে, তার ধর্মই হল আলোর মত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ভাব বিচ্ছুরিত করা। আমারই চতুর্দিকে আমাকে ভাসিয়ে ও ডুবিয়ে দিয়ে সেই প্রীতি সকলের মধ্যে বিচ্ছুরিত—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঊর্ধ্ব অধ সবদিকে ব্যাপ্ত সেই ভাব সবার মধ্যে আবার নিশে যাচ্ছে। এতে সব বিরোধ গলে যায় এবং চিত্তে নামে তাঁর করুণা বা ভগবৎপ্রসাদ। এই ভাবনা পূর্ণযোগের অঙ্গ করে নিয়ে প্রবর্ত সাধকেরা (beginner) গোড়া থেকেই সাধন করলে সুফল লাভ করেন। কেননা পূর্ণযোগ সবার যোগ, সকলের কল্যাণেই নিজের কল্যাণ। সুখ দুঃখ আরাম ক্লেশ এ সবই কারও একার নয়, সকলের ভোগের বস্তু। তাই ধ্যানচিত্ত যাতে ব্যাপ্তিবোধে আবিষ্ট হয় এমন সাধন পেতে হবে। এই মন্ত্রভাবনও তাতে বড় সহায় হতে পারে—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

সবাই সুখী হোক আর নিরাময় থাকুক। সকলে কল্যাণদর্শী হোক; একজনও কেউ যেন দুঃখ না পায়। এই ভাবে এক সমদৃষ্টি লাভ করলে আপনাকে জেনে জগৎকে জানা যাবে। তারপর তাঁকে পরিপূর্ণভাবে জানার কথা আসে।

শ্রীঅরবিন্দ নামরূপের মোহটি যথাসম্ভব বর্জন করতে বলেছেন, কিন্তু চিন্ময় বিশুদ্ধ

রূপের ব্যঞ্জনায় ও ভিত্তিতেই যে নামরূপের সার্থকতা তা ধরিয়ে দিয়েছেন। এ যুগে অধ্যাত্মসাধনার গতি আমাদের কাছে সহস্রধারায় বহুমুখে সাগরমান এক বিরাট সিন্ধুর পরিচয় এনে দিয়েছে। এখন শুধু নামরূপের কথা বলে বা শুনে চিত্তের পিপাসা মিটানো যায় না, তাকে বৃহৎ বিশ্বরূপ ও লোকোত্তর ভাবে না পেলে চিত্ত ঠিক আশ্রয় পায় না। তাই কালী, কৃষ্ণ, শিব-দুর্গা যাঁকেই ইষ্ট রূপে গ্রহণ করি ভাবরূপকে এক বলে মিলিয়ে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু প্রতীক বা আবরণটি যদি সাধককে বেঁধে ফেলে তাহলেই বিপদ। অন্তরের ভাবটি বিশুদ্ধ হলে কথাই নেই, নাম রূপ প্রতীক যন্ত্র সবই ভাবগ্রাহী যোগেশ্বর স্বয়ং গ্রহণ করে বৃহতের আবরণ খসিয়ে দেন এবং সাধক তমসার পরপারে অভীষ্ট অমৃত-জ্যোতির দর্শন লাভ করে। সাধকের অগ্রগতি জ্যোতি থেকে উত্তর জ্যোতিতে অব্যাহত ভাবে চলে। এদেশে সবই ব্রহ্মের সাধনা বা ঈশ্বরের সাধনা—তাই কালী ব্রহ্ম, কৃষ্ণ ব্রহ্ম, শিব ব্রহ্ম। সব একাকার করে বুঝতে হয়। মূর্ত ও অমূর্তের রহস্য না বুঝলে সম্যক দৃষ্টিলাভ হয় না, পূর্ণ রসাস্বাদনও হয় না। ব্রহ্মই অদ্বিতীয়, তাঁর লক্ষণ সৎ চিৎ আনন্দ। সত্তা চৈতন্য ও রসস্বরূপের বোধে বোধ হয়। ব্রহ্মের সদ্‌ভাবই হল চিত্ত শান্ত হওয়ার ফল। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে যোগের এই ভূমি লাভ হয়। ভিতরটা সম্পূর্ণ শান্ত হলে পর, এক অস্মিতা বা অস্তিতার বোধ—শুধু 'আছি' এই রকম একটা বোধ মাত্র থাকে। মনস্তত্ত্বের ভাষায় চিত্ত প্রশান্ত, কোন তরঙ্গ নেই ; শান্ত আকাশের মত সেই শুদ্ধ অস্তিত্বের মধ্যেই আলোর বিন্দুগুলি ঝিকনিক করছে। জগৎ ভাসছে বুদ্বুদের মত তবুও সবই শান্ত। কূটস্থ সত্তা সাক্ষী রয়েছেন, তিনিই চৈতন্যস্বরূপ। তাঁরই দৃষ্টির বিপরীতে যেন এক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে চলেছে সুখ দুঃখ জয় পরাজয় লাভ ক্ষতি এই সব দ্বৈত বোধ, আর সমগ্র বিশ্ব এই দুই মেরুর মাঝে দুলছে ; আমরা তাতেই আছি। কিন্তু এই দোলার ঊর্ধ্বে উঠে ওই কূটস্থ চৈতন্যের মত সাক্ষী হয়ে আত্মস্থ হতে হবে। গীতায় যেমন ভগবান বলেছেন 'নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান' হতে। তা হতে গেলে আত্মাতে অচল ও অটল থাকার সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন যে কামারের নেহাইএর মত হতে হবে। যতই ধাক্কা আসুক ততই অটল অবিচলিত ও অক্ষুব্ধ থাকার শক্তি চাই। যোগের পথে প্রবল বাধা হল আমাদের অসহিষ্ণুতা। আমরা বড় রগচটা, তুচ্ছ কারণেই টালমাটাল খেয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলে বসি। মাথা গরম থাকলে আপনাকেও বুঝি না, জগৎকেও বুঝতে পারি না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভিতরে শান্ত থাকলে বাহিরটাকেও বুঝতে পারা যায়। তাই বুদ্ধির শুদ্ধি চাই, অবুঝের মত প্রমত্তের মত চলা ফেরা করতে নাই। শান্ত থেকে ধাক্কাগুলিকে সামাল দেবার চেষ্টা করতে হবে। এটা করা বা পারা খুব বড় কথা। সেজন্য এক শান্ত অবস্থার বা অন্তরে শান্তির এক ভিত্তি চাই যাতে

চিৎ ও আনন্দ এসেই যাবে, এ এক সাধারণ সরল নিয়ম। শান্ত হলে আত্মদৃষ্টিও খুলে যায়, সকলকে বুঝতে পারা যায়। এই ভাবের পরিপাকে আন্তর জ্যোতির আবির্ভাবে চিত্তের সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। সমস্যা না থাকলেই চিত্ত প্রসন্ন হয়। আনন্দের কথা আমরা ঠিক বুঝি না, সুখকেই আনন্দ মনে করি। কিন্তু চিত্ত স্বভাবে স্থিত হলে যে প্রসন্নতা লাভ হয় তাতেই দুঃখ নাশ হয় আর বুদ্ধি আত্মস্বরূপে স্থিত হয়। এই আত্মতুষ্টিই ব্রহ্মের আনন্দঘনতা। এ যত বৃদ্ধি পাবে ততই ব্রাহ্মীস্থিতি সহজ হবে। ব্রহ্মের লক্ষণে বলা হয়—সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম। শ্রীঅরবিন্দ এই আনন্ত্যকে ভাল করে বুঝতে নির্দেশ দিয়েছেন। অনন্তের সঙ্গে যে কোনও সংখ্যা গুণিত করলে অনন্তই হয়। কাজেই এই শান্তি বুদ্ধির শুদ্ধি ও তজ্জনিত যে চিত্তের প্রসন্নতা এ সব অনন্তগুণিত হলে ব্রহ্মভাবে নিয়ে যাবে।

শান্ত ও প্রসন্ন থেকে বুঝে চললেই আত্মোৎসর্গের ভাব এসে পড়ে। সব দান তোমারই, আমি মাথায় তুলে নিই—এই ভাব। আত্মোপলব্ধির সঙ্গে এ ভাব এলে আত্মসমর্পণও সহজ হয়ে যায়। ধস্তাধস্তি করাটা আমাদের মধ্যে নিতান্তই কুশ্রী দিক, সেটা সম্পূর্ণভাবে বর্জন (rejection) করা চাই। প্রতিমুহূর্তেই সেটাকে সরিয়ে শান্ত প্রসন্ন ভাবের প্রলেপে আলোর শিশুটিকেই সত্য ও সহজ হতে দিতে হয়। এই আলোর শিশুটি (Psychic being) যতই বর্ধিত হবে ততই কুশ্রী আমিটা ক্ষয়ে যাবে ও শেষে পালাবে। শ্রীঅরবিন্দ এই মিথ্যা বিকৃতির উচ্ছেদকে বলেছেন katharsis। সাধনার শুরুতে এটা হল ভিত্তি সাধনের কর্ম। এ থেকেই দীক্ষার প্রস্তুতি ও আত্মপরিচয় লাভ হয়। সচেতন থেকে মিথ্যা আমিকে অন্তরে প্রবিষ্ট হতে না দিলে সনবদ্ধ সদাশুচি থাকায় বাধা হবে না। নির্মেঘ নীল আকাশের ভাবনায় স্বচ্ছ হৃদয়টি মেলে দিলে সেটা ধ্যানচিত্তের সহায়ক হয়। তখন যেমন আমি তেমন তুমি, তেমনই আবার জগৎব্যাপিনী মা। নীলাকাশে সূর্য, চন্দ্র, অগণন নক্ষত্রপুঞ্জ সব রয়েছে; কোথাও তো ঠোকাঠুকি হচ্ছে না। সেইরকম ইষ্টভাবনায় নামরূপের পিছনে নির্নাম ও অরূপের ভাবনাকে বিলিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া আছে। নারদ সাবধান করে দিয়েছেন—অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বোধ থেকে নামরূপ যেন কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। আমার বা আমার ইষ্ট, যে নামই তিনি গ্রহণ করুন আর যে রূপই তিনি ধারণ করুন একমাত্র তিনিই তো সব হয়েছেন। তিনি অদিতীয়া, সতী, চিন্ময়ী, আনন্দময়ী সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি। এই স্মরণ করে ইষ্টধ্যানে চিত্ত লাগাতে হয়। বাহিরের রূপ তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; ধ্যানের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হলে হৃদয়ে হৃদয় মেলে, মনে মন গলে যায়, ধীশক্তি প্রচোদিত হয়। তখন গুরুচিত্তের ধ্যানে সম্যক দৃষ্টি খুলে যায়, দেখা যায় দেহ প্রাণ মন সবই ওই দিব্য আনন্দময়ীর চৈত্যসত্তা থেকেই বিচ্ছুরিত। এ রকম হলে আর নামরূপের আড়ালে পরমেশ্বরী হারিয়ে যেতে

পারবেন না। রাধাকৃষ্ণ, শিব, কালী সমস্ত ইষ্ট নামরূপ সম্বন্ধেই এই একই কথা। বিগ্রহবত্তার সার্থকতাও এইভাবে হয়।

উপনিষৎ শিখিয়েছেন—দেখ বাহিরের এই ভূতাকাশ, সেই বহিরাকাশই অন্তরের অবকাশ ভরে রেখেছে। অন্তরাকাশ আবর্তিত হয় হার্দাকাশে। নির্বেষ নীলাকাশের স্বচ্ছ হৃদয়দ্যুতিতে সারা দুনিয়াটাই যে ছায়াতপে ভরে রেখেছে। এই কল্পরূপই তো আমি। কিন্তু এতে যখন চিড় ধরে নিজের ও বাহিরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সব ছেড়ে পালাতে চাই। মনে হয়, তা না হলে ওই স্বচ্ছ ছায়াতপ হৃদয়টি বুঝি রাখতে পারব না। কিন্তু প্রাত্যহিক তুচ্ছ অভিমানগুলিকেও সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে, তার মধ্যে থেকেই। এর কোন **short cut** বা **made easy**-র উপায় নেই। অবাঞ্ছিত পরিণামগুলি চিনে নিয়ে প্রতিমুহূর্তেই তাদের তিরস্কৃত করতে হবে। জীবনের পথ থেকে এগুলি কাটিয়ে ওঠা খুব সহজ নয় কিন্তু যোগপথে এই সম্যক পরিবর্জনও এক মূল তত্ত্ব, এই কর্মে কুশলী হতে হবে তবেই আত্মদান সহজ হবে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—"অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু"। পুত্রদারা নিয়ে গৃহেই থাকতে হবে, কিন্তু অনভিষ্বঙ্গ ও অনাসক্ত হতে হবে। এই হল কৌশল। স্ত্রী পুত্র পরিবার ও সকল সম্পর্কের কোনটাতেই জড়িয়ে যেতে নেই। কামপুরুষের (**Desire Soul**) ভাব বর্জন করে চৈত্যপুরুষের নির্দেশে চললে দেখা যাবে সংসারের সব কিছু এই নিজের মধ্যেই লয় পেয়ে যাচ্ছে, আমি কিছু ঘটিয়ে তুলছি না বা আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে থাকতে যাচ্ছি না। সেই আপূর্যমান অচল প্রতিষ্ঠা তখন অধিগত হয়। সমুদ্রের মতই শ্রীকৃষ্ণের গভীর ভালবাসার আকর্ষণ, তিনি যখন আমার হৃদয়ে তখন তো সেসবই সেই আমার মধ্যে। সব কিছুরই গ্রহীতা হল তাঁরই সমুদ্রহৃদয়; তার মধ্যে সব কিছু প্রবেশ করে একেবারে তলিয়ে যাবে আর তাতেই শান্তি। এই হল শ্রেষ্ঠ পৌরুষ। বাসনা কামনার জগতে ধস্তাধস্তি লেগেই থাকে, সেটা চাওয়ার জগৎ। বাহিরের এই কুরুক্ষেত্রেই আমার অন্তরে যোগ দিয়ে বিজয়ী হতে হবে। পূর্ণযোগ যে সবার জন্য তাই এই বিজয় দেবতার, পরমপুরুষের শৌর্য নিয়েই এই ধর্মযুদ্ধ চালাতে হয়। বলা হয়েছে—**Win the world for Him.**

প্রাচীনকালে ঋষিদেরও সংসার ছিল। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, তাঁর দুটি পত্নী ছিল। অন্য ঋষিদেরও পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁরা শ্রোত্রিয় এবং মহাশাল। সংসারের সবকিছুকেই তাঁরা গোড়াতে স্বীকার করে নিতেন। কাজেই সকলের সঙ্গে গৃহে থেকে অনভিষ্বঙ্গ হয়ে যোগ করা সম্ভব। যোগের গোড়ার কথাই হল চিত্তের একাগ্রতা। বৃত্তির একাগ্রতার সঙ্গে ভূমির একাগ্রতা অর্থাৎ অখণ্ড ব্যাপ্তির এক বোধ চাই। সেটা সহজে হতে চায়না। খাপছাড়া বৃত্তিগুলি সব পরিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে তরঙ্গদোলার মত। হাওয়া জোর ধরলেই সব এলোমেলো হয়ে যায়, সেখানে সংহতি আনতে হবে। সব বৃত্তিগুলি

একমুখী করার জন্যই চিত্তবৃত্তিনিরোধের ব্যবস্থা। সেটা হল ঐকান্তিক একাগ্রতা (exclusive concentration)। তা থেকে ধীবৃত্তি অগ্রসর হয়। কিন্তু ঐ সঙ্গেই চিত্তের ব্যাপ্তি বা এক অখণ্ডভূমায়নে চিত্ত আবিষ্ট হওয়ার (pervasive concentration) প্রয়োজন। তবেই যোগভূমি পূর্ণ ও সমগ্র হয়। এই অখণ্ড অদ্বৈত বোধই বেদের ও উপনিষদের ধারা; শ্রীঅরবিন্দ এটা ধরিয়ে দিয়ে এর দিকে জোর দিয়েছেন। চিত্তের ভূমি (mood) লক্ষ্য করতে হয়। যেমন রাগ হলে সমগ্র চিত্তভূমি রাগে ঢেকে যায়, তা থেকে প্রতিপক্ষের অনিষ্ট চিন্তায় চিত্ত কেন্দ্রীভূত হয়। চিন্তা করা অপেক্ষা সংবেদনে ভূমির একাগ্রতা প্রদীপ্ত হয়। কাজেই সেই দিকটা পেতে হবে। অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ হয়ে তিনিই সত্তাকে তাঁর পরম জ্যোতিতে আবিষ্ট করে রেখেছেন। রামকৃষ্ণদেবের সেই কথা—সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে লীন হয়ে সাঁতার কেটে চলার মত শুধু মন প্রাণ নয় সমগ্র দেহ-ব্যাপী এক শান্ত উদ্দীপ্ত বোধ। এই স্মৃতিকে বহন করে চলতে হবে। দেহবোধ শিথিল করে দিয়ে প্রশান্তির অনুভব সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হলে সেটা ক্রমশ আধারে সহনীয় হয়ে হয়ে চিত্তে ধ্যানে আবিষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত সবই তিনি—তুহুঁ তুহুঁ। এই হল সহজ পথ, যদি সহজ বলে কিছু থাকে।

সেজন্য শুদ্ধি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। দেহ শুদ্ধি প্রথমেই চাই, তারপর প্রাণের ও মনের শুদ্ধি। ঈশ্বর সম্বন্ধে শুদ্ধ মনের চিন্তাভাবনায় (to feel god) আবেশ আসা চাই। অনেক উপদেশ শ্রবণ অপেক্ষা এই আবেশের শক্তি অনেক বেশী কার্যকরী হয় তা আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। প্রাণের ধর্মই হল অখণ্ডতার বোধে ব্যাপ্ত হওয়া। কাজেই দেহবোধ যত স্বচ্ছ হবে সর্ব্বব্যাপী ওই প্রাণের আবেশে মন সংযুক্ত হলে তাঁর সঙ্গে যোগও সহজ হবে। আত্মোৎসর্গের ভাবনায় এই অখণ্ড সমগ্রতায় তন্ময়তা (pervasive concentration) সেজন্য প্রধান কথা। শেষ পর্যন্ত তৎ (ব্রহ্ম) ও আমার সমীকরণ হয়ে যায় এই শরবৎ তন্ময়তা থেকেই।

[ক্রমশঃ]

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

মে ৫, ১৯৫১

শ্রীঅরবিন্দের "মা" (The Mother) বইখানি থেকে "যদি তুমি দিব্যকর্মের প্রকৃত কর্মী হতে চাও, তাহলে তোমার প্রথম লক্ষ্য হবে যাতে সমস্ত কামনা ও স্বার্থমুখী অহংভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মুক্ত হতে পারো।"

প্রশ্ন : আমরা নিজেদের জন্য কখনো বাজারে গিয়ে কিছু জিনিসপত্র কিনি, তা কি দোষের?

উত্তর : ও বিষয়ে কোনো সাধারণ নিয়ম করা যায়না। যে মনোভাব নিয়ে তুমি জিনিস কিনতে যাও তারই উপর তা নির্ভর করে। এখানে বলা হয়েছে যে তোমার কোনো কামনা থাকবেনা, সুতরাং ওতে কামনা না থাকলে কোনো দোষ নেই। অর্থাৎ "আসলে কোনো ক্রিয়াকে, কোনো কাজকেই তার নিজের দিক থেকে ভালো কিংবা মন্দ বলা যায়না তা সম্পূর্ণই নির্ভর করে যে মনোভাব নিয়ে তুমি করছ তারই উপর। যেমন মনে করো, যদি তোমার কি আছে আর কি নেই সে বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকো (সে ভাব আনা কিছু কঠিন বটে,—কিন্তু এমন অনাসক্তির অবস্থা আনতে পারা যায় যে "আমার ওটা আছে তো আছে, নেই তো কুছপরোয়া নেই"), তাহলে একটা সময় আসে যখন দেখবে, তোমার কোন জিনিসের প্রয়োজন যদি যথার্থ এবং খাঁটি হয় (কেবল নিজের তা মনে হলে চলবেনা, কামনা বা অভিলাষ ছাড়া যদি বাস্তবিকই প্রয়োজন আসে) তাহলে সে জিনিস আপনা হতে তোমার নিলে যাবে। যতকাল আমি এখানে আছি—খুবই দীর্ঘকাল হলো না কি?—তার মধ্যে এটা দেখেছি, এমন অনেকে আছে যারা আমার কাছে কখনো কিছু চায়নি। কিন্তু আমার মনে হয়না (মানুষের প্রকৃতিতে দুর্বলতা স্বভাবত কিছু তো থাকেই), মনে হয়না যে কোনো কিছুর জন্য তাঁদের বিশেষ বাসনা ছিল, কিন্তু বাস্তবিক প্রয়োজনের জিনিস তাদের হাতে আপনা হতেই এসে গেছে। হয়তো হঠাৎ আমার খেয়াল হয়েছে যে "অমুক জিনিসটা অমুককে দিতে হবে", কিংবা আমার যারা না হলেও কোনো অপ্রত্যাশিত উপায়ে সে জিনিস তারা পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যদি তোমার প্রয়োজন সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকো (কামনার কথা বলছিনা, সে হলো আলাদা

জিনিস), অর্থাৎ ভাবতে থাকো "অমুক জিনিসটা বাস্তবিকই আমার দরকার হচ্ছে", তাহলে প্রায়ই সে জিনিস তোমার মিলবেনা ; তখন তুমি তার জন্য উৎসুক হয়ে উঠবে, আর সামর্থ থাকলে আত্মসন্তোষের জন্য তা কিনে আনতে যাবে। এখানে অনেকে তাদের কামনাকেই প্রয়োজন বলে ধরে নেয়...তাদের সম্বন্ধে আমি বলছিনা, অধিকাংশই তাই। তাদের নিশ্চিত ধারণা যে সেই জিনিস ছাড়া বাঁচাই যায়না "অসম্ভব, ওটিকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকা...হয়তো একটা রোগ ধরে যাবে, কিংবা এমন মারাত্মক কিছু হবে আমার যে কাজই আর করতে পারব না। অসম্ভব, ওটা বাদ দিয়ে কিছু করাই যায়না।" এদের পক্ষে প্রথমে তা আগে পরীক্ষা করে দেখা দরকার (যদি তারা ঐকান্তিক হয়) : "আচ্ছা দেখাই যাক না ওটা বাদ দিলে কি হয়।" এ একটা উপভোগ্য পরীক্ষা। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে হাজারের মধ্যে ৯৯৯ দফাতেই তুমি বলবে, "তাই তো, মিছেই ভেবেছিলাম যে ও জিনিসের এত বেশি প্রয়োজন, অথচ না হলেও তো বেশ চলে যাচ্ছে।" এইভাবেই অল্পে অল্পে নিজের অনেক উন্নতি করে নিতে পারো।

এ হলো শিক্ষার প্রশ্ন—নিজেকে শেখানো। যতই গোড়ায় গোড়ায় করতে পারো ততই তা সহজ হয়। অল্প বয়স থেকে করতে পারলে তখন খুবই সহজ, কারণ আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াতে অভ্যস্ত হয়ে তখন বিচার বিবেচনা করে চলা যায়। অপরপক্ষে যারা ছেলেবেলা থেকে কামনার জিনিসকে প্রয়োজন বোধ করতে শিখে সেই ধারণার মধ্যেই ডুবে থাকে, তাদের পক্ষে এ শিক্ষা নেওয়া খুবই কঠিন হয়, কারণ কোনটা যে কামনা আর কোনটা নয় এই কথাই তাদের আগে বুঝতে হয় ; অনেক সময় তা বোঝা খুবই কঠিন, কারণ কামনা ও প্রয়োজন এমন জড়িয়ে থাকে যে কোনটা কি তা ধরাই যায়না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার বিশ্বাস যে অনেক কিছুই তোমাদের প্রয়োজনের মধ্যে নয়। আমার মনে আছে ফ্রান্সে থাকতে একবার আমরা চারজন মিলে পাহাড় ঘুরতে বেরিয়েছিলাম, এক শহর থেকে যাত্রা করে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে অন্য শহরে গিয়ে পৌঁছতে হবে, তাতে আট দশদিন সময় লাগবে। কিছু কিছু জিনিস সঙ্গে নেওয়া দরকার, তাই প্রত্যেকেই একটি করে ব্যাগ কাঁধে নিয়েছিলাম। যাবার আগে সকলে মিলে ঠিক করতে বসলাম যে কি কি জিনিস নিতান্তই দরকার। আর প্রত্যেক জিনিসের বেলাতেই বললাম, "আচ্ছা দেখিনা, এটা বাদ দিয়ে চলে কিনা," —শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে খুব অল্প জিনিসেই আমাদের কাজ চলে গেল। একজন ভ্যানিশ চিত্রকরকে আমি জানতাম, সে বলতো, "কোথাও যেতে হলে আমার কেবল একটি জিনিস চাই, একটা টুথব্রাশ।" তাতে একজন বললে, "তাই বা কেন, ব্রাশ না থাকলে আঙুল দিয়েই দাঁত ঘষা চলবে।"

প্রশ্ন : কিছু একটা করার আগে যখন জানতে চাই যে তাতে মায়ের ইচ্ছা আছে কিনা, তখন তা প্রায়ই বুঝিনা, কাজটা করে ফেলি। সে কাজের ফল দেখে কি বোঝা যাবে তাতে মায়ের ইচ্ছা ছিল কিনা?

উত্তর : তুমি সেটা বুঝতে পারোনা, যেহেতু বুঝতে তুমি চাওনা। শোনো বলি, আমার বিশ্বাস যে এমন কেউ নেই যার মধ্যে সেই স্বচ্ছতা নেই, কিন্তু তোমার জানবার ইচ্ছাটি আন্তরিক হওয়া চাই—সেই এক কথাতেই ফিরে আসছি—ঐকান্তিকতা থাকা চাই। প্রথম কথা, ও বিষয় নিয়ে ভেবে দেখতে বা নানা ধারণা গড়ে তুলতে বসবে না, তাতে একটা সম্ভাবনার সঙ্গে অন্যটার কাটাকাটি হয়ে মনে নানা গণ্ডগোল পাকায়। প্রশ্নটা এইভাবে নেবে যেন অন্যের কাছে তা ব্যক্ত করছ, তারপরে আর কিছু ক্রিয়া না ক'রে স্থির হয়ে থাকবে। কিছুক্ষণ পরে দেখবে যে অন্তত তিনরকম জিনিস হচ্ছে, তার বেশিও হতে পারে। ধরো একজন বুদ্ধিধর্মী লোকের কথা, যে তার মস্তিষ্কের নির্দেশই মানে। সে তার প্রশ্নটা তুলে এই ভাবে অপেক্ষা করতে থাকল। যথার্থ মনোযোগী হয়ে থাকলে সে দেখবে যে প্রথম এলো একটি ভাব (কিন্তু ঠিক এমনি পর্যায়ে না এসে অন্যরূপ পর্যায়েও আসতে পারে, তবে বুদ্ধিধর্মীদের বেলাতে প্রায় এমনিই হয়) : "এই ভাবে কাজটা করা ঠিক হবে, এটাই ঠিক রাস্তা,"—অর্থাৎ এ হলো মনের সংগঠন। দ্বিতীয় যা আসবে তা আবেগজ উক্তি : "আমাকে এই রকমই করতে হবে, ঠিক ঠিক, এই করাই ভালো।" আর তৃতীয় যেটি আসবে তা অমন হৈ চৈ ক'রে নয়, অন্যগুলি উক্তিকে বাধা দিয়ে নয়, আসবে একটা প্রশান্ত নিশ্চয়তা নিয়ে—তা আসবে ব্যস্ত হয়ে বা জোরে কোনো শব্দ দিয়ে নয়, কিন্তু মৃদু ও নিশ্চিত ভাবে। সে অন্যগুলির প্রতিবাদ করবে না, বলবে না যে "ওটা ভুল" সে শুধু বলবে, "এইরকম করো," কিন্তু জিদ্ করে বলা নয়। অনেকে ঠিক নীরব মনোযোগের অভাবে এ উক্তিকে লক্ষ্য করে না, কারণ এটি চেঁচিয়ে বলা নয়। কিন্তু আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, এমন উক্তি প্রত্যেকের মধ্যেই আসে, বাস্তবিক ঐকান্তিক হয়ে নীরব হয়ে থাকলে প্রত্যেকেই তা জানতে পারে। যে অংশটা ভাবতে যায় সে কেবল তর্ক করতে থাকে "এই করলে এই ফল হবে, ওটা করলে ঐ ফল মিলবে..." এমনি এটা ওটা ভাবতে গিয়ে আবার সব গুলিয়ে ফেলে। আবার অন্য অংশ (প্রাণসত্তা) বলবে, "হাঁ, এটাই করা চাই, তুমি বুঝছ না এ একেবারে অপরিহার্য।" তখন এমনিই জিনিস জানান দেবে, আর আপন প্রকৃতি অনুসারে তুমি প্রাণের বা মনের কথাটাই বেছে নেবে। খুব কম ক্ষেত্রেই তুমি বলবে শান্ত হয়ে, "না, ঐ মৃদু কথাটাই আমি শুনতে চাই, তাতে যা হয় হোক", যদিও তা তোমার নিজের মনঃপূত না হয়। কিন্তু ওটা ঠিক আসেই। এমন কি যে খুনী, তারও খুন করার আগে ওটা আসে, কিন্তু তার বাহ্যসত্তা এমনই গণ্ডগোল পাকায় যে ওটি শোনবার দিকে তার

মনই যায়না। কিন্তু তবু ওটা আসেই, সর্বদা। প্রত্যেক সত্তার মধ্যে প্রত্যেক স্থলেই এই জিনিসের সাড়া একটু আসে (ঠিক কণ্ঠস্বর নয়, কারণ সে শব্দ করেনা), ভগবৎ-কৃপার একটু ইঙ্গিত মাত্র, যা শুনতে একটু প্রয়াস লাগে, কারণ সত্তার অন্য সব অংশ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকে, কোনো অংশ তার যুক্তির অকাট্যতা দিয়ে, কোনো অংশ তার ইচ্ছার জোর দিয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওটি জানতে পারা যে অসম্ভব এমন কথা বোলোনা, কারণ তা সত্য নয়। জানা ঠিক যাবেই। কেবল তুমি কি করবে তা ঠিক করতে পারোনা, জানতে পেরেও নানা অজুহাতে তার কথা এড়িয়ে যাও। তখন বলো, "ঐ আভ্যন্তরীণ নির্দেশ সম্বন্ধে তেমন নিঃসন্দেহ হতে পারছি না ; খুব তেমন জোরের সঙ্গে তো বলছে না যাতে ওর উপর নির্ভর করতে পারি।" কিন্তু তুমি যদি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে অর্থাৎ দেহে মনে প্রাণে নিতান্ত কামনাশূন্য হতে, তাহলে নিশ্চয় জানতে যে তাই ছাড়া অন্য কিছু করা ঠিক নয়। কেবল তোমার নিজের পছন্দ ও কামনাগুলোই তার প্রতিরোধ করে দাঁড়ায়। এর শত শত দৃষ্টান্ত প্রত্যহই দেখবে। লোকে যখন বলে, "তাইতো, কি যে করি তা বুঝি না," তার মানে সেখানে রয়েছে পছন্দের প্রশ্ন। কিন্তু এ আশ্রমের লোকেরা অন্যরকম জানে, মনোযোগ দিয়ে থাকাতে তাদের একটা অস্পষ্ট রকমের অন্যবোধ আসে, "এটা ঠিক হবেনা, আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে।" আর তুমি এইমাত্র বললে, কাজের ফল দেখে জানার কথা ; কথায় আছে (এবং বইতেও আছে) যে ফল দেখে ভগবৎ-ইচ্ছা জানা যায় ; সাফল্য হলেই জানবে তা ভগবানের ইচ্ছা, আর না হলেই জানবে যে তা নয়। এ একটা পাহাড়ে বোকামির কথা। সন্ন্যাটার ঐরকম ধরনের হাস্যকর মীমাংসা করে নেওয়া হয় মনের দ্বারা। কিন্তু তা ঠিক নয়। যদি কিছু ইঙ্গিত পাও, তা ঐ অসহ্য, অস্বস্তির ভিতর দিয়ে, বড়োরকম কিছু হবেনা, তোমার ঐকান্তিকতা অনুযায়ী একটু মাত্রই ইঙ্গিত মিলবে।

কিন্তু এখানে তোমরা জানো, আরো এক সোজা উপায় আছে (কেন যে তা প্রয়োগ করোনা জানিনা, কারণ তা খুব প্রাথমিক উপায়) ; আমি রয়েছি তোমার সামনে এই কথাটি মনে ক'রে নিয়ে বলো "এ কাজটা কি আমি এই মায়ের সামনে করতে পারি, বিনা দ্বিধায় বিনা বাধায়, অনায়াসে ?" এ কথা ভেবে দেখলে আর কখনই প্রতারিত হবে না। যদি ঐকান্তিক হও তাহলে তৎক্ষণাৎ জেনে যাবে। এতে অনেক বোকামি করা থেকে নিবৃত্ত হবে।

প্রশ্ন : আচ্ছা এমন কেন হয়, খেলতে খেলতে হয়তো ভগবানের কথা ভুলে আছি, বেশ খেলছি কিন্তু যেমনি হঠাৎ ভগবানকে মনে পড়ে গেল অমনি খেলাতে যেন ভাঙন এসে গেল, তেমন ভালো ভাবে আর খেলতেই পারলাম না ?

উত্তর : অর্থাৎ সব ওলটপালট হয়ে যায়। এই হলো সমস্যা। তুমি ভাবলে যে স্মরণ না করলেই বুঝি ভালো খেলতে পারতে। না, তা মোটেই নয়। খেলা বা যাই কিছু করা হয়—তখন তা করো একটা একাগ্রতার সঙ্গে। সেই একাগ্রতার সঙ্গে ভগবানকে মিশিয়ে নিতে তুমি অভ্যাস করোনি (যদিও তা শক্ত নয়, কিন্তু তুমি তাতে অনভ্যস্ত), তারপর হঠাৎ যখন এই স্মৃতিটা এসে পড়ল তখন দুটি জিনিস হতে পারে চেতনার মধ্যে একটা নতুন জিনিস আসাতে তোমার একাগ্রতা বানচাল হয়ে যায়, অথবা মনে একটা অনুতাপ বা উদ্বেগ আসে, "তাইতো আমি এ কথা ভুলেই ছিলাম,"—এতেই সব নষ্ট হয়, কারণ অবস্থাটা তখন বদ্‌লে যায়। নতুবা স্মরণ করাতেই যে খেলা খারাপ হলো তা নয়, একাগ্রতা চলে যাওয়াতেই অমন হয়। একাগ্রতা রেখে যদি স্মরণ করতে পারতে, তা কঠিন নয়, তাতে খেলা আরো ভালোই হতো।

আরো একরকম মনোভাব নিতে পারো। খেলতে খেলতে হঠাৎ দেখলে যে সেটা যেন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে,—তুমি ভুল করছ, অন্যমনস্ক হচ্ছ, যেমন কখনো তার উল্টো ধারা এসে পড়ছে,—পূর্বাভাস মতো যদি সেই মুহূর্তে আপনা হতে একটা মন্ত্র বা বিশেষ শব্দ বার বার আবৃত্তি করতে থাকো, তার ফল খুব চমৎকার হবে। নিজের একটা মন্ত্র তুমি বেছে ঠিক করে নিলে, অথবা সে মন্ত্র কোনো বিপদের সময় আপনা হতে বেরিয়ে এলো। যখন খুবই কঠিন অবস্থায় পড়ে দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছ, কি করবে ভেবে পাচ্ছনা, তেমন সময় শব্দটা তোমার ভিতর থেকে এলো। অবশ্য প্রত্যেকেরই সেটা আলাদা হবে। কিন্তু সেটিকে মনে রেখে যখনই কোনো বিপত্তি ঘটবে তখনই যদি তা আবৃত্তি করতে থাকো, তার ফল হবে অনিবার্য। ...যেমন, তুমি যখন কিছু অসুস্থ বোধ করছ, কিংবা উপস্থিত কাজটা ভালো হচ্ছেনা বলে বোধ করছ, কিছু অশুভ আক্রমণ আসছে বলে বোধ করছ... কিন্তু তখন কোনোরূপ ভেবেচিন্তে নয়, সে মন্ত্র সত্তার ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বেরিয়ে আসা চাই। তোমার মন্ত্র তুমিই বাছবে, কারণ তা তোমার আত্মারই স্ফূর্ত বিকাশ; তা এক কথা বা দুই কথার বা এক ছত্রেরও হতে পারে, সেটা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, কিন্তু তা এমন হবে যে উচ্চারণমাত্রে তোমার মধ্যে এক বিশেষ অবস্থার সঞ্চার করবে। এমন মন্ত্র তোমার থাকলে তুমি অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। এমন কি খুব কঠিন বিপদ যদি আসে, যেমন কেউ তোমাকে হত্যা করতে আসছে, তখন যদি অস্থির বা বিচলিত না হয়ে ধীর মনে মন্ত্রটি আওড়াতে থাকো, তাহলে কেউ ছুঁতে পারবেনা। অবশ্য সে ক্ষেত্রে নিজেকে তোমার সংযত রাখা চাই; কোনো একটা অংশ পাতার মতো ভয়ে কাঁপতে থাকলে চলবেনা, পুরো ঐকান্তিকতার সঙ্গে মন্ত্র বলতে থাকলে তা পুরো শক্তিশালী হবে। সব চেয়ে ভালো হয় যদি সে মন্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারিত হতে থাকে। দারুণ বিপত্তির মুহূর্তে (মনের বা প্রাণের বা দেহের যাই হোক না কেন) তুমি যেমনি ডাক দিলে অমনি হঠাৎ সে

মন্ত্র যেন নাক দিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো, দুই তিনটি শব্দমাত্র, যেন স্যাজিকের মতো ; তবে তোমার তাতে অভ্যাস থাকা চাই, বিপত্তির কালে সে মন্ত্র উচ্চারণ করা। অভ্যাস করে নিলে তা একদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসবে, যখনই বিপদ আসবে তার সঙ্গে সঙ্গে। তখন দেখবে তার আশ্চর্য ফল। কিন্তু তা যেন কৃত্রিম না হয়, মনে মতলব এঁটে বলবেনা, "এখন মন্ত্রটা উচ্চারণ করি", কিংবা অপরে কেউ মনে করিয়ে দেবেনা, "এখন মন্ত্র বলো, ভালো ফল হবে" তার পক্ষে হতে পারে, কিন্তু অন্যের পক্ষে নয়।

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দের "মা" (The Mother) বইখানি থেকে পড়ে—"তোমার কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সেবা, গ্রহিষ্ণুতা, ভগবৎ ক্রিয়ার পূরণ, ভাগবতী শক্তির ক্রিয়ার অভিব্যক্তির যন্ত্র হওয়া।"

উত্তর : হাঁ, তোমার কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে সেবা, অর্থাৎ নিজের ভালো করার বদলে তাঁরই সেবা করতে চাওয়া, আর ভগবৎ-শক্তিকে গ্রহণ করা, বাহির থেকে নয় (তা যেন মনে কোরোনা) কিন্তু নিজেরই ভিতর থেকে ; তুমি নিজেকে দিব্যশক্তির কাছে খুলে ধরবে এবং তা তোমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে—এই হলো অর্থ—আর সেই শক্তি তোমাকে দিয়ে যা পূরণ করাতে চায় তাই তুমি করবে। এতে অহং-এর স্থানই নেই। দেওয়া ও প্রতিদান নেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। তা নয়, বাহির থেকে কিছুই পাবার নেই।

অনেক পদ্ধতির এমন সব নিয়ম আছে (আমরা তা পছন্দ করিনা, কারণ সে সব নিয়ম মাত্রই ইচ্ছাকৃত ও কৃত্রিম) যে ভগবান বা তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ গুরুর কাছে ছাড়া আর কারো কাছে কিছু নেওয়া নিষেধ। অনেকে গুরুর কাছে ছাড়া আর কারো কাছে একটা ফল পর্যন্ত নেয়না। এ নিতান্ত বাড়াবাড়ি—সবই নির্ভর করে ঘটনা ও অবস্থার উপর, কেমন মনোভাবে নেওয়া হচ্ছে তার উপর এবং আরো অনেক কিছুর উপর, তা বলতে অনেক সময় লাগবে,—কিন্তু একটি জিনিস শেখা দরকার যে একমাত্র ভগবান ছাড়া কারো উপরে বা কোনো কিছুর উপরে আদৌ নির্ভর করবেনা। কারণ অন্য যাকেই আশ্রয় করবে, সে আশ্রয় তোমার ভেঙে যাবে, এ কথা নিশ্চয় জেনো। যে মুহূর্ত থেকে যোগ শুরু করলে (যারা যোগ করে তাদের কথাই বলছি, সাধারণ জীবনের কথা নয়) তখন থেকে যারই উপর নির্ভর করতে যাবে তাকে যেন ভগবৎ-শক্তির প্রতিনিধি বলে মনে করতে চাইবে ; কিন্তু নিশ্চিত জেনো যে কোটির মধ্যে একজনও নেই যে ওরূপ ভার সইতে পারে, ভেঙে সে পড়বেই। সুতরাং একমাত্র ভগবান ছাড়া অন্য কারো কাছে আশ্রয় বা সান্ত্বনা

বা সাহায্য প্রত্যাশা করবেনা। এটা কিন্তু খাঁটি কথা। আমি এমন দৃষ্টান্ত একটিও দেখিনি যেখানে কেউ অন্য কিছুকে অবলম্বন করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হয়নি (যারা যোগের সম্পর্কে আছে তাদের কথাই বলছি),—তা নিশ্চয় ভেঙে যাবে আর তুমি অবলম্বনহীন হয়ে পড়বে। তখন বলবে, "জীবন বড়ই কঠিন",—জীবন কঠিন নয়, কিন্তু তুমি নিজে কি করছ তাই জানা চাই। ভগবান ছাড়া আর কোথাও নির্ভরতা রাখবেনা, আর কোথাও সাফল্য চাইবেনা। তোমার প্রয়োজন মেটাবার জন্য ভগবান ছাড়া আর কারো উপরে প্রত্যাশা রাখবেনা—কখনো কোনো কারণেই নয়। তখন তোমার প্রয়োজন কেবল তিনিই মেটাতে পারেন। তোমার সকল দুর্বলতাকে কেবল তিনিই বহন করতে পারেন এবং তা দূর করে দিতে পারেন। সকল সময়েই তাই, কেবল তিনিই দিতে পারেন তোমার যা দরকার; অন্য কারো কাছ থেকেই যদি আশ্রয়, সুখ, শান্তি, সাহায্য বা যা কিছু চাইতে যাও...নিশ্চয় একদিন মুখ থুবড়ে পড়ে তোমার নাক ভেঙে যাবে, আঘাত পাবে খুবই, তা গুরুতর হতে পারে।

মে ৭, ১৯৫১

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দের "মা" (The Mother) থেকে পড়ে "Hierarchy" কাকে বলে?

উত্তর : তার মানে উঁচু নীচুর ধাপ অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা। মনে করো কেন্দ্রস্থলে রইল তোমাদের একজন নেতা, তাকে ঘিরে সাজানো রইল ৪ জন, তাদেরও ক্রমশ ঘিরে রইল ৮, ১২, ২৪, ৩৬, ৪৮, ১২৪ জন ইত্যাদি; তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা কাজ ও তারই মতো নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া রইল, কেন্দ্র থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত। একেই বলে "Hierarchy", ক্রমবিভাগ। দেশের শাসনকার্যের ব্যবস্থাতে এমনি ক্রমবিভাগ করা হয়, কিন্তু তা হয় স্বেচ্ছাকৃত ও অসত্য, কোনো তার দাম নেই। প্রাচীন সাধনব্রতীদের মধ্যে এমনিতরো ব্যক্তিগত মূল্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী ক্রমবিভাগ ছিল—তার কেন্দ্রে থাকত পরমেশ্বরের ও পরমাশক্তির মূল প্রতিনিধি। কোনো কোনো ধর্মে কেবল তিনিই থাকতেন। কিন্তু সংঘবদ্ধ হলে এরূপই ভাগ করা হতো, নীচের যারা তারা উপরের ব্যক্তিদের কাছে তাদের সমস্যা নিবেদন করত। অর্থাৎ ১২৪ পর্যায়ের যারা তারা গিয়ে বলত ৪৮ পর্যায়ের কাছে, তারা বলত ২৪ পর্যায়ের কাছে, তারা বলত ১২র পর্যায়ে, তারা বলত ৮ এর পর্যায়ে, ইত্যাদি। এই হলো ক্রমবিভাগের ধারা।

এখন কিন্তু কথাটা স্পষ্টভাবে বলা হয়। যারা উপরের তারা তারে নীচের লোকদের উপর তাদের কর্তৃত্ব আছে। কিন্তু বাস্তবিক এটা গুহ্যবিদ্যার অন্তর্গত আরো গভীরতর ব্যাপার, অদৃশ্য জিনিস, যার অর্থ ভগবৎ অভিব্যক্তির ক্রমবিকাশ।

প্রশ্ন : "বিশ্বাতীত মাতা" এ কথার কি অর্থ?

উত্তর : তিনরকম মূল তত্ত্বের কথা বুঝি জানোনা,—বিশ্বাতীত, বিশ্বগত ও ব্যক্তিগত? বিশ্বাতীত হলো বিশ্বসৃষ্টির আদিতে, বিশ্বগত হলো এই সৃষ্টির মধ্যে, আর ব্যক্তিগত মানে তো জানোই। ভগবানও বিশ্বাতীত বিশ্বগত ও ব্যক্তিগতভাবে আছেন। অর্থাৎ তুমি ব্যক্তিগতভাবে ভগবৎ-চেতনার সংস্পর্শে নিজের মধ্যেও আসতে পারো, বিশ্বের মধ্যেও আসতে পারো আবার বিশ্বাতীত নিরাকারের মধ্যেও আসতে পারো। তেমনি আদ্যাশক্তি মাতার বেলাতেও তাই—তিনি বিশ্বাতীত বিশ্বগত ও ব্যক্তিগত তিন রকমেই আছেন।...তোমরা জানো তো সেই ফুলের কথা যার নাম আমি দিয়েছি "রূপান্তর" তার আছে চারটি পাপড়ি ক্রসের মতো সাজানো; তার উপরের পাপড়িটি হলো বিশ্বাতীত, তার নীচে দুই পাশে দুটি হলো বিশ্বগত, সব নীচেরটি হলো ব্যক্তিগত।

প্রশ্ন : উপরের পাপড়ি দুই ভাগে ভাগ করা।

উত্তর : ঠিক কথা, পরাৎপর বিশ্বাতীত একযোগে এক এবং দুই (দ্বৈত) হয়। এ ফুলটির গঠন নিখুঁত। ক্রসেরও মূল মর্ম তাই ছিল, কিন্তু তা ঐ ফুলের মতো নিখুঁত নয়, তাতে ছিল এক দুই আর তিন। খুব ঠিক হলোনা, এই ফুলটিই ঠিক।

প্রশ্ন : সেই মা হলেন আদ্যাশক্তি অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তিনি তো একাত্মা, তাহলে তিনি বিশ্বাতীত কেমন ক'রে?

উত্তর : কিন্তু এই মা যে সৃষ্টির আগেতেও ছিলেন। নিশ্চয় ছিলেন, নতুবা তিনি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেননি। তিনি সৃষ্টিকারিণী হলে তার আগের থেকেই আছেন, নতুবা তা করবেন কেমন ক'রে?

প্রশ্ন : তাহলে কি তিনি সৃষ্টির আগে পরমেশ্বরের মধ্যেই ছিলেন?

উত্তর : "মধ্যে" ছিলেন...তা বলা কঠিন, "মধ্য" ছিলেন কি "বাইরে" ছিলেন, যখন এখানে নিরাকারের প্রশ্ন রয়েছে। ইচ্ছা হলে বলতে পারো তিনি ভগবানের শক্তিরূপ

(বোঝবার সুবিধার জন্য) কিংবা তাঁর সম্পর্কিত রূপ বা ভঙ্গী....তোমার চেতনাতে যেমন আসে তেমন বলতে পারো। মানুষের মন বুঝতে চায় টুকরো টুকরো ক'রে...আমি একটা গল্প বলছি ছেলেদের মতো ক'রে। ভগবান বিশ্বসৃষ্টি করবার ইচ্ছাতে একটা আভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তির ভাব গ্রহণ করলেন মাতৃশক্তি রূপে (তখনও অপ্রকাশ)। তাঁর ইচ্ছা হলো যে এইভাবে এই শক্তির দ্বারাই বিশ্বসৃষ্টি হবে। সুতরাং আগে দরকার হয়েছিল এই মায়ের পরিকল্পনা, তার পরে তিনিই করলেন বিশ্বসৃষ্টির পরিকল্পনা।...শুনে যাচ্ছ তো? যদিও বলে রাখছি যে ঠিক এমনটাই যে হয়েছে তা নয় (।) তবু ছেলেদের পক্ষে বোঝবার জন্য তাই বলা হচ্ছে। তাহলে এখন বলতে পারি যে জগন্মাতা একজন আছেন যিনি তাঁর সৃষ্টির বাইরে। তিনি হয়তো পরিকল্পিত বা সংগঠিত হয়েছিলেন (যাই বলো) সৃষ্টিকার্য করবার জন্য; কিন্তু তাহলে আগের থেকেই তাঁর থাকা চাই, নতুবা সৃষ্টিকার্য করবেন কেমন ক'রে? তাঁর সে অবস্থা বিশ্বাতীত এবং তা চিরস্থায়ী। সময়ের হিসেব ক'রে বলতে হলে বলা যাক যে ১লা জানুয়ারী 0000 সালে জগৎসৃষ্টি শুরু হলো, যদিও বাস্তবিক তা নয়! আসলে তিনি নিরবধি বিশ্বাতীত, নিরবধি বিশ্বগত, নিরবধি ব্যক্তিগত, এবং তার পারস্পরিক অস্তিত্বও সমকালীন। অর্থাৎ তুমি চেতনার সে অবস্থাতে পৌঁছলে যে-কোনো মুহূর্তে বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত ও ব্যক্তিগত তিন ভাবের শক্তির সংস্পর্শেই আসতে পারো, একই কালে—তাতে সময়ের বিবর্তন লাগেনা, কেবল আমাদেরই বলবার সময় তা লাগে, কারণ একসঙ্গে তা বলাই যায়না। যদিও তা অনুভব করতে পারি কিন্তু একটার পর অন্যটা বলা ছাড়া উপায় নেই—যেহেতু একত্রে সব কথা বলা যায় না তেমন যদি বলা যেতো তাহলে তা সত্যের কতকটা কাছাকাছি হতে পারত।

মোট কথা যা বলা হলো, যা বলা হয়েছে, এবং যা বলা হবে, সমস্তই অস্পষ্ট ও সীমা-বদ্ধ, যার মধ্যে অবস্থান করতে পারো তার বর্ণনা করতে পারোনা। কিন্তু একটা সময় আসে যখন তুমি যার মধ্যে আছো এবং যা দেখতে পাচ্ছ সেই একই সত্যকে ধর্মের অথবা অতীন্দ্রিয়ের অথবা দার্শনিকের অথবা বস্তুতান্ত্রিকের ভাষাতে ব্যক্ত করতে পারো, তাতে কিছু যায় আসেনা। কেবল যখন মনশ্চেতনার মধ্যে থাকো তখনই একটাকে মনে হয় সত্য আর অন্যটাকে মনে হয় অসত্য; তার মানে প্রকাশের মধ্যে তারতম্য থাকে। অনুভূতির মধ্যে পূর্ণতা আছে কিন্তু ভাষাতে ব্যক্ত হচ্চে না—তবে ভাষা থেকে ভাষান্তর প্রয়োগ করতে পারো এবং সতর্কভাবে বললে সকল ক্ষেত্রেই সত্যের কিছুটা ব্যক্ত করতে পারো।

এ সব কথা বললাম তোমাদের মনে ধাঁধা লাগাবার জন্য নয়, এটি বোঝাবার জন্য যে অনুভূতির সত্য ও তার প্রকাশের মধ্যে অনেকটাই তফাৎ থাকে, যতই ভালোভাবে তা প্রকাশ করা হোক না কেন।

মে ১১, ১৯৫১

প্রশ্ন ("মা" বইখানি থেকে 'মহাকালী' সম্বন্ধে পড়ে)—মহাকালীর মূর্তি সম্বন্ধে যে সব গল্প বলা হয়ে থাকে তা কি সত্য ?

উত্তর : কোন গল্প ? গল্প তো শত শত আছে। কোন গল্পের কথা বলছ ? কোন মহাকালীর কথা ? যে সব মূর্তি দেখা যায় ? ওগুলো মানুষের গড়া। তিনি অমন কিছু নন।

আমি আগেই একবার বলেছি যে এই সব উচ্চ সত্তারা মূলতঃ একরূপ উচ্চ ধরনেরই হয়ে থাকেন, পরে উত্তরোত্তর বাস্তবের স্তরে ও পৃথিবীর কাছাকাছি এসে আশ্চর্যরূপে বহুধা আকার গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ এঁদের কথাই এতে বলেছেন, যাঁরা অতিমানসের খুব কাছে আছেন ও সচেতনভাবেই মূলের সঙ্গে সংস্পর্শযুক্ত। শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেন "অধিমানসের" স্তর সেখানেও এঁরা অভিব্যক্ত হন, তখন এঁদের বিশিষ্ট রকমের আকৃতি হয় এবং সেই সঙ্গে আদি ক্ষমতাও কিছু কমে। সেখান থেকে তাঁরা নামেন পার্থিব মানুষের মনে, সেখানে এসে...ভেবে দেখ এই বেচারা মহাকালীর কথা। এখানে কত রকমের কালী আছে যা কত ভয়ংকর ; কোনোটি বা দারুণ ভীতিপ্রদ (বলা বাহুল্য এগুলি নিতান্তই মানুষের মনগড়া). অর্থাৎ মানুষের মনে যতটুকু সামর্থ্য তারই দ্বারা তারা কল্পনা সহকারে এমনি বাহ্য রূপ দিয়েছে। ওর মধ্যে হয়তো মহাকালীর মহাতেজের কিছু একটু অস্পষ্ট প্রতিফলন থাকতে পারে, কিন্তু তা এতই বিকৃত ও বিকৃত, মানুষের চেতনাতে নাগাল পাবার জন্য এতই সংকুচিত, যে তিনি নিজেই সেখানে নিজেকে চিনতে রাজী হবেন না। আমি মহাকালীর প্রতিমার অনেক ভয়াবহ নমুনা দেখেছি। সে কথা না তোলাই ভালো। শিল্পী ভালো হলে বরং কিছু সৌন্দর্য থাকে, কিন্তু সাধারণত অনভিজ্ঞ অবোধের হাতে গড়া হলে কিছুই থাকেনা। আর যে সব মূর্তি মন্দিরে স্থাপনা করা হয় (প্রস্তরমূর্তি বা চিত্রপট) এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে পূজা করা হয়, সেখানে সেই পূজারী বা সহকারীর মধ্যে কিছু যদি গুহ্যশক্তি থাকে, তা সে যতই অল্প হোক, তাহলে সে তার পূজা ও আত্মহার জোরে তাতে অলৌকিক চেতনার আরোপ করতে পারে। সে পূজার সূত্র এই : তোমাদের বলা হয়, "এ কাঠ নয়, পাথর নয়, ছবি নয় ; এর মধ্যে শান্তি সঞ্চারিত হয়েছে, তোমাদের নিবেদন এর কাছে জানাতে পারো।" ঠিক কথা, কিন্তু দেখতে হবে তার পূজারী কেমন, তার গুহ্যচেতনা সেই শক্তিকে আহ্বান করতে পেরেছে কিনা। অতএব এর মধ্যে অনেক কিছু ব্যাপার আছে...মূর্তিতে "কিছু একটা" থাকেই (যদি তার পূজারী অন্ত মূর্খ ও শক্তিহীন না হয় আর তার পূজা লোকদেখানো না হয়, যদিও খুব কমই তা হয়ে থাকে), সাধারণত কিছু একটু থাকেই, কিন্তু সে কেমন জিনিস কোথায় কতটা আছে তা বলা...আবার তা বিচিত্র

ও ভয়ংকর রকমেরও হতে পারে। মহাকালীর দৃষ্টান্ত নিয়েই বলছি, কারণ তাঁরই সম্বন্ধে মানব চেতনার ধারণা আতংকসূচক। অন্য কোনো দেবতা, যেমন মহাসরস্বতীর বেলাতে যে শিল্পরুচি ও বিদ্যা প্রভৃতি গুণগুলি আরোপ করা হয়, সে স্থলে ওরূপ নয়। কেবল মহাকালীর বেলাতেই তাঁর শক্তি ও সংগ্রামসূচক তীব্রতেজের যে ধারণা এনে দেওয়া হয়েছে, তাতে যারা তাঁর পূজা করে তাদের পক্ষেও তা বিপজ্জনক হতে পারে। ভারতে থেকে এ সম্বন্ধে আমি নানা গল্প শুনেছি। অসংখ্য প্রতিমূর্তির সংস্পর্শে আমি এসেছি, আর অনেককে জানি যারা বাড়িতে কালীমূর্তি রেখে পূজা করে, তাদের কখনো কখনো বিপদও ঘটেছে। আমি তাদের সতর্ক করে বলেছি, "তোমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য যেন মহাকালীকে দায়ী করোনা, তিনি কিছু করেননি। তোমাদের বাড়ির ঐ কালীমূর্তির মধ্যে অন্য কোন ক্রূর প্রতিহিংসাপূর্ণ সত্তা আশ্রয় করেছে, যার ইচ্ছাশক্তি ও প্রতিশোধবৃত্তি অতি প্রবল ও যা প্রাণধর্মী, তাকেই বিশ্বাস করাতে তোমাদের নামাত্মক ফলভোগ করতে হয়।" এমন লোকের কথা জানি যারা দুর্ভোগ সইতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাদের কালীমূর্তিকে গঙ্গাতে বিসর্জন দিয়েছে। তাতেও যদি তারা মুক্ত হতে পারত তাহলে দুর্ভোগ থাকত না, কিন্তু কেউ কেউ এমন ভয় পেয়ে গেছে যে তার জন্যই তার মন্দ প্রভাব তথাপি কাটাতে পারেনি।

আগে গুহ্যজ্ঞান আয়ত্তে না এনে এ সব জিনিসের সংস্পর্শে না যাওয়াই উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সকল ধর্মেই (কেবল এখানে নয়, সর্বত্র) বিশ্বাসীদের কোনোরূপ জ্ঞানদান করা হয় না। যদি বা পুরোহিতদের কিছু জ্ঞান থাকে (সর্বত্র অবশ্যই নয়) তথাপি তারা ভক্তদের তা শেখায় না, কারণ তাতে নিজেদের প্রভুত্ব চলে যাবে, তাই সকল ধর্মেই এমনি দোষ থেকে গেছে।

কিন্তু আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি, আলোচ্য কথায় ফিরে আসি। আমাদের পার্থিব জগতে নিশ্চয় একজন কালী আছেন যিনি মূল মহাকালীর সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা অংশস্বরূপ হয়ে পার্থিব ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করেন: তিনি মহাকালীর দোসর এবং তাঁর সকল সদ্‌গুণ ও প্রকৃতিসাধুর্য এঁর মধ্যে আছে। তোমরা কেউ কেউ হয়তো মহাকালীর সংস্পর্শ পেয়েছ। তিনি আদৌ হিংস্র নন, অনুগতের কখনো অনিষ্ট করেননা, কিংবা যারা তাঁকে ভক্তি করেনা বা মানেনা তাদের দেশে মহামারী এনে দেননা। তবে তিনি শক্তিপ্রয়োগ পছন্দ করেন, সংগ্রাম পছন্দ করেন, এবং কঠোরভাবেই বিচার করেন।

এবার অন্য প্রশ্ন করো।

প্রশ্ন : অবতার ও বিভূতির মধ্যে কি তফাৎ?

উত্তর : আগেই বলেছি যে "বিভূতিরা" হলো কোনো এক বিশিষ্ট সত্তার গুণগুলির ও অংশগুলির প্রযুক্তি (গুহ্যতত্ত্ব যাকে বলে **emanation**),—একজন কারো উপরে সেই সব শক্তিকে ও গুণকে আরোপ করা হয়, এবং তার দ্বারা সেগুলি অভিব্যক্ত হয়। সে একজন মানুষই। আর অবতার (প্রকৃত অর্থে) হলো মূল সত্যের এই পৃথিবীতে দেহীরূপে আবির্ভাব। তবে এ কথার নানা অর্থ করা হয়। ফরাসীতে "**avatar**" শব্দ আছে, তার অর্থ অন্যরূপ। কোনো দুঃসাহসিক ব্যক্তির নানারূপ "অবতার" বা ভেক থাকে, সে তার চেহারা ও চরিত্র ও কাজ পাল্টাতে থাকে...কিন্তু এখানে (যেমন গীতাতে বলে) ভগবানই কোনো কারণে পৃথিবীতে এসে পার্থিব দেহ ধারণ করেন, তখন তাকেই বলে অবতার। তিনি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেহে আসতে পারেন, কিন্তু তিনি সেই একই "মূল সত্তা"। তিনিই অবতার। আমি ভাবতাম তোমরা জানো এ কথা, শ্রীঅরবিন্দ বহুবার বলেছেন।

প্রশ্ন ("মা" বইখানি থেকে)—"মহাসম্রাজ্ঞী মহেশ্বরী অধিষ্ঠিতা আছেন চিন্তক মনের ও ইচ্ছার উপরকার বিশালতার মধ্যে"...মন ও প্রাণের মতো ইচ্ছার কি স্তর আছে?

উত্তর : এ বিষয়ে আগে বলেছি সচ্চিদানন্দ সম্পর্কে। সকল জগতের মূলে সচ্চিদানন্দ, কিন্তু সর্ব অস্তিত্বের সকল অবস্থার পিছনে আছেন তিনি। এটা ছবিতে এঁকে দেখাতে পারো (যদিও ঠিক জিনিস হবেনা তবু সহজে বোঝার কাজ হবে),—আগে একটা স্কেল দিয়ে স্তরগুলিকে ছকে নাও। তাতে পৃথিবীকে রাখো সবার নীচে আর ভগবানকে রাখো সবার মাথাতে (যদিও তা ঠিক হবেনা, আবার বলছি, শুধু বোঝবার জন্য করবে), তার পর স্তর গুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করো : এ হবে একটা মইএর মতো ধাপ করা ছক। এই মইএর পিছনে থাকবে একটা অবলম্বন যাতে ভর রেখে মইটা দাঁড়াচ্ছে, তা দেয়াল নয় (!), একটা কিছু অবলম্বন। তাই হলো বিশ্বের আদি, ভারতের শাস্ত্রে তাকেই বলে সচ্চিদানন্দ। সমস্ত কিছু এঁকেই আশ্রয় করে আছে, নতুবা কিছুই থাকতনা। সকল অস্তিত্ব এতেই বিধৃত। সুতরাং তুমি যদি কোনো এক বিশেষ স্তরে যাও, যেমন উচ্চ মানসের স্তরে উঠলে (তা সহজেই হতে পারে, দৈহিক থেকে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া), কিন্তু আর উপরে না গিয়ে ঐ ধাপেই নীরব হয়ে রইলে। মইএর ঐ ধাপের পিছনে যদি চোকো তাহলে সটান ওর অবলম্বন সচ্চিদানন্দে গিয়ে পৌঁছবে। সেখানেই তোমার মনে সচ্চিদানন্দের অনুভূতি এসে যাবে। আমি জানি কেউ কেউ এতে মনে করেছে যে বুঝি পরাৎপরের চূড়ান্তে পৌঁছে গেল। কারণ, এই অনুভূতির মধ্যে খুব একটা মিল আছে, তবে এখানে ওটা

মনের অনুভূতি, মনেতেই সীমাবদ্ধ। এখন ইচ্ছার সম্বন্ধেও এইরূপ কথা। ইচ্ছা ঐ দুইএর অবলম্বন নয়, একটা তেজপ্রবাহ, যা ওর উপর থেকে নীচে পর্যন্ত প্রবহমান,—অর্থাৎ ভগবৎ-ইচ্ছা মূল থেকে উঠে স্থূলের স্তর পর্যন্ত নেমে গেছে। সুতরাং তুমি যদি ওর প্রবাহের বা স্পন্দনের সংস্পর্শে আসো তাহলেই "ইচ্ছার স্তরে" গিয়ে পড়বে। অর্থাৎ যে-কোনো অবস্থাতেই থাকো—মন প্রাণ বা দেহের রাজ্যে—তুমি যদি ঐ বিশেষ চেতনাতে যেতে পারো তাহলেই ইচ্ছাশক্তির সংস্পর্শে আসবে; সে তেজ তোমার মধ্যে প্রবেশ করলে তাকে তুমি ইচ্ছামত প্রয়োগ করতে পারবে। যদি তুমি সম্পূর্ণ অহংবর্জিত ও নির্মলচিত্ত ও পূর্ণ সমর্পিত হয়ে থাকো এবং কোনো বিশ্রণ না এনে ভগবান যা দিলেন তাই নেমে নাও, অহং বা কামনার সংকীর্ণতা যদি না থাকে...যদিও তা হওয়া কঠিন, কিন্তু যদি তুমি তা হতে পারো, তাহলে আসল ইচ্ছাশক্তি অবিকৃতরূপে তোমার আয়ত্তে থাকবে (কারণ উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ওর প্রবাহ অবিকৃতই থাকে, যে গ্রহীতা সেই তাকে বিকৃত করে), এবং তখন তা তোমার নিজের ইচ্ছার স্থানে ভগবানেরই ইচ্ছা হবে। অতএব স্থূলদেহে থেকেই তুমি ভগবৎ ইচ্ছাশক্তি পেতে পারো, দেহকে না ছেড়েই। কেবল তাকে বিকৃত কোরোনা বা গ্রহণ করতে গিয়ে বিগুড়ে দিওনা। যখন একটা কিছু কাজে অদম্য উৎসাহ পেয়ে তুমি বলো, "আমি ওটা করবই, শেষ পর্যন্ত আমার ইচ্ছাকে আমি সম্পূর্ণ করব" (তখনও তুমি বলছ "আমার ইচ্ছা"), ঐ ইচ্ছাশক্তির সংস্পর্শ পেলে তা তুমি বলতে পারো। কেবল তোমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার দ্বারা ওকে যখন বিকৃত করে অপপ্রয়োগ করো তখন অন্যান্যের সঙ্গে তার সংঘর্ষ বেধে যায়। কিন্তু প্রকৃত যোগী হয়ে যদি তার সমুচিত প্রয়োগ করো তাহলে কিছুই তার বেগ রোধ করতে পারেনা, স্থূলভাবেও না।

অন্যান্য শক্তি, অন্যান্য জিনিসের বেলাও একই কথা। তা এমন অনেক কিছু আছে। ভালো করে অনুধাবন করলে দেখবে যে তোমার ব্যক্তিসত্তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা মূলে ভগবানের জিনিস ও বিশ্বগত জিনিস হলেও তোমার মধ্যে বিকৃত বিধ্বস্ত ও সংকুচিত হয়ে পড়েনি। সুতরাং কিছুকে "টেনে আনা" বা "ডেকে আনার" ধারণাটা ঠিক নয়। আসল কথা আগে নিজেকে তৈরি করতে হবে, ওর সংস্পর্শলাভের উপযুক্ত করতে হবে, এবং তখন যা পাবে তাকে আর কোনোমতে বিকৃত করবেনা। কেউই এ জিনিস থেকে বাদ পড়েনা। এমন কি একটি ছোট শিশুও তার জীবনের কোনো মুহূর্তে এই সব বিরাট ও বিশ্বগত দিব্যশক্তির সংস্পর্শ পেয়ে তাকে নিজের প্রয়োজনে লাগাতে পারে, তার শিশুমনের প্রয়োজন অনুযায়ী। তবে দুঃখের বিষয়, ওর সঙ্গে সংকীর্ণতা, অহংকার, অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা মিশিয়ে এমন বিকৃত করা হয় যে তখন আর তাকে চেনাই যায়না।

কিন্তু সকল শক্তির মূল সেই একটাই, তাই যখন চেতনার একটি বিশেষ অবস্থায় গিয়ে পৌঁছও তখন বুঝতে পারো যে এই সব শক্তি না থাকলে কোনো কিছুই থাকতনা, তোমার অস্তিত্বই থাকতনা। আর "আমি এটা করছি, আমি ওটা করছিনা, আমি এটা স্থির করেছি, আমি ওটা চাই, আমি সফল হবোই",...এই সকল আত্মপ্রত্যয় তখন একেবারেই থাকেনা, ওরূপ কথা আর ভাবতেই পারোনা ; তখন বোঝো যে ওরূপ কথা বলা কতই হাস্যকর। যেমনি ওর মধ্যে ক্ষুদ্র "আমি" এসে পড়ে অমনি সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় যত কিছু বিকৃতি, সংকীর্ণতা, পতন। শেষ পর্যন্ত যা কিছু তোমার উপলব্ধির মধ্যে আসছেনা তার মধ্যে ঢুকে আছে তোমার "আমি",—ওকে ঘুচিয়ে ফেল, সঙ্গে সঙ্গে সকল বাধাই ঘুচে যাবে।*

* S. A. I. C. E. Bulletin থেকে। অনুবাদক—পতঞ্জলি ভট্টাচার্য

প্রসঙ্গত

[এই সব কথাগুলি মায়ের সঙ্গে হয়েছিল যখন কোনো ভক্ত মায়ের কাছে অনুযোগ করে যে লোকে নানারূপ অযথা প্রশ্ন ক'রে মায়ের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে, তার জন্য মায়ের জরুরী কাজগুলি করবার সময় উত্তরোত্তর কমে আসছে।]

মা এমনিই হয়ে থাকে, এমনি হবারই কথা।

এও হয়তো একটা শিক্ষা (বা ইঙ্গিত), একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে।

কোন শিক্ষা আমাকে পেতে হবে তাই বুঝতে চেষ্টা করছি। আমি ধৈর্য ধরতে শিখছি, ওঃ! সে কী ধৈর্য...কেবলই বিদ্রোহ, বিরাগ, অপমান, সব কিছু নিয়ে। আমার কাছে কিন্তু তা সবই শূন্য, কখনো আবোধজনক। যখন আপন অবস্থাতে থাকি, প্রকৃত অনুকম্পার অবস্থা, তখন কিছুই নড়চড় হয়না, এমন কি সামান্য একটু ঢেউ ওঠা পর্যন্ত নয়, কিছুই না।

এ প্রশ্ন আমাকে করা হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে সাধনাতে অপমানের, যাকে ইংরেজীতে বলে "আত্মমর্যাদা"-বোধ (ফরাসীতে বলে amour propre), তার কোনো স্থান আছে কিনা। অবশ্যই নেই, এ তো জানা কথা। কিন্তু এর ক্রিয়া আমি জানি, স্পষ্টই দেখেছি, কিন্তু অহং যেখানে নেই সেখানে সত্তার মধ্যে তার কোনো বিক্ষোভও নেই। বহুকাল আগে (অনেক বছর আগে) একটা সময়ে এ জিনিস আমি বোধ করতাম, কিন্তু এখন তা যে কেবল বিজাতীয় জিনিস তাই নয়, তা এখন অসম্ভব। সমগ্র সত্তা, এমন কি স্থূলদেহ পর্যন্ত (আশ্চর্যের বিষয়) বোঝেনা যে ও-জিনিসের অর্থ কি। কোনো একটা বাস্তব যা লাগলেও যেমন হয় (বা তাঁর কনুইতে একটি কাটা দাগ দেখালেন), যেমন এটি, আঘাত লেগেছে বলে বোধই হয়নি, তেমন অনুভবই হয়না। অনেক সময়ে সমগ্রভাবে অলক্ষিতেই এই সব ঘটে যায়, তাতে কিছুই ইতরবিশেষ হয়না ; যেখানে কিছু অনুভব করি, তা যেন মৃদুভাবে এইটুকু জানিয়ে দেবার মতো যে এখানে একটু সাহায্য দরকার, শিক্ষা হওয়া দরকার। কিন্তু মনের তরফে যেমন কুঁকড়ে ওঠার ভাব হয়ে থাকে তেমন কিছু নয় ; সত্তাটা যেন শিক্ষা পাবার জন্য তখনই নিজেকে নিবেদন করলে। আমি দেহকোষগুলির কথাই বললাম, আশ্চর্যের কথা বটে। মনের ভাষাতে বলতে গেলে বলতে হয় যে এ হলো সকল ব্যাপারেই ভগবৎ উপস্থিতির চেতনা বা অনুভব পাওয়া, সংস্পর্শলাভের একটা ধারা—যা বর্তমান অবস্থায় এসেছে।

হাঁ, এই রকমই হয় দেহটার অনুভূতি।

লোকেদের বেলাতে কোনো আঘাত বা শক্ পেলে তখন একমাত্র অহং-এরই স্পষ্ট অনুভূতি হয়—সেখানে অহংই নিজেকে প্রকাশ করে। তারা বলে, "ঐ অমুক করেছে"। আমি তা বলব না, "ঐ ও রেগেছে, কিংবা ঐ অমুক"... তা নয়, যে অমন বলে সে তার অহং। তারও নয়, সে হলো অহংএর মূল জিনিসটাই, যা তখনও আছে। কিন্তু আমার কাছে অহং একটা নির্ব্যক্তিক জিনিস, যদিও আর সকলের কাছে তার আপন তীব্র ব্যক্তিত্ব। এ এক রকমের অস্তিত্ববোধ (পার্থিব বা মানবীয়) যা কমবেশি পরিমাণে সর্বত্রই থাকে ও ব্যক্তিত্বের মোহ আনে। কৌতূহলের জিনিস বৈকি।

প্রশ্ন: হাঁ, কিন্তু মুশকিল এই যে অন্যরা এটাতে শিক্ষা পেয়ে বোঝেনা, তারা তখন...

উত্তর: ওঃ, তারা যদি সেই শিক্ষা পেতো তাহলে তখনই তো সব পাল্টে যেতো।

প্রশ্ন: কিন্তু ওর ফলে যে আপনাকে আক্রমণ ক'রে ঘিরে ধরেছে।

উত্তর সেটা পারে না।

প্রশ্ন: আপনার সময়টা সময় নষ্ট করছে, আপনার...

উত্তর: না, আমাকে ঘিরে ধরতে পারেনা। (হেসে) আমি যে অনেকখানি বড়ো।

প্রশ্ন: কিন্তু বস্তুত আপনাকে উত্যক্ত করে তোলে।

উত্তর: আমি দেখেছি যে ওতে বাধা দিলে আরো খারাপ হয়। আমি যদি নিজে তরল হয়ে থাকি তাহলে ধাক্কাটা আর লাগেনা। (কনুই দেখিয়ে) ঠিক এটার মতো। শক্ত হয়ে বাধা দিতে গেলেই তখন লেগে যাবে। যেমন, যারা পড়ে যেতে জানে তাদের বেলাতে হয়; পড়ে গেলেও তাদের হাড়গোড় কিছু ভাঙেনা; কিন্তু যারা তা জানে না তাদের সামান্য পতনেই একটা কিছু ভাঙে। একই জিনস, কিন্তু শিখতে হয় যে কেমন ক'রে...সম্পূর্ণ ঐক্যভাবে আসে। যদি শুধরে দিয়ে সোজা করতে যাও, তাতেও বাধাদান করা হয়। তাহলে এমনি

আক্রমণ চলতে থাকলে কি হবে? কৌতূহলের কথা, ভেবে দেখা যাক। (না হাসলেন) তাদের তো এই অবস্থা হয়নি, তারাই হবে বিরক্ত, কিন্তু আমি তার কি করব। (না হাসলেন)

সর্বদা হাসাই উচিত, সর্বক্ষণ। প্রভু এমনি ক'রে হাসেন, কত সুন্দর সে হাসি, আর কত প্রেমে ভরা। সে হাসি অপূর্ব মাধুর্য দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরে।

এটিকেও মানুষ বিকৃত করেছে, সব জিনিসকেই বিকৃত করেছে (হাসলেন)।*

১১ জানুয়ারী, ১৯৬৭

শ্রীমা

* BULLETIN OF S. A. I. C. E.-থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

পথের কথা

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

শ্রীঅরবিন্দের নিম্নলিখিত অপ্রকাশিত চিঠিখানি পড়ে—

"যদিও সেন্ট পলের অপূর্ব অলৌকিক অনুভূতি ঘটেছিল এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানও নিশ্চয় গভীর ছিল (ব্যাপক বলার চেয়ে গভীরই বলব)—তথাপি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারিনা যে তিনি এখানে অতিমানসপ্রাপ্ত দেহের (জড়দেহের) কথাই বলছেন। হয়তো ঐরূপ বা অন্য কোনোরূপ দীপ্তিপ্রাপ্ত দেহের সম্বন্ধে বলছেন তার আপন অবস্থান ও বাস্তবতা নিয়ে, যা কখনো কখনো বস্তুময় নরদেহের খোলস ছাড়িয়ে তাঁকে আচ্ছাদন করত। অন্যান্য শ্লোকের মতো তাঁর এই শ্লোকটিরও নানারূপ অর্থ হতে পারে, এবং তাঁর অতিভৌতিক অনুভূতির কথাও হতে পারে। দেহ রূপান্তরের কথা অন্যান্য বিভিন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু এই জড়বস্তুর পরিবর্তনের কথাই তাতে বলেছে কিনা তা জানিনা। কিছুকাল পূর্বে এ অঞ্চলে একজন যোগী এরূপ প্রচার করতেন, কিন্তু তিনি বলতেন যে সেই পরিবর্তন সম্পূর্ণ হলে দেহ তখন আলোকের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। বৈষ্ণবেরা বলেন একরূপ দিব্যদেহের কথা, যা পূর্ণসিদ্ধি হলে এই দেহের স্থান নেবে। কিন্তু সে দেহ হবে, ভৌতিক না অতিভৌতিক? অথচ এরূপ মনে করতেও বাধা নেই যে এই সকল ধারণা, বোধি, অনুভূতি প্রভৃতি ঠিক দৈহিক রূপান্তর না বোঝালেও সেই দিকেই ইঙ্গিত করে।" তারিখ ২৪-১২-১৯৩০

না আশ্চর্যের কথা, ইদানিং আমার ধ্যানের মধ্যে এই প্রসঙ্গই এসেছিল (ইচ্ছা-কৃত ভাবে নয়, উপর থেকে আসা)। কারণ ভেবে দেখলে উদ্ভিদ হতে পশুতে ও পশু হতে মানুষে (বিশেষত পশু হতে মানুষে) অতিক্রমণে আকৃতিগত পার্থক্যের দিকটা সব চেয়ে কম; আসল রূপান্তর ঘটেছে এক থেকে অন্যরূপ চেতনারই অভ্যুদয়ে। পশুর ও মানুষের জীবনের মধ্যে যে পার্থক্য তা ঘটেছে মনের আবির্ভাবে; নতুবা বাস্তব উপাদান মূলতঃ সবারই আছে এবং তা গঠন ও বৃদ্ধির ব্যাপারে একই নিয়ম অনুসরণ করে। যেমন, গাভীর গর্ভে বাছুরের গঠন ও মানবীর গর্ভে সন্তানের গঠনের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। প্রভেদ কেবল মন গড়ে ওঠার দিক দিয়ে। কিন্তু স্থূলদেহকে যদি দেখি, যেমন চর্মচক্ষে দেখা যায়, তাহলে দুইএর ধরণ একই রকম; যথা, এমন কোনো দেহের কল্পনাই করা যায়না যার মধ্যে রক্ত সংবহনের ও হাড়ের কোনো প্রয়োজন নেই (বিশেষত মেরুদণ্ডের ও রক্তবাহিকার)। যতকাল এই জিনিস থাকবে ততকাল হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াতে রক্ত-বহার

কাজ চলতে থাকবে...খাদ্যকে বাদ দিয়েও অন্য উপায়ে আত্মিক শক্তির দ্বারা প্রাণ শক্তিকে নিত্য নূতন জোগান দেওয়ার কথা ধারণা করা যায়, কিন্তু হাড় না থাকলে দেহ শক্ত হয়ে খাড়া থাকবে কেমন ক'রে?...এমন রূপান্তর আসা চাই যার পরিবর্তন পশু থেকে মানুষের রূপান্তরের চেয়ে অনেক বেশি; মানুষ থেকে যে নতুন সত্তা দেখা দেবে তার সংগঠনও এমন হবেনা, তার অস্তিত্বও এমন ভাবে ক্রিয়া করবে না, সে "এমন কিছুর" ঘনীভূত ও সুসম্বদ্ধ জিনিস হবে যে সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিনা, এ পর্যন্ত যা দেখেছি তার কোনটার মতোই নয়, তবে বিজ্ঞানীরা যদি কিছু দেখে থাকে তা বলতে পারিনা।

প্রশ্ন : হয়তো কোনো নতুন আলো বা শক্তি দেহকোষগুলিতে এক ধরণের স্বতঃস্ফূর্ত জীবন ও স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি এনে দেবে?

উত্তর : হাঁ, তাই বলছিলাম যে খাদ্য বাদ হয়ে যাবে, এটা ধারণা করা যায়।

প্রশ্ন : সমগ্র দেহটাই সেই শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে। সে দেহ খুবই নমনীয় হতে পারে, হাড়ের কাঠামো থাকলেও তা শিশুদের মতোই নমনীয় থাকবে।

উত্তর : কিন্তু যখন নমনীয় থাকে বলেই যে শিশুরা দাঁড়াতে চলতে পারেনা। স্বচ্ছন্দে কিছু করতে পারে না। শক্ত হাড়ের কাঠামোর বদলে কি থাকবে?

প্রশ্ন : এই সব উপাদানই থাকবে নমনীয় হয়ে—তার দৃঢ়তা দেহকাঠিন্যের উপর নির্ভর না করে নির্ভর করবে নতুন আলোর শক্তির উপর—তা হয়না কি?

উত্তর : হাঁ, সেটা সম্ভব...কিন্তু আমি বলতে চাইছিলাম যে সে কাজ হবে হয়তো অনেকগুলি নতুন নতুন রকম প্রাণীর আবির্ভাবের উপর দিয়ে। যেমন, মানুষ থেকে সেই জিনিসে পৌঁছতে হয়তো নানারকম মধ্যবর্তী অবস্থা অতিক্রম করতে হবে! কতটা লাফ দিয়ে উঠে যাওয়া যে খুব একটা বড়ো ব্যাপার তা বুঝতেই পারো।

এটুকু ধারণা করা যায় যে কেউ একজন তার আভ্যন্তরীণ শক্তিতে ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে নিজেকে নতুন করে নেবার মতো তেজ সংগ্রহ ক'রে চিরতরুণ হয়ে থাকতে পারে; এমন কি দেহকে যথেষ্ট নমনীয় করে দরকার হলে তার চেহারাও বদলাতে পারে; কিন্তু হঠাৎ একেবারে এই দেহগঠনের পদ্ধতিকেই সম্পূর্ণ রদ ক'রে দিয়ে—এক প্রকার থেকে অন্য প্রকারে এনে ফেলা, এর জন্য...বোধ হয় পর পর কতকগুলি ধাপের দরকার।

যদি তেমন কিছু ওলট্-পালট্ না ঘটে (যাকে আমরা "নিয়েকৃদ্" বা অঘটন বলতে বাধ্য হই, কারণ কেমন ক'রে হলো তা বুঝিনা), তাহলে কেমন ক'রে আমাদের মতো দেহ

কোনো উচ্চশক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ অন্যভাবে গড়া হবে, যার কোনো শক্ত অবলম্বন থাকবে না? এই জিনিস (মা নিজের দেহের চামড়া ধরে দেখালেন) এ জিনিস সেই জিনিসে বদলে যাবে?....তা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

প্রশ্ন : আমার তা খুব অসম্ভব বলে মনে হয়না।

উত্তর : তোমার অসম্ভব মনে হয় না?

প্রশ্ন : না, হয়তো কল্পনার কথা, কিন্তু এমন হতে পারে যে কোনো অধ্যাত্ম শক্তি দেহে প্রবেশ ক'রে তাকে দীপ্তি দিয়ে ফাঁপিয়ে তুললে, আর সমস্তটা তখন ফুলের মতো ফুটে উঠল, আত্মমুদিত দেহ যেন বিস্তার পেয়ে নমনীয় ও জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল।

উত্তর : নমনীয়, কমনীয়, হাঁ ধারণা করা যায় যে এমন স্থায়ী কাঠিন্য তার থাকবে না এটা ধারণাতে আসে, কিন্তু...

প্রশ্ন : কিন্তু আমি তো স্পষ্ট দেখছি একরকম জ্যোতির্ময় হয়ে ফুট ওঠা সম্ভব ; সেই অধ্যাত্ম আলোর তেমন শক্তি থাকবে। অথচ তাতে বর্তমান গঠন বদলাবে না।

উত্তর : সেটা দেখা যাবে বলছ? ছুঁতে পারা যাবে?

প্রশ্ন : হাঁ, তা কেবল একটা উদ্ঘাটন হওয়া। মুদিত জিনিস উদ্ঘাটিত হবে, এই পর্যন্ত। ফুলের যে গঠন তাই রইল, কেবল কুঁড়ি ফুটে জ্যোতির্ময় হলো ; তা হতে পারে না?

উত্তর : (মা মাথা নেড়ে কিছুক্ষণ নীরব থেকে) আমার সেরূপ অনুভূতি নেই, বলতে পারিনা। এটা নিশ্চয় জানি (কারণ নিজের অভিজ্ঞতায় তার প্রমাণ পেয়েছি) যে এই দেহের জীবন—যে জীবন একে ক্রমশ এগোচ্ছে ও বদলাচ্ছে—তার স্থান কোনো এক শক্তিতে দখল করতে পারে ; অর্থাৎ তাতে একরূপ অবলম্ব এনে ক্ষয়ক্ষতি হওয়া ঘুচিয়ে দিতে পারে। এ দুটি হওয়া সম্ভব—প্রাণশক্তি আসা আর ক্ষয়ক্ষতির নিবারণ। এবং তা আসতে পারে স্বাভাবিক উপায়ে ভগবৎ প্রেরণার সম্পূর্ণ আনুগত্যের দ্বারা, যাতে প্রতি মুহূর্তেই সে শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং প্রয়োজনীয় যা কিছু তার দ্বারা করা যায়—এ সবই হয়, সবই হয়, তাতে সন্দেহ নেই ; এটা শুধু প্রত্যাশা নয়, কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য। অবশ্য তার শিক্ষা নিতে হয় ও ধরে ধীরে ক্রমশ বদলাতে হয়, নিজের অভ্যাসগুলো বদলাতে হয়। তা সমস্তই সম্ভব। কিন্তু কতকাল লাগবে এই কাঠামো থাকার

প্রয়োজন বদলাতে (একটিমাত্র সমস্যা ধরেই বলছি)? সেটা মনে হয় খুব সুদূরের কথা। তার জন্য বহু মধ্যবর্তী অবস্থা পার হতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে জীবনকে অনেককাল পর্যন্ত প্রলম্বিত করা যায়। সে কথা ঠিকই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা এমন উপাদানে গঠিত নই যা অবিনশ্বর, যার বিলুপ্তি নেই। আমাদের হাড়গুলি খুবই টেকসই, অনুকূল অবস্থাতে হাজার বছরও টিঁকতে পারে, বুঝলাম, কিন্তু তাতেই অমরত্ব হয় না। কি বলছি বুঝলে?

প্রশ্ন : না, আপনি বলছেন যে তা অতৌতিক জিনিস কিছু হবে?

উত্তর : অতৌতিক কিনা তা জানিনা, কিন্তু তৌতিকের কথাই বলছি যার সম্বন্ধে আমি কিছু জানিনা। তবে এখন যা আছে তা নয়, বিশেষত এখন যে গঠন জানি তা নয়।

প্রশ্ন : বলতে পারি না, কিন্তু সে এমন তৌতিক দেহই হবে (যেমন শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন) আমার মনে হয় (হতে পারে এটা দিবাস্বপ্ন) যেমন এই বর্তমান দেহ একটা পদ্মকুঁড়ির মতো, এখন ক্ষুদ্র, মুদিত, কঠিন, কিন্তু যখন খুলে যাবে তখন অন্যরকমভাবে ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

উত্তর : ভালো কথা, কিন্তু ছেনে, ওটি হলো...

প্রশ্ন দিব্যজ্যোতি কী না করতে পারে এই উপাদানগুলি নিয়ে? একই জিনিস, একই উপাদান রয়ে গেল, কেবল তা ফুলেতে রূপান্তরিত হলো।

উত্তর : কিন্তু কোনো উদ্ভিদ জিনিস তো অমর হয় না।

প্রশ্ন : না, ওটা বলছিলাম কেবল উপমা হিসাবে।

উত্তর : ঠিক কথা। এখানে প্রশ্নটা কেবল এই। নিত্য পরিবর্তন আমি কল্পনা করতে পারি : যে ফুল কখনো শুকোবে না তাও কল্পনা করতে পারি : কিন্তু এই অমরত্বের মূল মর্মটা...অর্থাৎ এমন জীবন যার নতুন ক'রে আর গড়বার দরকার নেই, এমন চিরন্তন শক্তি যা চিরন্তন ভাবেই অভিব্যক্ত হতে থাকল, অথচ তা হবে এই এমনি তৌতিক দেহ (মা নিজের গায়ে হাত দিয়ে দেখালেন)।

এটা বুঝতে পারি যে এমন ক্রমিক পরিবর্তন আসতে থাকবে যাতে এই জিনিস ভিতর থেকে বাহির দিকে নিত্যই নবীন হবে, এবং তাই হবে অবরত্ব ; কিন্তু আমার কেবল এই মনে হয়, এখনকার জীবনের অবস্থা ও তখনকার জীবনের অবস্থার মাঝখানে অনেকগুলো ক্রমিক ধাপ পার হতে হবে। বর্তমানের এই দেহকোষগুলিতে যে চেতনা ও অনুভূতি মিলেছে, এদের যদি প্রশ্ন করো, "এমন কোন কাজ আছে যা করতে তুমি অক্ষম?" তারা তখন আন্তরিক ভাবেই বলবে, "কিছু নেই, প্রভু যা ইচ্ছা করেন তা অবশ্যই করতে পারি।" এই হলো এদের চেতনার অবস্থা। যদিও বাইরের চেহারাটা অন্যরকম। আর ব্যক্তিগত অনুভূতি হলো এই : প্রভুর উপস্থিতিতে আমি যা কিছুই করি, তা করতে পারি বিনা আয়াসে, বিনা কষ্টে, বিনা ক্লান্তিতে, বিনা অপচয়ে, এমনি সহজভাবে (না হাত ঘুরিয়ে একটা সহজতির ইঙ্গিত করলেন), কেবল বাইরের প্রভাব থেকে এখনও বিমুক্ত না হওয়াতে দেহ এমন কাজ করতে বাধ্য হয় যা উপরের প্রেরণার জিনিস নয় ; তাতেই আসে ক্লান্তি আসে সংঘর্ষ...সুতরাং এ যে কোনো অতিমানসের দেহ যা পৃথিবী ছাড়া অন্য জগতে নিরালম্ব অবস্থায় রয়েছে, তা নয়।

প্রশ্ন : না, তা তো নয়।

উত্তর : এমন জিনিস দরকার যার সংক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি থাকে। মানুষ আসুর সংক্রমণের প্রতিরোধ করতে পারেনা ; নিত্য সংস্পর্শে থেকে তা সে পারেনা। তাহলে এরূপ অবস্থায় সে কেমন ক'রে তা করবে? মনে হয়, বহুকাল যাবৎ, বহু বহুকাল পর্যন্ত তাকে এই সংক্রমণের নিয়মের অধীন হয়ে থাকতে হবে।

প্রশ্ন : জানিনা, কিন্তু আমার মনে হয় অন্যরূপ হওয়া অসম্ভব নয়।

উত্তর : নয় অসম্ভব?

প্রশ্ন বোধ করি দিব্যজ্যোতির যখন এত শক্তি আছে, তখন কিসে তাকে ছুঁতে পারে?

উত্তর : কিন্তু সারাজগৎ যে তাতে লোপ পেয়ে যাবে। তাই হবে নাকি?

সে জিনিস যখন আসবে, প্রভু যখন আসবেন, তখন তাতে ভয় পাবেনা এমন একজনও থাকবে না, হাজারের মধ্যে। বুদ্ধিতে নয়, চিন্তাতে নয়, তার ক্রিয়া হবে বস্তুতে। আর তাই যদি হয়, একটি কোনো সত্তা আসে পরমাশক্তির ঐ জ্যোতির ঘনীভূত প্রতিরূপ হয়ে,—কি হবে তাহলে?

প্রশ্ন : হাঁ, সেটাই আসল সমস্যা।

উত্তর : হাঁ, ঠিক তাই।

প্রশ্ন : তবে প্রকৃত রূপান্তরের পক্ষে আমি কোনো বাধা দেখছি না। কেবল এই কথা যে জগতের তাতে বিপত্তি ঘটবে।

উত্তর : সমস্তই যদি এককালে রূপান্তরিত হতে পারত, তাহলে সবই ঠিক হয়ে যেতো কিন্তু তেমন তো দেখায় না। যদি কেবল একজন মাত্রই রূপান্তর পায়...

প্রশ্ন : তা হয়তো সহ্য হবেনা।

উত্তর : হাঁ। আমার তাই বোধ হয় (অনুভবে) যে কতকগুলি মধ্যবর্তী অবস্থা আসবে।

যখন দেখছ যে মানুষকে তার অস্তিত্বের জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে, তখন সেই সকল সত্তা উপস্থিত হলে তাদের যারা চিনবে ও বুঝবে, তারা তাদের সহায়তাই করবে, ভক্তির ও আনুগত্যের ও সেবার অংশ গ্রহণ করবে, যেমন পশুরা করছে মানুষের সম্পর্কে। কিন্তু যারা তাদের পছন্দ করবে না...তারা দারুণ বিপজ্জনক হবে। আমি একবার অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছি ঐ সকল সত্তাদের কি কঠিন অবস্থা দাঁড়াবে, তাই বলেছিলাম (১৯৫৬ সালের আগের কথা, তখন অতিমানস শক্তির অবতরণ হয়নি), "অতিমানস আসবে প্রথমে শক্তি রূপে, কারণ সকলের নিরাপত্তার জন্য তা অনিবার্য।" তারপরে শক্তিই প্রথম নামলো—শক্তি এবং আলো। সে আলো দেয় জ্ঞান ও শক্তি।

এটা আমি উত্তরোত্তর বোধ করছি যে কিছু মধ্যবর্তী যুগ আসা দরকার। ...স্পষ্ট দেখছি যে কিছু একটা ঘটছে, কিন্তু সে এমন কিছু নয় যা পূর্বে দেখা বা জানা হয়েছিল, এবং তা চূড়ান্ত রকমের কিছু ; তা নয় মধ্যবর্তী অবস্থাই আসছে, চূড়ান্ত কিছু নয়।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে প্রথমে স্বেচ্ছায় দীর্ঘজীবন লাভের শক্তি আসবে (এটা তার চেয়েও সূক্ষ্মতর ও আশ্চর্য),—এ একটা চেতনার অবস্থা যা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে ; পরম প্রভুর সঙ্গে নিত্যকার একটা স্থায়ী সংযোগ ও সম্পর্ক ঘটাতে ক্ষয়ক্ষতির ভাব ঘুচে গিয়ে আসবে এক অসাধারণ সাবলীল নমনীয়তা। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত অমরত্ব আসা সম্ভব নয়—অন্তত এখন নয়। গঠনটা অন্যরকম হওয়া চাই, তবেই এ অবস্থা বদলাবে, তার অনেক দেরী। আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি অগ্রগতি

হতে পারে, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হলেও অনেক সময় নেবে (আমাদের সময়ের ধারণা হিসাবে)। আর এটাও জেনো যে সময়ের ধারণাও বদলাতে হবে, যদি সে অবস্থাতে যেতে চাও যেখানে সময়ের এমন বাস্তবতা নেই। এটি এক বিশেষ কথা, বর্তমানের সংখ্যাগণনাও থাকবে না। এমন কি আগের থেকে ভেবে নেবার এই যে অভ্যাস, কি হবে তাই আগের থেকে আঁচ করা, যা অস্তিত্বের পুরোনো ধারাকে আঁকড়ে থাকে, এটিকেও ছাড়তে হবে।

অনেক কিছু, অনেক কিছু অভ্যাস বদলাতে হবে।

পূর্ণ উপলব্ধি আসবে কেবল যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিব্যত্ব আসবে। আহা, তুমি স্বতঃস্ফূর্তই দিব্য হয়ে উঠলে, অথচ কি যে হলো সেদিকে ফিরেও দেখলে না, সেদিকে চেয়ে দেখার অবস্থাও পার হয়ে গেলে। *

শ্রীমা

---

* Bulletin of S.A.I.C.E থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

বিলাতের ডায়েরীর কয়েক পাতা

(ব্যক্তিগত বিবরণী)

এ. বি. পুরাণী

(পুনরাবৃত্তি)

অক্সফোর্ড আলোচনাচক্র সেপ্টেম্বর, ১৫—২৫, ১৯৫৫

সাধারণ জীবনের কার্যকারণ সম্বন্ধে ২০ তারিখের সেই আলোচনা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য হতে পারত, যদি মিষ্টার হার্ট মানব মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ ক'রে আমাদের বোঝাতেন যে মানুষ কেমন করে তার সিদ্ধান্ত করে, ও কেমন করে তার আচরণ সংঘটিত হয়। কার্যের কারণ নির্ণয় সম্বন্ধে বা আচরণের নানা অপ্রকাশিত সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবধারণ করতে গেলেই প্রত্যেকটি সত্তার ভিতরকার গভীরতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্ন এই হয় : মানুষ কেমনভাবে তার নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসে? সে কি তা বাধ্য হয়ে করে অথবা স্বাধীনভাবে করে? এটা প্রায় নিশ্চয় কথা যে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে কোনো সমস্যা দেখা দিলে, তার সিদ্ধান্তে আসার পূর্বে অনেকগুলি সম্ভাবনা এসে দেখা দেয় যার ভিতর থেকে একটিকে তার বেছে নিতে হয়, সেখানে জানবার কথা এই যে অতগুলি সম্ভাবনা থাকতে সেটিকে সে বেছে নিচ্ছে কোন কারণে; আবার অনেকে সেই কাজ ক'রে ফেলার পরে বলে, "এমন না ক'রে অমন করলে ভাল হতো", আবার কেউ কেউ অন্যের কাজটা সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলে, এটা না করে যদি অমুক রকম করত তাহলে ও জিতে যেতো।

এর কারণ বোধহয় এই যে একজন মানুষের মধ্যে থাকে অনেকগুলি ব্যক্তিসত্তা। অর্থাৎ একটিমাত্র "আমি" সেখানে নেই, যেমন ষ্টিফেন স্পেণ্ডার তাঁর এক কবিতায় বলেছেন, "এক আমি যাই, আর এক আমি ঘুমোই, আর সকল আমি ঘিরে থাকে এক আসল আমিকে।" মানুষ যখন কিছু সিদ্ধান্ত করে তখন সে তার আসল "আমি"টা নয়। বেশির ভাগই আসে তার কামনাসত্তা থেকে, আবেগসত্তা থেকে, আকাঙ্ক্ষাসত্তা থেকে ইত্যাদি, এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো নির্ভর করে তার আত্মচেতনা বৃদ্ধির অবস্থার উপর, যাতে সে তার সত্তার বিভিন্ন অংশকে দেখতে বা জানতে পারে,—এবং যদি সে তাদের পছন্দ অপছন্দের কথাও বুঝতে সক্ষম হয়, তাহলে সে তার আপন ইচ্ছাকে বা নির্বাচনকে আসল "আমি"র দ্বারা কার্যকরী করতে পারে। "হেতু" বা কারণ কথাটির অর্থ আরো গভীরতর ভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত ছিল। বস্তুত হেতু কোনো এক নির্দিষ্ট ঘটনা বা অবস্থান্তর নয়। এমন কি

খুব সাধারণ প্রক্রিয়ারও হেতু অত সোজা জিনিস প্রায়ই হয়না। তার আগেকার অনেক অবস্থার জটিলতা থেকে হেতু জন্মায়, এবং তার ফল যা হয় তাও একরূপ অবস্থান্তরের জটিলতা মাত্র। যখন আমরা বলি যে খরা হওয়াতে বা গভর্ণমেন্টের খাদ্যসঞ্চয়ের ঘাটতি হওয়াতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, তখন তার প্রকৃত অর্থ এই হয় যে কতকগুলি ঘটনা-পরম্পরার কারণে কতকগুলি পরিণাম হতে দেখা গেছে। মামুলীভাবে আমরা দেখি যে একটা কারণের থেকে একটা ফল হলো, কিন্তু খুব সোজা ফলও ওরূপ একটিমাত্র কারণে প্রায় হয়না ; তার মধ্যে অনেকগুলো ক্রিয়া থাকে যদিও আমরা তা দেখতে পাইনা, অথবা একটিকেই দেখি সক্রিয় হতে।

দুটি প্রবন্ধ শুনলাম যা সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক—একটি "বিশ্বাস ও অর্ধবিশ্বাস" প্রসঙ্গে ডক্টর প্রাইসের, এবং আর একটি "দার্শনিক বিচার" প্রসঙ্গে ডক্টর উইস্‌ড্যানের। এই দুটি শুনে মনে হলো যে অক্সফোর্ডেও এমন ব্যক্তিরা আছেন যাঁরা বোঝেন যে দর্শনের কাজ কি। ডক্টর প্রাইস বুঝিয়ে বললেন যে অর্ধবিশ্বাসও হেয় নয় বা তা দুর্বলতার লক্ষণ নয়। অর্ধবিশ্বাস মানে মৃদু বিশ্বাস অথবা বিশ্বাসের প্রবণতা হতে পারে, এবং বিশ্বাস ও অর্ধবিশ্বাস মানুষের জীবনে পাল্টাপাল্টি করে আসতে পারে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অবস্থার দ্বারা, তা দুর্বলতা বা অনিশ্চয়তাহেতু নয়। তা আসতে পারে প্রামাণ্য সম্বন্ধে অস্পষ্টতা থাকায় কিংবা বিরুদ্ধমতের জবাব দিতে না পারায়। তা হতে পারে খণ্ডিত ব্যক্তিত্বে বা খণ্ডিত ভক্তিতে। অর্ধবিশ্বাসকে বলা যেতে পারে এমন ক্রমবর্ধমান অবস্থা যা অতঃপর পূর্ণবিশ্বাসে অথবা পূর্ণঅবিশ্বাসে পরিণত হবে।

অক্সফোর্ড দার্শনিকদের নীরস তর্ক-কচকচি ও দার্শনিক ব্যাকরণ ও ভাষাকাঠিন্য সকলে প্রথমে সাগ্রহে সহ্য করে গেল। কিন্তু চার পাঁচ দিন পরে নিতান্ত বাড়াবাড়ি ঠেকতে লাগল। প্রত্যহ চার পাঁচ ঘন্টা ধরে সেই নীরস ও শুষ্কতার তর্কবিন্যাস সহ্য দুরূহ হলো এবং আমার পক্ষে তা তিক্ত হয়ে উঠল। তেরো দিনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সংযোগ হতে পারে। এঁদের মধ্যে দুজন, ডক্টর জুনিয়াস ক্রাফ্‌ট ও ডক্টর নাসিয়ার পিয়ানো বাজাতেন প্রত্যহ সন্ধ্যায় ৭॥টার সময়, ব্রিটিশ কাউন্সিলের অফিসে, আমিও যেতাম সেখানে। ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের বই থেকে তাঁরা পাতা খুলে বাজাতেন, আমি দেখলাম যে সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁদের যথেষ্ট উৎসাহ ও দক্ষতা আছে, আর দেখলাম যে দর্শন অপেক্ষা সঙ্গীতেই তাঁরা অধিক আগ্রহী। ডক্টর ক্রাফ্‌ট দার্শনিক তর্কে যোগ দিতেন সক্রেটিস প্রণালীতে, সূক্ষ্মভাবের অনাসক্তি সহকারে,—সক্রেটিসের তিনি খুব ভক্ত। কিন্তু যখন তিনি পিয়ানোতে বসে আঙুল চালাতেন তখন তিনি অন্য মানুষ—তাঁর সমগ্র সত্তা সুরের মাধুর্যের সঙ্গে স্পন্দিত হতে থাকত।

পিয়ানো বাজাবার সময় এঁর ও ডক্টর মার্সিয়ারের যে আত্মবিস্মৃতি লক্ষিত হতো তা দার্শনিক তর্কের সময় হতে দেখিনি।

আমি তাঁদের বললাম, "আপনারা ভুল পেশা নিয়েছেন। সঙ্গীত বাজানো কখনো ছাড়বেন না আপনাদের আত্মার ক্ষুধা সঙ্গীতই মেটাতে পারে।"

আমাদের মধ্যে অনেক কথা হয় এই সব আর্ট সম্বন্ধে, চারুশিল্প প্রকৃত সুন্দরকে প্রকাশ করে, আর সৌন্দর্য হলো ভগবানেরই একটা দিকের অভিব্যক্তি। আমি বললাম, "সত্য যে কেবল যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞানেতেই সীমাবদ্ধ তা নয়, এবং তাইই সত্যের সর্বোচ্চ রূপ নয়। শিল্পসৌন্দর্যও সত্যের একটা বিশেষ দিক, হয়তো জ্ঞানবুদ্ধিতে যতটা ব্যক্ত করতে পারে তার চেয়েও বেশি।"

ডক্টর ক্রাফ্‌টের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয় ব্রিটিশ মিউজিয়মে। পরে তাঁর উপস্থিত দেশ আমেরিকাতে ১৯৬২ সালে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়ে পত্র দিলাম, কিন্তু জবাব পেলাম না। দুমাস পরে শ্রীমতী ক্রাফ্‌টএর কাছ থেকে সে চিঠি ফিরে এলো, তিনি জানালেন যে ১৯৬১ ডিসেম্বরে ট্রেনে যেতে যেতে হার্টফেল করে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শ্রীমতী ক্রাফ্‌টের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমি অক্সফোর্ড সংক্রান্ত অনেক গল্প বললাম।

ডক্টর মার্সিয়ারের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হয় তাঁর নিজের বাড়িতে বার্গে, ১৯৬২ নভেম্বরে, সেখানে ভাষণাদির জন্য তিনি এক ছোটো সভার আয়োজন করেন।

কে, ডি, ডি, হেওয়ারসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

আমি প্রত্যাশা করেছিলাম যে অক্সফোর্ডে আমি প্রাচ্য দর্শন ও ধর্মের কিছু জীবন্ত প্রভাব দেখতে পাবো, আর আমি জানতাম যে এর অনুশীলনের জন্য নিটার স্পল্‌ডিং অক্সফোর্ডে কিছু বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল যে পাশ্চাত্য ছাত্রেরা ইংলণ্ড থেকে প্রাচ্য দর্শন ও ধর্মের কিছু জিনিস শিখতে পারবে, যেমন ভারতীয় ছাত্রেরা ভারতে থেকে ওদের দর্শন শেখে। এতে দুই দেশের মধ্যে গভীরতর সংস্কৃতির আদানপ্রদান হতে পারে। এর জন্য ডক্টর রাধাকৃষ্ণণকে প্রথম অধ্যাপক করা হয়েছিল। কিন্তু আমি অক্সফোর্ডে এ বিষয়ে ছাত্রদের বিশেষ আগ্রহী দেখলাম না, ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের প্রভাব তাদের মধ্যে বিশেষ কিছু করতে পারেনি।

তারপরে জানতে পারলাম যে স্পল্‌ডিং বৃত্তির পূর্ব উদ্দেশ্য বদ্‌লে তাকে এক ইউনিয়নে প্রয়োগ করা হচ্ছে "প্রধান ধর্মগুলির অনুশীলনের জন্য।"

সেই ইউনিয়নের সেক্রেটারি মিষ্টার কে. ডি, ডি. হেওয়ুডসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, তিনি একজন একাগ্রব্রতী ও কর্মী। ইউনিয়নের লাইব্রেরির জন্য তিনি শ্রীঅরবিন্দের অনেক বইএর অর্ডার দিলেন। তাঁকে তাঁর কাজের জন্য নানা দেশবিদেশ এবং ভারতেও যেতে হয়। আমি তাঁকে পণ্ডিচেরিতে যাবার আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি এখানে আসতে চেষ্টা করেছিলেন, অবশেষে ১৯৬৪ সালে একদিনের জন্য এসছিলেন।

লণ্ডন সেন্ট পল্‌স্ স্কুলে তীর্থযাত্রা : সেপ্টেম্বর ২৬, ১৯৫৫

ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে টেলিফোনযোগে অনেক বিলম্বিত ব্যবস্থার পর সেন্ট পল্‌স্ স্কুলের হাই-মাষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট হলো ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ বিকাল ২।।টার সময়।

৩১ কুইনস্ গেট টেরেসে গিয়ে ১।।টার সময় লাঞ্চ খেয়ে ২টার সময় একটি বাসে উঠলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখলাম যে সেই বাসটি আমার গন্তব্যের বিপরীত দিকে চলেছে। তাই নেমে পড়ে সময়রক্ষার জন্য ট্যাক্সি নিলাম।

স্কুলের কাছাকাছি গিয়ে দেখি সেখানে পথে অনেক মেয়ে পুরুষ চলেছে। তাই দেখে আমার মনে হলো, পঞ্চাশ বছর আগে এই রাস্তা দিয়েই একটি কালো চেহারার লাজুক ছেলে দ্রুতপদে এখান দিয়ে হেঁটে চলত। জীবনের সুখ ও উপভোগ, অর্থসম্পদ, আরাম ও যশ, কিছুই তার কাম্য ছিল না। সে চেয়েছিল কেবল বিদ্যা অর্জন করতে ও জ্ঞান আহরণ করতে। ঐ স্কুলে গিয়ে আমি পৌঁছলাম নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে।

স্কুলের দ্বাররক্ষী আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে; ভাবে বুঝলাম যে হাই-মাষ্টারের সাক্ষাৎ পাওয়া খুব সহজ নয়। একটি মহিলা সেক্রেটারী এসে বললে যে আগে শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে কি জানতে চাই সেটা বলাকওয়া হোক, তারপর হাই-মাষ্টার অল্পকালের জন্য দেখা করবেন। সে বললে যে শ্রীঅরবিন্দের নাম কোথাও সে খুঁজে পাচ্ছে না। আমি তাকে কেম্‌ব্রিজ কিংস কলেজের রেকর্ডের একটি ফটো কপি দেখালাম, তাতে লেখা আছে "সেন্ট পল্‌স্ থেকে আগত ছাত্র"। আমি খুঁজে বের করতে চাইলাম, কিন্তু রেজিষ্টী বই সে দিলেনা।

অতঃপর দ্বাররক্ষী আমাকে নিয়ে গেল হাই-মাষ্টার মিষ্টার গিল্-কিসের কাছে। একজন চাঙা ও রোগা মানুষ, তিনি আমাকে সাদর আহ্বান করলেন, আমার ওভারকোট খোলাতে সাহায্য করলেন। তারপর দুজনে বসে রেজিষ্টী খুঁজতে থাকলাম, তিনি আমাকে

একখানা বই দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিন মিনিটের মধ্যেই আমি পেয়ে গেলাম নাম,—'ঘোষ অরবিন্দ এক্রয়েড্'। আনন্দ সহকারে সেটি দেখালাম। তিনি মনে করলেন, আমি বুঝি জীবনী লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করছি। আমি বললাম, তথ্য জানতে এসেছি কিন্তু জীবনী লেখার কথা বলতে পারি না। আমি এসেছি তীর্থযাত্রীর মতো। শ্রীঅরবিন্দ এই দেশে ১৪ বছর কাটিয়ে গেছেন ও গভীরভাবে গ্রীক, রোমান ও বর্তমান ইউরোপীয় সংস্কৃতির সারমর্ম আয়ত্ত করে গেছেন। ভারত সেই সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডের কাছে ঋণী। আমি সে ঋণ কিছুটা শোধ করতে ইচ্ছুক, যদিও শ্রীঅরবিন্দ তা অনেকটাই শোধ করেছেন ইংরেজী ভাষাতে তাঁর অমূল্য অবদানগুলি দিয়ে।

আমি যখন তাঁকে বলতে শুরু করলাম শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন সম্বন্ধে নবদৃষ্টির কথা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এবং বস্তু ও আত্মার অপূর্ব সংশ্লেষণের কথা, এবং জগতের সকল মানবের মহামিলনের সম্ভাবনার কথা,—তখন আমার স্মরণ হতে থাকল যে সেই মহামানব এই লণ্ডনে থেকে কতই নিদারুণ দারিদ্র্যদুঃখ সহ্য করেছেন, বিলাতের দারুণ শীতে তাঁর একটা ওভারকোট জোটেনি, রাতের পর রাত তিনি অভুক্ত থেকেছেন। দিলীপ রায় যখন তাঁকে চিঠিতে লিখলেন যে তিনি বড়ো হয়ে অন্নের সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্টের কথা বুঝবেন না, তখন শ্রীঅরবিন্দ তার জবাবে লিখেছিলেন—"কি অদ্ভুত কথা! অতিমানসের ভাব নিয়েই নাকি আমি জন্মেছি, তাই কঠোর বাস্তবের কথা কিছুই বুঝিনা। হা ভগবান। সারা জীবনটাই যে আমার কেটেছে কঠোর বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করে—কত দুর্ভোগ, ইংলণ্ডে অনাহারে থেকে নিত্য বিপদ আপদের সম্মুখীন হয়ে দিন কাটানো, আর এখানে এই পণ্ডিচেরিতে থেকেও আরো কত নিত্য নূতন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিপত্তির সম্মুখীন হতে থাকা,—আমার সারা জীবনটাই তো সংগ্রাম; এখন যে আমি উপরতলার ঘরে বসে সেই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি আধ্যাত্মিক উপায়ে ও অন্যবিধ বাহ্যিক উপায়ে, তার মানে এই নয় যে আমার সংগ্রামের কোনো ঘাটতি হয়েছে।" ভক্তেরা তাদের গুরুর সম্বন্ধে প্রায়ই কত ভুল বোঝে!

হাই-মাষ্টার আমার কথাগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। এই সময় একজন শিক্ষক এসে বললে, তাঁর কোনো এক নির্দিষ্ট কাজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তিনি তখনই বললেন "আজ আর হবে না"। আমার সঙ্গেই কথা বলতে থাকলেন।

অতঃপর তিনি আমাকে সেন্ট পল্‌স্ স্কুল সংক্রান্ত কয়েকটি বই দিলেন এবং স্কুলের চারিদিক ঘুরে দেখাতে চাইলেন। উপরে উঠতে উঠতে বললেন—"শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চয় এখান দিয়ে কতবার যাতায়াত করেছেন, লাওকুনের এই মূর্তিটাও কতবার দেখেছেন।" শ্রীঅরবিন্দের "**The Foundations of Indian Culture**" বইখানিতে ওটির সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, সে কথা আমার মনে পড়ল। অফিসে ফিরে গিয়ে তিনি বললেন যে আমাকে সবরকম সাহায্য করতেই তিনি প্রস্তুত আছেন, আর শ্রীঅরবিন্দের

সমসাময়িক ঐ স্কুলের ছাত্র মিষ্টার সিরিল বেইলির নামে একখানি চিঠিও দিলেন। তার পরে নিয়ে গেলেন প্রার্থনাগৃহে; বললেন যে নিকটন ও পেপিস্ এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। স্কুলের পত্রিকা "Pauline" (পলিন)-এর জন্য তিনি আমার কাছে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ চাইলেন।

সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট সময় কখন পার হয়ে গেল—প্রায় ৪টে বাজল। উঠে আসার আগে আমি বললাম, "শ্রীঅরবিন্দের একটি কবিতা আপনাকে শোনাতে চাই, তাতে বুঝবেন যে ইংরেজী ভাষাতে তাঁর কি ঐশ্বর্যপূর্ণ ও অপূর্ব দখল ছিল।" আমি ধীরে ধীরে "The Rose of God" কবিতাটি পড়ে শোনাম। শুনে ওর ভাষা ও ভাবগাম্ভীর্যে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারপর ভিজিটারের খাতায় আমার একটা সই দিতে বললেন। সই করার পরে আমাকে তিনি গেট অবধি পৌঁছে দিলেন। গেটের কাছে ছেলেরা দুই সার বেঁধে চলে যাচ্ছিল। তিনি তাদের ভিতর থেকে একজনকে ডাকলেন, "শা।" বম্বের একটি ছেলে বিক্রম শা দল থেকে বেরিয়ে এসে স্যালুট করলে। হাই-মাষ্টার বললেন, "এ ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান।" আমি তাকে বললাম, "তুমি যে স্কুলে পড়ছ এখানে বিলাতের ও ভারতের অনেক মহৎ ব্যক্তি পড়েছিলেন, এ কথা মনে রেখো; শ্রীঅরবিন্দ এখানকারই ছাত্র ছিলেন।" সে আমাদের জন্য গেট খুলে ধরে আন্তরিকতার সঙ্গে অভিবাদন জানালে।

আমার তখন মনে হলো, এখানে তীর্থযাত্রা আমার সার্থক হয়েছে।

ইংলণ্ডে থাকতে এ সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মিষ্টার বেইলির সঙ্গে আমি দেখা করলাম তাঁর সুদৃশ্য গৃহ "Wantage"এ। সেন্ট পল্‌স্ স্কুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ৫০ বছরেরও বেশি।

মিষ্টার বেইলির সঙ্গে সাক্ষাতের পরে আমি হাই-মাষ্টারকে পত্রে সে কথা জানালাম। তার জবাবে ১৮ই অক্টোবর তারিখে এলো এই লাঞ্চের নিমন্ত্রণ—

"আপনার পত্রে ডক্টর সিরিল বেইলির সঙ্গে আলাপের কথা জেনে খুশি হলাম। আমি জানতাম যে এই স্কুলের পুরানো স্মৃতির কথা নিয়ে পুনরালোচনা করায় তিনি আনন্দ পাবেন, আর নিশ্চয় বুঝেছিলাম যে আপনাদের দুজনের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা জমবে।

এ দেশ ছাড়বার আগে আর একবার এই স্কুল দেখতে আসায় আপনার আপত্তি হবে কিনা জানিনা। যদি তা না থাকে, তাহলে আগামী বুধবার ২৬ অক্টোবর বেলা ১২।।টার আগে এখানে আসতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এখানে একটু কষ্ট ক'রে স্কুল লাঞ্চ খাবেন সেই ঘরে বসে যেখানে শ্রীঅরবিন্দ খেতেন..."

বিনীত

এ, এন, গিলকিস

নির্দিষ্ট দিনে ঠিক সময়ে ঐ স্কুলে গিয়ে পৌঁছলাম। প্রকাণ্ড এক হলঘরে প্রায় ৪০০ ছাত্র কাঁটাচামচ নিয়ে বসে বিরাট জটলা করছে এক ঝাঁক পাখির মতো। তাদের যা খাদ্য দেওয়া হয়েছে তা মোটামুটি ধরণের ও সরল। আমার বসবার স্থান হলো ডায়াসের উপর হাই-মাষ্টার, তাঁর স্ত্রী, ও অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে, সেখান থেকে আমরা ছেলেদের দেখতে পাচ্ছিলাম। খাবার সময় আমার সর্বক্ষণই মনে হতে থাকল সেই ছেলেটির কথা যে ১৮৮৪ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত প্রত্যহ এখানে বসে নাক খেতো!

ইংলণ্ড ছেড়ে আসার আগে আমি হাই-মাষ্টারকে তা জানিয়ে চিঠি দিলাম। তার এই জবাব পেলাম ২৫ নভেম্বর ১৯৩৫ তারিখে—

"আপনার চিঠির সঙ্গে আমাদের "Pauline" কাগজের জন্য শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পেয়ে অনেক ধন্যবাদ জানাই; প্রবন্ধটি বেশ ভালো হয়েছে, আমি খুব খুশি হয়েছি; আমাদের আগামী সংখ্যার এটি এক উল্লেখযোগ্য জিনিস হবে। আমি মিষ্টার রিচার্ডকে আপনার চিঠি দেখিয়েছি, তিনি আপনাকে আগে পত্র পাঠাবেন, তারপরে ঐ প্রবন্ধযুক্ত "Pauline" আগামী বারে ছাপা হলে তার কয়েক কপি আপনার কাছে পাঠাবেন।

আপনি যে বইগুলি দিয়েছেন তার জন্যও কৃতজ্ঞতা জানাই ওতে যে কেবল এই স্কুলেরই কাজ হবে তাই নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরস্পরের বোঝাবুঝির পক্ষেও ওতে সহায়তা করবে। আপনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে যে উৎসাহ আপনি জাগিয়েছিলেন তা আমি সহজে ভুলবনা। তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি কেবল আমার পক্ষ থেকে নয়, সমগ্র স্কুল সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও আপনার মহৎ কর্মের জন্য আপনাকে উৎসাহিত করছি।"

এ, এন, গিলকিস

কঠিন ডানায় ওড়া

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বীরবাহু

কর্ম্মে সর্ব্ব সময় ব্যস্ত না থাকিলে কল্পনার পক্ষীরাজে উড়িয়া অনেক দূর দেশান্তরে ভ্রমণ করা যায়। কিন্তু মাথার উপর যদি সর্ব্বদাই কর্ম্মের বিরাট বোঝা ন্যস্ত থাকে তখন কল্পনার ঘোড়া খোঁড়া হইয়া যায়। বাস্তব তখন কল্পনার অশ্বকে খোঁড়া করিয়া কর্ম্ম আর কল্পনার এক বিচিত্র ধারা সৃষ্টি করে।

চারবাটিয়ার যে বিরাট কর্ম্মের বোঝা আমাদের উপর ছিল, তাহা সমাপন করার পর আর কল্পনার রাজ্যে যাওয়ার ফুরসৎ মিলিত না।

প্রত্যেক দিনের রুটিন ছিল কাজ, আহার আর সারাদিন যাহাকে বলে "হাড়ভাঙ্গা খাটুনি" খাটিবার পর শয্যাগ্রহণ। শয্যাগ্রহণ মানেই নিদ্রা, এমন নিদ্রা যে মনে হইত এক নিমেষেই রাত্রি কাবার হইয়া গেল। নূতন বিমানের কথা চিন্তায় আনারও অবকাশ মিলিত না।

আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি একদিন ভারতীয় বৈমানিকদের মধ্যে আমাদের মত কয়েকজনকে দপ্তরে তলব করিল। দপ্তর হইতে কি কারণে তলব আসিল, সে কথা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন হইল না। সেই দিনই তল্পিতল্পা গুটাইয়া চারবাটিয়া বিমান বন্দর ছাড়িয়া সুদূর করাচিতে যাইতে হইবে। ট্রেনে করাচী পৌঁছাইবার জন্য প্রায় দশ বার দিন সময় পাওয়া গেল।

চারবাটিয়া হইতে করাচী ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত। এই প্রায় তের-চৌদ্দশত মাইল পথ রেলে পৌঁছাইতে দশ বার দিন সময় দেওয়া হইল, তাহার কারণ করাচী সুদূর পাল্লার পথ বলিয়া, মধ্য পথে কিছুদিন বিশ্রাম করার জন্য নয়। এর প্রকৃত কারণ হইল, তখন প্রত্যেক ট্রেনেই অসম্ভব সংখ্যক যাত্রীদের গমনাগমনের জন্য মাঝপথের যাত্রী দের ট্রেনে চড়িয়া বসা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তখনকার সময় ভারতের রেলপথে, এক অংশ হইতে অন্য স্থানে বহু সামরিক ব্যক্তি-দেরকে যাতায়াত করিতে হইতেছিল। কেহ ছুটিতে গৃহ অভিমুখে চলিয়াছে, কেহ ছুটিতে আরাম উপভোগ করিবার পর কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া চলিয়াছে। কেহ বা আবার বদলির হুকুম পাইয়া নূতন কর্ম্মস্থলে চলিয়াছে। সব বড় বড় ষ্টেশনেই একজন করিয়া সামরিক কর্ম্মচারী

সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিত, ট্রেনে যাত্রী সাধারণ ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য। কোথাও যাইতে হইলে নিকটস্থ রেল ষ্টেশনে যাইয়া আর, টি, ওর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে প্রায়ই একটা কিছু বন্দোবস্তের সুরাহা হইত; একেবারে খালি কামরা না হউক, বসিয়া যাওয়ার মত স্থান প্রায়ই পাওয়া যাইত।

আমরা দশ বার জন পরদিন রওনা হইলাম। সকলে সোজা কলিকাতায় আসিয়া সেখান হইতে দিল্লী হইয়া রাজস্থানের মরুভূমির পথে করাচী রওনা হইল। আমার বেলায় ব্যবস্থা সামান্য বদল করিয়া লইলাম। সরাসরি কলিকাতায় না আসিয়া জামসেদপুর হইয়া কলিকাতায় পৌঁছিলাম। কতদিন করাচী থাকিতে হইবে জানি না, সেইজন্য দুইদিন বাড়ীতে আসিয়া আনন্দ করা গেল।

দুই দিন পরে কলিকাতায় আসিয়া আর, টি, ওকে জানাইলাম, এবং সেইদিনই অপরাহ্নের ট্রেনে দিল্লী রওনা হওয়া গেল। একটা অপেক্ষাকৃত ছোট কামরায় আমার স্থান মিলিল। কামরার দেওয়ালে বাংলা হরপে লেখা ছিল "১৪ জন বসিবেক"। যাত্রীদের সংখ্যা বেশী ছিল না। একদিকের জানালার পাশে বসিবার স্থান করিয়া লইলাম এবং বসিবার স্থানের উপরের বাঙ্কে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হইল। অপরদিকে জানালার পাশে এক ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী ও তিনটি সন্তান লইয়া বেশ আরাম করিয়া ঝাঁকিয়া গুছাইয়া বসিয়াছেন। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম তাঁহার সাথে অন্ততঃ গোটা দুই টিফিন কেরিয়ার বেশ সযত্নে নিকটেই বেঞ্চের উপর রাখা আছে। কাপড় পরিধান চঙ্গে বুঝিলাম বঙ্গবাসী এবং কথা শুনিয়া বুঝিলাম পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী। ক্রমে ক্রমে আলাপ হইল। তাঁহারা চলিয়াছেন কর্ম্মস্থলে জয়পুর বা রাজস্থানের ঐরূপ কোন ছোট রাজ্যে—ভদ্রলোক সেখানকার রাজ্য সরকারের কর্ম্মচারী। নানা আলাপে জানা গেল তাঁহারা আমাদের সগোত্র। আলাপ হওয়ার দরুন টিফিন কেরিয়ার মারফৎ আনীত মহাশয় দ্রব্যগুলির কিঞ্চিৎ ভাগ পাইতেছিলাম। সেই লুচি, তরকারি সন্দেশের দরুন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার উপর যথেষ্ট সহৃদয়তাবের জাগরণ হইতেছিল। আর সেইজন্য রেষ্টোরাঁ গাড়ীর অন্নের স্পৃহা বা চাহিদা মোটেই হইতেছিলনা। অবস্থা বেশ ভালই বলা যায়। শুধু সকালে বিকালে চায়ের ব্যবস্থা আমার দিক হইতে হইতেছিল। ব্যবসায়ের দিক হইতে দেখিলে লাভবানই ছিলাম।

দ্বিতীয় দিনের লুচি সন্দেশের পর, ভদ্রলোক আগাইয়া আসিয়া হাত ধরিয়া এক সাংঘাতিক অনুরোধ করিয়া বসিলেন। তাঁহার প্রথম সন্তান কন্যা রত্নটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। বিলম্বে নয়, অবিলম্বে, করাচীর পথে জয়পুর ঘুরিয়া এইবারই কাজ সম্পন্ন করিয়া যাইতে হইবে। আমি যতই বলি যে বিমান বাহিনীতে থাকা কালে এমন কর্ম্ম করা সমীচীন নয়; কারণ আজ হয়ত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছি, আর কালই হয়ত আমারই সহকর্মীরা আমার দেহ বহিয়া শেষকৃত্যের জন্য লইয়া যাইবে। তাঁহার প্রস্তাবে আমি

কৃতজ্ঞ, কিন্তু প্রস্তাব গ্রহণে একেবারেই অসমর্থ। কন্যারত্নটি তাঁহার মার নিকট বসিয়া ছিলেন এবং ক্রমেই রাঙা হইতে রাঙাতর হইতেছিলেন। হয়ত এর পর কাঁদিয়া ফেলিবেন। ভদ্রলোক তবুও উপরোধ করিতেছেন। অগত্যা চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য একদিন সময় চাহিয়া লইলাম। ভদ্রলোক ফিরিয়া গেলেন। আমি নির্ভীত হইয়া তখনকার মত শুইয়া পড়িলাম। এবং মনে মনে ভগবানকে বলিলাম,"দিব্য আরামে লুচি সন্দেশ লইয়া যাতিয়া রহিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একি বাদ সাধিলে।" পূর্বে জানিলে লুচি সন্দেশের মোহ নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিতাম। লুচি সন্দেশ ফিরাইয়া দেওয়ার উপায় আর নাই। এবং ভদ্রলোক যে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সেই অনুরোধে ভদ্রমহিলার অনুমোদন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে অনুরোধ মানিয়া লওয়া একেবারেই অসম্ভব। এখন উপায় কি? বৈকালের মধ্যেই উপায় স্থির করিয়া কামড়া বদল করিয়া ফেলিলাম। দিল্লী পৌঁছাইবার পর, ভদ্রলোকের সাথে যাহাতে আর দেখা না হয়, সেই জন্য দিল্লী পৌঁছাইয়াই ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া বিমান বহরের জন্য সামরিক বিভাগের বিশ্রামাগারে চলিয়া গেলাম। সেখানে একদিন থাকার পর মুলতান হায়দারাবাদ পথে করাচী পৌঁছাইলাম।

একটা কথা এখনও বুঝি নাই। ভদ্রলোক কি এমন দেখিয়াছিলেন যে সমস্ত কাজ ঝটপট সারিয়া লওয়ার জন্য এমন কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিলেন? প্রথম আলাপ তিনিই সুরু করিয়াছিলেন এবং লুচি সন্দেশের নিমন্ত্রণও তিনিই করিয়াছিলেন। আমি ত স্রেফ্ট্রোঁ গাড়ীর উপাদেয়গুলির জন্যই অপেক্ষা করিয়া ছিলাম। এবং চেহারার দিক হইতে বলিতে পারি বিশাখাপটনমের তুলনায় কিঞ্চিৎ সুশ্রী হয়ত ছিল—দাড়ি ছিলনা বটে, কিন্তু গোঁপ জোড়াটি পাকাইয়া সুঁচলো করিয়া—আকর্ণ নয়—আচক্ষু বিস্তৃত ছিল। অবশ্য বিমান বাহিনীর চৌকস পোষাকে আবৃত ছিলাম—হয়ত তিনি এই বিমান বাহিনীর পোষাকেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

পথে হায়দারাবাদে বিমান বাহিনীর আড্ডা রেলওয়ে ষ্টেশনের একেবারে সংলগ্ন। উড়নপথের পাশে সযত্ন-রক্ষিত হোয়াট-এ-পিটি (Wapiti) বিমানগুলি দেখিয়া মনে হইল করাচী ত্বরণ যে কারণে, তাহার মধ্যে কিছু সত্য আছে ত? সত্যসত্যই কি আমাদেরকে নূতন বিমান দেওয়া হইবে? না এটাও আমরা ভারতীয়দের সাথে বিলাতীদের একটা রঙ্গ রস?

হায়দারাবাদ যে যথেষ্ট গরম তাহার প্রমাণ ট্রেনে বসিয়াই পাইলাম। আর ট্রেন যাওয়ার সময় সহরের বাড়ীগুলির দিকে নজর পড়িল। প্রত্যেক বাড়ীর উপরেই জাহাজের উপর ঘুর ছাড়িবার নলের আকারের নল সজ্জিত আছে। সব নলগুলি বাড়ীর উপরে উঠিয়া পরে সমুদ্রের দিকে বাঁকাইয়া রাখা হইয়াছে। সমুদ্রের হাওয়াই যাহাতে বাড়ীর অন্দর

বহলে চুকিতে পারে তাহার জন্য এই ব্যবস্থা। অন্য দিক হইতে আগত হাওয়া নিশ্চয়ই অন্দর বহলের জন্য স্বাস্থ্যবান নয়।

আর একটি রেল ষ্টেশনের কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না। রোহি। নীলনদের প্রায় উপরে। না ভুলিবার কারণ জল। লম্বা ষ্টেশন প্ল্যাটফরমের একদিকে সারি করিয়া জলের জন্য নল বসান আছে। আর নল খুলিলেই কি জল। নীলনদের প্রচুর ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া এই কয়দিনের ট্রেন ভ্রমণের অবসাদ একেবারে কাটিয়া গেল।

বিমানে ভ্রমণ আর ট্রেণে ভ্রমণ, দুইই ভ্রমণ কিন্তু তাহারা পৃথক জাতের। বিমানে ভ্রমণে শুধু ওঠা ও নামার সময় ছাড়া মাটির সাথে সংস্রব নাই। মাটির উপর ট্রেনে ভীড়ের জন্য নোংরামো, নীচতা আর স্বার্থপরতার সাক্ষাৎ প্রতি পদক্ষেপেই, বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীতে, যেখানে সাধারণ গরীব মানুষের স্থান। একথা আরও বেশী করিয়া সত্য পাঠানের রাজত্বে। পাঠানের রাজত্বে জলের অভাব তাহার স্বভাবটিও ভোতা করিয়াছে। সে যে আধার হইতে জল লইয়া মুখ ধুইল, মুখ ধোওয়ার পর সেই আধারেই মুখ ধোওয়া জল কুলকুচি করিয়া ফেলিল। এতে জলের কমতি হইলনা বটে কিন্তু আমাদের বিচারে সে জল শুধু অশুদ্ধ নয় নোংরা অস্বাস্থ্যকরের পর্যায়ে নামিয়া গেল।

আকাশ-ভ্রমণে বিমানে নোংরামো, নীচতা, স্বার্থপরতা নাই বলা চলে না, কিন্তু ট্রেন ভ্রমণের তুলনায় অতি সামান্য মাত্র। কারণ বিমানভ্রমণ সাধারণ মানুষের জন্য নয়, সেইজন্য যেটুকু স্বার্থপরতা, নীচতা বা নোংরামো আছে, তাহা সুষ্ঠুরূপে ভদ্রতার মুখোশে আবৃত থাকে। অনেকদিন পরে এত দীর্ঘ ট্রেন ভ্রমণে একটু হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলাম।

করাচীতে বিমান বন্দর দুইটি। প্রথমেই পড়ে ড্রিগ্ রোড্ বিমান বন্দর; ড্রিগ্ রোড্ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে যাইতে হইত; অন্যটি করাচীতে—নাম, আর একশত এক (R 101)। দুইটিই সংলগ্ন। ড্রিগ্ রোড্ হইতে করাচীর ব্যবধান সামান্য কয়েক মাইল মাত্র।

ক্যাম্পে পৌঁছাইয়া এক এলাহি ব্যাপার দেখিলাম। এক বালুময় ফুটবল মাঠে তাঁবুর ছাউনি ফেলা হইয়াছে। বেশীর ভাগ তাঁবুতেই চারজন বা তিনজন করিয়া থাকিবার ব্যবস্থা। একদিকের গোলপোষ্টের পাশে একটা ছোট তাঁবু—সেখানে আমার একলা থাকার জন্য ব্যবস্থা পরিপাটি। চারিটি বড় তাঁবু একত্র জুড়িয়া খাবার ঘর বানান হইয়াছে। রসুইঘরও টেন্টের তৈরারী। আর রসুইঘরের পাচক ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা, শুধু একজন ছাড়া, আর সকলেই সদ্য রিক্রুট করা আফ্রিদী মুসলমান। তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধানের নাম মোল্লা—তাহার গায়ের রং দারুণ কর্সা কিন্তু লম্বা দাড়ির রং নিশ কালো। সব কথাতেই প্রথম জবাব "জি হুজুর"। যে মুসলমান নয়, তাহার বাড়ী মুলতান, ডাকাতি করিয়া ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু ফৌজে নাম লিখাইবে বলিয়া কয়েদখানা হইতে মুক্তি

পাইয়াছে। কালো বিরাট দেহ, ও সেই অনুপাতে লম্বা চওড়া চিকন কালো গোঁপ জোড়াটি। গলার স্বর চেহারার একেবারে বিপরীত—অতিশয় মিহি, যেন পাঁচ-সাত বৎসরের মেয়ের গলার স্বর। রসুইঘরের কাজে কিন্তু সে অদ্বিতীয়। পোলাও কালিয়া রুটি ব্যঞ্জন রন্ধন কার্য্যে তাহার জুড়ি কেহই ছিল না। মোল্লা প্রধান পাচক হইয়াও এই অনুসলমানকে শুধু তাহার উত্তম রন্ধন কার্য্যের জন্য বরদাস্ত করিত।

দুই শতেরও অধিক বৈমানিকদের সংগ্রহ করিয়া এই ছাউনিতে বাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সকলেই নূতন বিমান নির্ম্মাণ কার্য্য শিক্ষার জন্য নিযুক্ত। ড্রিঘ্ রোডের বিমান নির্ম্মাণের এবং বিমানের অংশ মেরামতের কারখানা তখন সমস্ত প্রাচ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। বাঙ্গালোর বিমান নির্ম্মাণের কারখানা তখনও নেহাতই শৈশবাবস্থায়। আমেরিকান বিমান বাহিনীর প্রধানেরা শুধু পরিকল্পনা অনুযায়ী কারখানা প্রস্তুত ও সেই সাথে বিমান মেরামতের প্রস্তুতির কাজ শুরু করিয়াছিল।

বিমানের নির্ম্মাণে নানা প্রকার অংশের প্রয়োজন। কতকগুলি অংশের গঠন খুব সূক্ষ্ম ও সুকুমার। সেগুলির মেরামত বা বিমান লাগাইবার কাজ যথেষ্ট সাবধানে করিতে হয়। যন্ত্রের অভাব ঘটিলে বিকল হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—অনেক সময় যন্ত্রের অভাবে ব্যবহারের একেবারে সম্পূর্ণ অযোগ্যও হইয়া যাইতে পারে। সেগুলির গঠন ও মেরামতের কাজে বিচক্ষণ দক্ষতার প্রয়োজন এবং সেই সমস্ত অংশের গঠন ও মেরামতের কাজ যখানে সেখানে করাও সম্ভব নয়। শীততাপ ও বায়ুচাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে এই প্রকার যন্ত্রের কাজ চলে। এঞ্জিনে সঠিক মাপমত পেট্রল সরবরাহ করার জন্য কারবুরেটর এইরূপ একটি যন্ত্র। শীততাপ ও বায়ুচাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর ছাড়া এই যন্ত্রের মেরামত বা গঠন করা উচিত নয়। বিমান গঠনের কাজে এইরূপ আরও কয়েকটি যন্ত্র প্রয়োজন হয়, কিন্তু কারবুরেটরেই সব চেয়ে বেশী যন্ত্রের প্রয়োজন।

কারখানার শীততাপ ও বায়ুচাপ নিয়ন্ত্রিত অংশে, কারবুরেটর ঘরে আমাকে কর্ত্তারা নিয়োজিত করিলেন। কাজের সময় সকাল সাতটা হইতে বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত। ও দুপ্রহর একটা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত। দুপ্রহরের আহার এগারটা হইতে একটার মধ্যে। দুপ্রহরের আহারের পর টেন্টের ঘরে থাকা দুরূহ ব্যাপার ছিল। টেন্টের ছাত দুই পাল্লা মোটা চট হওয়া সত্ত্বেও করাচীর গরম হাওয়া টেন্টকে তন্দুর-চুল্লীর মত উত্তপ্ত করিয়া রাখিত। গরম টেন্টের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকিলেই গরমে গাত্র-দাহ-জ্বালার সৃষ্টি হইত। রবিবার দিন ছাড়া, দুপ্রহরের বিশ্রাম, টেন্টের মধ্যে গরমে সিদ্ধ না হইয়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কারবুরেটর ঘরেই করিতাম। আমি ছাড়া, আর সকলে যাহাদের শীততাপবায়ু-চাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে কাজ করিতে হইত, তাহারা সকলেও দুপ্রহরের বিশ্রাম নিজেদের কর্ম্মস্থলেই সম্পন্ন করিত। হাঙ্গারে যাহাদের কাজ ছিল,

শুধু তাহারাই মুস্কিলে পড়িত, কারণ এত গরমের মধ্যে তাহাদেরকে টেন্টের মধ্যেই প্রায় দেড়-দুই ঘন্টা সময় বাধ্য হইয়া অতিবাহিত করিতে হইত।

এই দুই শতাধিক বৈমানিকদের মধ্যে প্রায় পঁচিশ তিরিশ জন পাশি ছিলেন। পাশিরা এই দেশকে নিজেদের দেশ বলিয়া গ্রহণ করিলেও অনেকগুলি বিষয়ে এখনও তাঁহাদের নিজস্ব ধারা বজায় রাখিয়াই চলিয়াছেন।

এই পাশিদের মধ্যে কয়েকজন খুব কাজের লোক ছিলেন। রিপোর্টার,—খুব সম্ভব রিপোর্টারের পিতা বা পিতামহ কোনোকালে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ করিতেন, সেই কারণে তাঁহাদের পদবীই রিপোর্টার হইয়া গিয়াছে,—ড্রিফ্ রোডে আসিবার সময় একজন চাকর সঙ্গে লইয়া আসিলেন। চাকর সঙ্গে করিয়া আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার জবাবে বলিলেন যুদ্ধ করিবার সময় তাহার নিজস্ব জিনিষপত্র, জামা কাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া গুছাইয়া রাখিবার ফুরসৎ হয়ত মিলিবে না, সেইজন্য যদি একজন নোকর সাথে থাকে, তবে তিনি যখন ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবেন তখন নোকর তাঁহার পোষাক-আসাক ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে পারিবে, এমন কি দরকার হইলে শিকারীদের নোকরের মত, উপরন্তু একটা বন্দুক ঘাড়ে করিয়া তাঁহার পিছনে পিছনে যুদ্ধে যাইতেও পারিবে। রিপোর্টারকে ছাউনিতে পৌঁছাইতে তাঁহার পিতাও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। অনেকভাবে অনেক কথা বলিয়া বুঝাইয়া নোকরকে রিপোর্টারের পিতার সহিত তাহাদের বাসস্থান বোম্বাইতে ফেরত পাঠান হইল। যাওয়ার সময় পিতা আমাদের মত কয়েকজনকে বারে বারে তাঁহার শিশুসন্তানটিকে দেখাশোনার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন। সন্তান এখন পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যুবক হইলেও নোকর বিহীন অবস্থায় কখনও বাড়ীর বাহিরে যায় নাই। নাদুসনুদুস চেহারার রিপোর্টার, চোখে মোটা কাঁচের চশমা পরিয়া আমাদের সাথে ছাউনিতে আসিলেন। শিক্ষানবিশী তিনি আম্বালায় সমাপ্ত করিয়াছিলেন। বিমান বাহিনীর এক নম্বর স্কুলের এলাকার বাহিরে কোন বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে নোকরকে রাখিয়াছিলেন। নোকর প্রত্যহ আসিয়া তাহার প্রভুর তদারক করিয়া যাইত ও রিপোর্টারের পিতার নিকট তাঁর পুত্র ভালোই আছেন বলিয়া রিপোর্ট পাঠাইত। আম্বালায় এই সরলমনা ছাত্রটির নিকট হইতে তাহার সহপাঠিরা নানা-প্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া লইত।

রিপোর্টার আম্বালার বিমান বাহিনীর স্কুলে বিমানের খোল মেরামত-বিদ্যা অর্জন করেন। কিন্তু আমরা যখন বর্মা সীমান্তে সত্যসত্যই ঘোরতর নিশযুদ্ধে জাপানীদের উপর দিন অন্ততঃ দুইবার বোমা বর্ষণে ব্যস্ত, তখন রিপোর্টার বিমানের খোল মেরামতের কাজ বর্জন করিয়া আমাদের রসুইঘরের সমস্ত ভার লইলেন। এবং আমরা যখন কেহ বিমান মেরামত বা পরীক্ষার কাজে অথবা শত্রুর উপর বোমা বর্ষণে ব্যাপৃত, তখন তিনি

নানাপ্রকার সুখাখ্যার অবতারণা করিয়া আমাদের মন একেবারে হরণ করিলেন; রাণুর কাজে দক্ষতার জন্য অমরা তাঁহার নাম বদলাইয়া দিলাম। রিপোর্টারের বদলে 'সেফ্' বা বামনঠাকুর। যুদ্ধ অবসানের পর শুনিয়াছি তিনি বিমান বাহিনী হইতে অব্যাহতি লইয়া বোম্বাই সহরে হোটেল খুলিয়াছেন। এখন ঘরত তাঁহার আধুনিকতম নূতন নামকরণ হইয়াছে 'হোটেলীয়ার'। যুদ্ধের পর তাঁহার সহিত আর দেখা হয় নাই, কাজেই সঠিক সংবাদ দেওয়া সম্ভব নয়। রিপোর্টারের অনেক গুণের কথা এখনও মনে আছে। তাঁহার নাদুসনুদুস চেহারা, সরল মন, ধীরে ধীরে কথা বলার ভঙ্গি, সর্ব্বোপরি কাহারও কোন অসুবিধা হইলে, তৎক্ষণাৎ সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া যাওয়া—অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, যাহার জন্য অনেক সময় তাঁহার ভাগ্যে দিগুর বদলে বিপরীত হইত।

আর দুইজন পার্শি ছেলে করাচীতে আমাদের সাথে কাজ শিখিবার জন্য আসিয়াছিল। তাহাদের নাম না বলাই শ্রেয়। এমন অবাধ্য বৈমানিক আর কখনও দেখি নাই। সারা-দিনে তাহাদের দ্বারা কোন কাজই করান যাইত না। আর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই করাচী সহরে পলাইয়া যাইত। রাত্রে কখন ফিরিয়া আসিত সে কথা তাহারা দুজন ছাড়া আর কেহ জানিত না। কেমন করিয়া ছাউনির চার পাশের কাঁটাতারের বেড়া পারাপার হইত আমরা আশ্চর্য হইয়া ভাবিতাম। প্রথম দিকে তাহারা শুধু অবাধ্য ছিল; কিছুদিন পরে অবাধ্যতার সাথে প্রত্যেক কথায় রূঢ়তাও প্রকাশ পাইল।

তাহাদের এই আচরণ যাহাতে অন্য বৈমানিকদেরকে ভুলপথে আকর্ষণ না করে তখন তাহার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইল। সাধারণতঃ অন্যায়কারী তাহার অন্যায় কাজের মধ্যেই এমন খুঁত রাখে যে, সেই খুঁতেই তাহার অন্যায় কাজ ধরা পড়ে ও শেষ পর্যন্ত তাহাকে অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়। এই দুই বৈমানিকদের বেলায় তাহাই হইল। কোন বৈমানিককে ছাউনির বাহিরে যাইতে হইলে গার্ডরুমে নাম লিখাইয়া যাইতে হইত। নাম লিখাইবার সময় গন্তব্যস্থলের নামও লিখিয়া দিতে হইত, যাহাতে কোন আকস্মিক প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহাকে সহজে পাওয়া সম্ভব হয়। অনেক সময় কাগজপত্র সব ঠিক করিয়া লেখা সত্ত্বেও গার্ডরুম কমাণ্ডারের নিকট বাহিরে যাওয়ার অনুমতি মিলিত না। ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় গার্ডরুমে যাইয়া কোন সময় ফিরিয়া আসা হইল সেই কথা লিখিয়া দিতে হইত। যদি ফিরিয়া আসিবার পর গার্ডরুমে কেহ তাহার ফিরিয়া আসার সময় না লিখাইয়া থাকে তাহা হইলে পরের দিন তাহাকে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইত। গার্ডরুমের কমাণ্ডার স্বয়ং নিজে আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ছাউনির কমাণ্ডিং অফিসারের সামনে হাজির করিত। এবং এই ভুলের শাস্তি যদি সাত দিনের জন্য ছাউনির বাহিরে যাইবার অনুমতি বাতিল হয়, তবে মনে করিতে হইবে খুব

অল্পেই ভুলের শাস্তির সমাধান হইল। বিনা সাজায় কখনও কমাণ্ডিং অফিসারের নিকট হইতে মুক্তি মিলিত না।

একদিন রাত্রে এই দুই জন বীর পুঙ্গব ছাউনি হইতে গার্ডরুমে না গিয়া তাহাদের নিজস্ব পথে করাচী সহর পৌঁছাইয়া, বায়োস্কোপ দেখিতে যায় ও সেখানে বিমান বাহিনীর ফৌজি পুলিসের একেবারে সামনাসামনিতে আসিয়া পরে। ফৌজি পুলিশ তাহাদের চিনিত ও কিছুদিন হইল তাহাদের দুইজনকে হাতে নাতে ধরার চেষ্টা করিতেছিল। ফৌজি পুলিশ তাহাদেরকে ছাউনি ছাড়িয়া আসিবার পত্র দেখাইতে বলে। দুই পুঙ্গবের কাহারও কাছে ছাড়পত্র ছিলনা ; সেই জন্য দুইজনেই কিঞ্চিৎ ভয় পাইয়া দৌড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করে। ফৌজি পুলিশ এর জন্য প্রস্তুত ছিল। দুইজনকেই তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া একেবারে ড্রিম্ রোডে গার্ডরুমে ধরিয়া লইয়া আসে। ধরিয়া আনিবার সময় ফৌজি পুলিশ আরও বুঝিতে পারে যে বীর পুঙ্গব দুইজন শুধু ছাউনি হইতে পলাইয়াই আসে নাই, উপরন্তু তাহারা করাচীর সস্তা মায়গা হইতে যথেষ্ট দুঃখ ভোলার ঔষধও পান করিয়াছে। তাহাদের এই ভুল আরও নারায়ক হইল, যখন দুঃখ ভোলার ঔষধের সেবনে তাহারা সম্যক দিল হইয়া ফৌজি পুলিশদেরকে অনার্জনীয় ভাষায় অনেক প্রীতিকর সম্বোধন করিল। এর পর তাহাদের কিছুদিন পর্য্যন্ত হাজত বাস ছাড়া উপায় ছিলনা। এবং হাজত বাসের পরে তাহারা বাপ বাপ বলিয়া বিমান বাহিনী ত্যাগের পর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল আর বিমান বাহিনীও তাহাদের মত দুই রত্ন হারাইয়া বাঁচিল।

বোটের উপর করাচীতে ভালই ছিলাম ; পি, টি প্যারেড ছিলনা, বিমানে উড়ন ত ছিলই না বিমানের সাথে মাটির উপর সাক্ষাৎও ছিলনা ; শুধু বিমান যখন মাথার উপর আকাশ দিয়া উড়িয়া যাইত, তখন চাহিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতাম। সকাল হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত শুধু কারখানায় কাজ ; আর রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে সহরে যাইয়া আনন্দ করা। ফৌজি লোকদের আনন্দ বর্জনের জন্য করাচী সহরে নানা প্রকার আয়োজন ছিল। আমরা কয়েকজন সেই সমস্ত আনন্দের অনুভূতি সংগ্রহে অপারগ হইয়া সমুদ্রের উপকূলে বাগানে আসিয়া বসিয়া সময় যাপন করিতাম। কখন কখনও বোটে চড়িয়া মানোরা দ্বীপ অভিমুখেও গিয়াছি। বোটে চড়িলে সমুদ্রের মৎস শিকারের জন্য ছিপ ও বড়শি সাথে লওয়া হইত। কৃত্রিম পোকার সহিত বড়শি সমুদ্রের জলে নৌকার সহিত ভাসিয়া চলিত। যদি কোন দুর্ভাগা মৎসের নিশ্চিত কাল হইত তবেই সে কৃত্রিম পোকা গলধঃকরণ করিয়া জীবন উৎসর্গ করিত।

করাচীতে আর একটি প্রবল আকর্ষণ ছিল। সহরে গুপ্তদার বাড়ী। গুপ্তদা ছিলেন কোন বিলাতি ইনসিওরান্স কম্পানীর করাচী সহরের বড় কর্ত্তা। আর বৌদি ছিলেন বিদুষী বাঙ্গালি মহিলা। সন্তানাদি নাই। বৌদি রন্ধনকার্য্যে ছিলেন একেবারে

অধিতীয়। রবিবারে বা অন্য ছুটির দিনে তাঁহাদের বাসায় গান আমাদের কয়েকজনের জন্য সদা উন্মুক্ত ছিল। অনেক সময় উপস্থিত না হইলে পরের দিন দাদা-বৌদির নিকট কৈফিয়ৎ দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইত। দুইজনেই অসাধারণ ছিলেন—যেমনি নিস্তব্ধ তেমনি উদার-চেতা। আমরা কয়েকজন বিনা দ্বিধায় এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতাম। সেইজন্য বিশেষ কারণ ছাড়া, গুপ্তদার আড্ডার গরহাজির হইতাম না। বিমান বাহিনী ত্যাগ করার পর গুপ্তদার সহিত কয়েকবার কলিকাতা ও দিল্লীতে দেখা হইয়াছে। পূর্ব্বের মতই অমায়িক এবং কাহাকেও সাহায্য করিতে পারিলে যেন তাহার কাছে কৃতজ্ঞ হইলেন এই মনোভাবে এখনও রহিয়াছেন। এখন শুনিয়াছি সুদূর ইউরোপে জীবনবিমা কম্পানীর চাকুরীতেই রহিয়াছেন। বিদেশে গুপ্তদার মত এমন সহৃদয় আলাপী লোকের সন্ধান পাওয়া যে কত কঠিন তাহা গুপ্তদাকে না জানিলে জানা সম্ভব নয়।

এবার কাজ শিক্ষার কথায় ফেরা যাক। প্রায় ছয়মাস ধরিয়া কারবুরেটর গঠন ও মেরামত শিখিলাম। ষ্টোর হইতে নূতন অংশগুলি লইয়া আসিয়া, সেই অংশগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষার পর, পুস্তকের নির্দ্দেশ মত সাজাইয়া একত্র করিয়া সংগঠন করা—ও পরে টেষ্ট বেঞ্চে বসাইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখা ও পরীক্ষার ফল বিষদভাবে রিপোর্টে লেখা। কখন কখন টেষ্ট বেঞ্চে কোন অংশের খুঁত ধরা পড়িয়া যাইত। তখন খুঁতের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা হইত এবং যে কম্পানী এই অংশ তৈয়ারী করিয়াছে, তাহা-দেরকে এই খুঁতের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠান হইত। এত সব করার উদ্দেশ্য হইল যাহাতে নূতন অংশ যেগুলি বানান হইতেছে, সেগুলিতে এই দোষ আর না থাকে।

কখন কখন নূতন গঠন করা কারবুরেটর টেষ্ট বেঞ্চে পরীক্ষার ফল ভাল হওয়া সত্বেও, বিমানের এঞ্জিনে লাগাইবার পর নূতন এঞ্জিনে যতটা শক্তি পাওয়া যাইবে আশা করা গিয়াছিল, ততটা শক্তি পাওয়া গেল না। তখন দুই মাইল দূরে অবস্থিত কলাচী বিমান বন্দর হইতে ডাক তলব আসিত। আমরা কয়েকজন এই তলবের আশায় সব সময় রহিতাম। কারণ এই কারবুরেটর লাগান হইতেছিল "ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স" মার্ক ওয়ান বিমানে। এ সেই নূতন বিমান যাহার জন্য আমরা সুদূর করাচীতে বিমানের কলকব্জা ইত্যাদি হাতেনাতে শিক্ষার জন্য আসিয়াছি। এই সময় যে কয়টা ভেন্‌জিয়ান্স বিমান এদেশে আসিয়াছিল, সবগুলিই তখন করাচীতে মাটির উপর চালাইয়া, আকাশে উড়াইয়া, উড়িবার সময় আকাশে উল্টাইয়া, পাল্টাইয়া ডিগবাজী খাইয়া ও সব রকম পরীক্ষা করিয়া এ দেশে ঐ বিমানের উপযোগিতা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছিল।

ডাক পড়ামাত্র আমরা দুই তিনটা নূতন কারবুরেটর সাথে লইয়া বিমানক্ষেত্রে যাইতাম ও একটার পর অন্যটা লাগাইয়া এঞ্জিন পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম। প্রায়ই পুরাতন কারবুরেটর সামান্য টুকিটাকি কাজের পর সুন্দর কাজ করিত।

বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে গেলে এক বিরাট হ্যাঙ্গার নজরে আসিত। হাঙ্গারের নাম

'আর একশত এক'-এর একটা গল্প আছে। ১৯২৭-২৮ সালে বিলাতি বিমান প্রস্তুতকারী এঞ্জিনীয়ার জার্ম্মানদের মত জেপেলীন বানাইবার মনস্থ করে। উদ্দেশ্য ছিল এই এয়ার-শীপে অর্থাৎ হাওয়ায় চলা জাহাজে শতাধিক যাত্রী লইয়া দূর দেশে যাতায়াত। সর্ব্ব সমেত তিনটা এয়ার-শীপ বানাইবার পরিকল্পনা তাহারা করে। সর্ব্ববৃহৎটির নাম তাহারা 'আর একশত এক' দেয়। বিলাতের আকাশে তাহারা কিছুদিন ঘুরিয়া নানা প্রকার পরীক্ষার কাজ শেষ করিয়া ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি একদিন করাচীর দিকে রওনা হয়। বিলাতের বাছা বাছা বৈমানিকরা ও বিলাতের বিমান মন্ত্রী নিজেও এই সময় এয়ার-শীপে ছিলেন। লণ্ডনের ক্রয়ডন বিমানপোত হইতে রওনা হইয়া অন্য কোথাও না অবতরণ করিয়া সোজা করাচীতে আসাই তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন। বৈকালের পর সমুদ্র পার হইয়া তাঁহারা ফরাসীদেশের উপরে আসেন—এবং রাত্রের আহার সমাধা করিয়া তাঁহারা সারা দুনিয়াকে বেতার বার্ত্তায় জানান যে এইবারে তাঁহারা বিশ্রামে যাইতেছেন। এই বেতার বার্ত্তার পর আর তাহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায়না। পরদিন ফরাসী আল্পস্ পর্ব্বতের একটা অপেক্ষাকৃত নীচু চড়ার সহিত ধাক্কায় চূর্ণ হওয়া অবস্থায় তাহাদের পাওয়া যায়। দুর্ঘটনার পর আরোহীদের মধ্যে কেহই জীবিত ছিলেন না। করাচী বিমানপোতের বিরাট হ্যাঙ্গার এই এয়ার-শীপের জন্য বানান হইয়াছিল। দুর্ঘটনার পর বিলাতে এই এয়ারশীপ বানান একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

এইভাবে ছয়মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। মোল্লার অধিনায়কত্বে ও মুলতানী হিন্দু পাচকের রান্নার গুণে শরীরের ওজন বৃদ্ধির দিকেই ছিল। খুব সম্ভব মোল্লা আমাদের উপর দরদ বোধ করিত, বিশেষতঃ আমার উপর একটু বেশীই। বিমান তৈয়ারীর কারখানায় কি কাজ করিতাম সে তথ্য হয়ত মোল্লার জানা ছিল না কিন্তু সে দেখিত অন্য দুইশত বৈমানিদের সাথে দুইবেলাই কারখানায় যাওয়া আসা আর ছাউনিতে আসিয়া এদের তদারকি করা, আর রসুই ঘরের সমস্ত খুঁটিনাটি কোন অবহেলা না করিয়া বহন করা —অনেক সময় কারণ থাকিলেও উহা প্রকাশ না করিয়া। এত সব দেখিয়া মোল্লা হয়ত যথেষ্ট সমীহ করিতে আরম্ভ করিল। কখন কখন রাত্রি নয় দশটার সময় টেন্টের মধ্যে লণ্ঠনের আলোতে পড়াশুনা করিতেছি,—টেন্টের বাহির রাস্তায় বিজলী আলো ঝলমল করিত, কিন্তু টেন্টের মধ্যে লণ্ঠনের আলো নিষ্টিমিষ্ট করিয়া জ্বলিত—তখন মোল্লা টেন্টের ভিতরে আসিয়া হুজুর বলিয়া লম্বা সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বসিতে বলিলেও কিছুতেই বসিত না। অনেক বার বলিলে শুধু বালুর উপর বসিয়া পড়িত, আর বলিত হুজুর মস্ত বড় মালিক—মোল্লা ক্ষুদ্র বান্দা হইয়া মালিকের সামনে কেমন করিয়া বসে? বসিবার পর গল্প বলিত, তাহার দেশের গল্প। নানারূপ গল্প। বেশীর ভাগই বদলা লওয়ার গল্প। বদলা মানে প্রথমে বুঝি নাই। কিছুদিন পরে এই

সাংঘাতিক কথার তাৎপর্য্য বুঝিলাম। তাহাদের দেশে প্রত্যেকেই কোন না কোন ক্লানের যেমন আফ্রিদী বা মোমন্দ। যখন, যে কোন কারণেই, হউক না কেন, এক ক্লানের কেহ অন্য ক্লানের কাহারও জীবন নাশ করে, তখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ক্লানের কেহ প্রথম ক্লানের কাহাকেও হত্যা না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ক্লানের সবাই ভীষণ অপমানিত বোধ করিবে। হত্যা করার পর অর্থাৎ বদলা লওয়ার পর অর্থাৎ এক জানের বদলে অন্য জান লওয়া হইয়া গেলে, তখন দ্বিতীয় ক্লান প্রথমের সাথে সমানের পর্য্যায়ে উঠিল। এই হত্যার এখন প্রথম ক্লানের অবমাননা হইল, কাজেই তাহাদেরকে প্রতিশোধ অর্থাৎ বদলা লইতে হইবে। এর শেষ নাই। যখনকার কথা বলিতেছি তখন বাদশা খান উত্তর পশ্চিম সীমান্তের কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী আর সিমান্ত গান্ধীর কথা উঠিলে পাঠানরা সসম্ভ্রমে উঠিয়া সালাম করে। যাহা হউক, মোল্লার মতে দুষমন বা হিন্দু সকলেই কাফের, শুধু আমার বেলায় সামান্য প্রভেদ,—কারণ হুজুর হইল মালিক, কাজেই হুজুর কেমন করিয়া কাফের হইতে পারে? সে উল্টা প্রশ্ন করিত। অনেক সময় তাহাদের গ্রাম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন আমি করিতাম। জিজ্ঞাসা করিতাম তাহাদের গ্রামে কোন হিন্দু আছে কিনা? তাহার জবাবে সে বলিত হাঁ, তাহাদের গ্রামে কয়েকঘর হিন্দু ও হিন্দুদের মন্দির ও আছে,—কিন্তু সেই হিন্দুরা কাফের নয়—তাহারা সব পাঠান। এই সরল জবাবের পর আর প্রশ্ন করা চলিত না। বহুবার সে আমাকে তাহাদের গ্রামে 'মেহমান' হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। করাচী ছাড়ার সময় তাহাকে আর বুনতানী হিন্দু ডাকাত পাচককে সংগ্রহ করিয়া আমাদের স্কোয়াড্রনে আনার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু করাচীতে তাহারা অস্থায়ীভাবে ফৌজে নাম লিখাইয়াছিল বলিয়া স্থায়ী স্কোয়াড্রনে তাহাদেরকে বদলি করিয়া আনা গেল না।

(ক্রমশঃ)

KULJIAN'S COMPLETE METALLURGICAL SERVICES

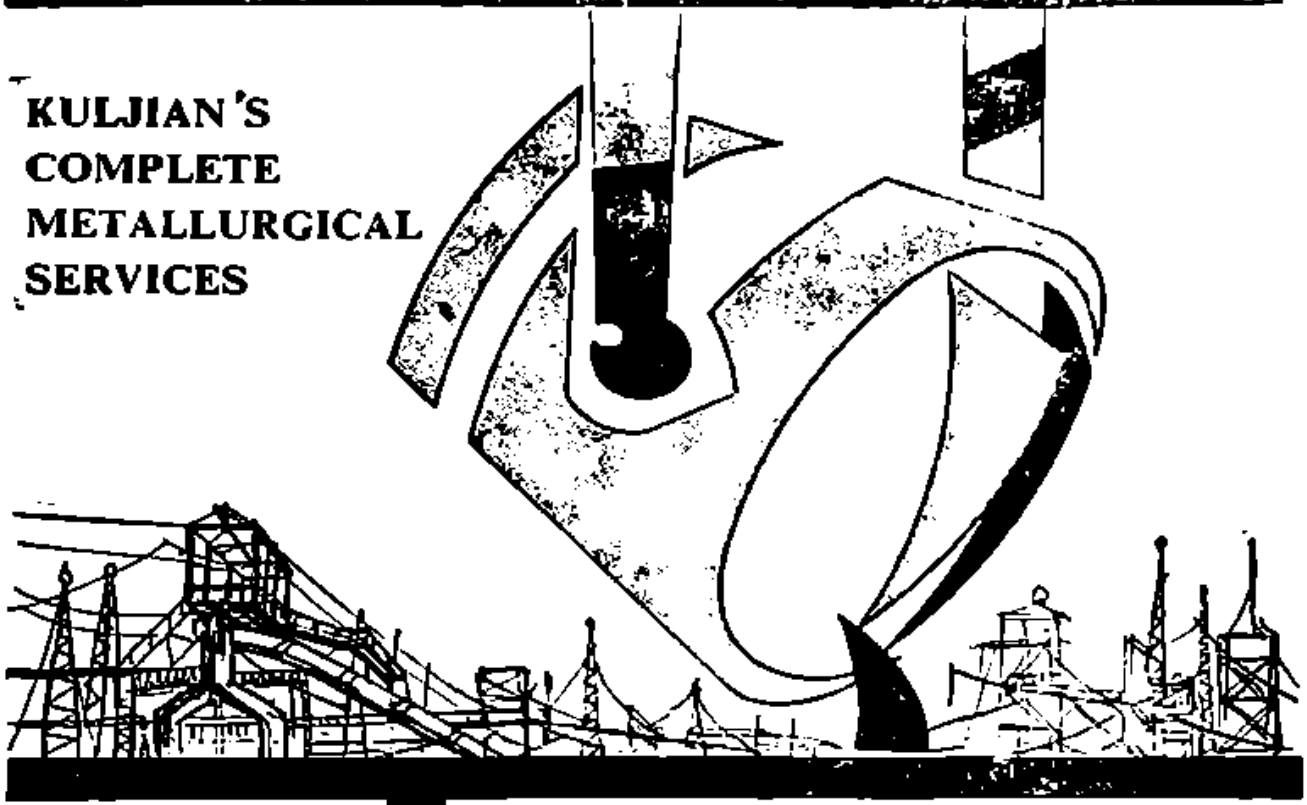

Kuljian-India offers comprehensive consulting engineering in the specialised art of steel-making and steel-shaping. Kuljian's metallurgical services cover the complete spectrum of metals-industry activities—feasibility study and project reports; heavy industrial design, engineering and construction-management, mining and transportation, pelletization and sintering; smelting and refining; finishing and shaping of metals; personnel training heat-up and initial plant operation. ■ Kuljian consultancy is backed by world-wide experience. If you have an iron or a steel project, entrust it to Kuljian.

INTEGRATED STEEL PLANT ★ BLAST FURNACE IRON PLANT ★ ALLOY STEEL PLANT ★ EXTRACTIVE METALLURGY ★ NON-FERROUS METALLURGICAL PLANT ★ FOUNDRIES AND MACHINE SHOPS

AN INDO-AMERICAN JOINT ENTERPRISE

The Kuljian Corporation (India) Private Ltd

CONSULTING ENGINEERS

24-B, PARK STREET, CALCUTTA-16

God is infinite possibility. Therefore Truth is never at rest; therefore, also, Error is justified of her children.

—Sri Aurobindo

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

PHONE : 31-2665 GRAM : Boxboard

With Compliments of : —

INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,

57, Radhabazar Street,
CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA-33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

OFFICE PHONE:
22-4972.

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

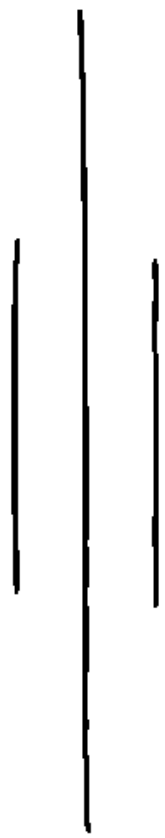

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

Telegrams: 'Vessel' Cal
Codes { Scotts 10th. Ed.., A. B. C. 5th. Ed., Bentley's

Telephones { Office : 23-1393 Dock Office: Residence: { 55-6464 55-3724 55- 503

SARAT CHATTERJEE & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS

3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Regular Services:

AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of:

LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO., LTD.
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম জীবন-কথা

[শ্রীনারায়ণপ্রসাদ লিখিত "Life in Sri Aurobindo Ashramএর অনুবাদ]

পশুপতি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনূদিত

দাম ছয় টাকা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই সাত টাকা

হাবড়া "মাতৃমন্দির" হইতে প্রকাশিত এবং
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে (পণ্ডিচেরী) ও
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে (১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২) প্রাপ্তব্য।

Very often it so happens that the things a man does not really need are just the things that cause him most harm.

—The Mother

BENGAL IMMUNITY

COMPANY LIMITED

CALCUTTA-13

!! নূতন প্রকাশিত !!

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের

কবির্মনীষী (দুই খণ্ড)

বেদমন্ত্র

উপনিষদ-কাহিনী

রবীন্দ্রনাথ

সমীরকান্ত গুপ্তের

মনের মন মুকুর

দাম ৩.৫০ টাকা

[দার্শনিক, কবি, চিত্রকর, সুরশিল্পী, বৈজ্ঞানিক, কর্মবীরের
জীবন থেকে অসামান্য কাহিনীমালা]

The value of our actions lies not so much in their apparent nature and outward result as in their help towards the growth of the Divine within us.

—Sri Aurobindo

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone . 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

Eliminate egoism in all its form; eliminate it from every movement of your consciousness.

—Sri Aurobindo

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 **TELE: 'Kenabecha'**

Statement about ownership and other particulars about Newspaper BARTIKA to be published in the first issue every year after last day of February

Form IV
(*See Rule. 8*)

1. Place of Publication:	Pondicherry
2. Periodicity of its publication:	Quarterly
3. Printer's Name: Nationality Address	Amiyo Ranjan Ganguli Indian Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2.
4. Publisher's Name: Nationality Address	H K. Niyogi Indian Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry-2.
5. Editor's Name: Nationality Address	Nolini Kanta Gupta Indian Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry-2.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	Sri Aurobindo Ashram Trust. Pondicherry-2

I, H. K. Niyogi , hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date 24th April, 1967

H. K. Niyogi
Signature of Publisher

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্ত্তিকা

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও দর্শন বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

13 MAY 1987

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির প্রকাশনা

মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৩.৭৫
শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্ত্তমান জগৎ	শ্রীঅনিলবরণ রায়	২.০০
কবির্মনীষী	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·৫০
রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)		৫·০০
সাধনার জীবন	শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	১২.৫০

: শ্রীঅরবিন্দ :
বিবিধ রচনা

মূল বাংলায় লেখা পুরাতন খাতাপত্র হইতে সংগৃহীত ও প্রথম মুদ্রিত

মূল্য	১.৫০
ভারতের নবজন্ম	১.৫০
কর্ম্মযোগী	১.৫০
জগন্নাথের রথ	১.০০
গীতার ভূমিকা	২.০০
শ্রীঅরবিন্দের পত্র	১.০০
পত্রাবলী	১.৫০
দিব্য-জীবন (দুই খণ্ডে সমাপ্ত)	১ম খণ্ড ৮.০০ : ২য় খণ্ড ১৪.০০

: শ্রীমা :
উত্তম রহস্য

[একাঙ্ক নাটিকা]

রাজনীতিজ্ঞ, লেখক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী ও ব্যায়ামী দু'জনের ছ'টি আত্ম-কাহিনী ও তার উপসংহার

মূল্য	১.০০
ছোটদের শ্রীমা	১.৫০
পুরাণো লেখা	১.৫০
শিক্ষা	১.৫০
মায়ের আলাপ	২.৫০

I. Loving Homage — Rs. 10/-

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

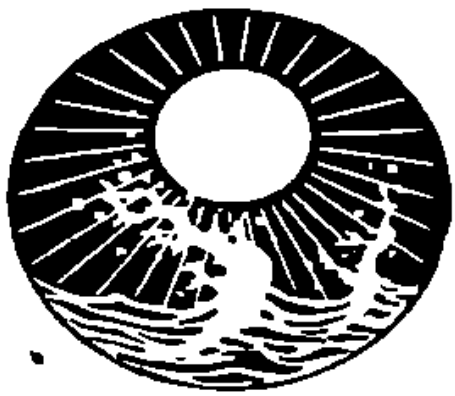

১৫ই আগস্ট, ১৯৬৭

বর্ষ – ২৭ সংখ্যা

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৭)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

মাতৃবাণী		১
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী		৪
মায়ের ধ্যান ও প্রার্থনা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৯
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	১৯
প্রসঙ্গত	শ্রীমা	২৭
পথের কথা	শ্রীমা	৩০
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	৩৪
বিলাতের ডায়েরীর কয়েক পাতা	এ. বি. পুরাণী	৪৭
ছন্দ ও গতি (অনুবাদ)	সত্যেন চট্টোপাধ্যায়	৫৬
কঠিন ডালায় ওড়া	বীরবাহু	৬১

বর্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় পাঠাইবে। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	৬০.০০	বার্ষিক	২০০.০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫.০০		১২০.০০
প্রতি সিকি পৃষ্ঠা	২৫.০০		৮০.০০
ভিতরের মলাট	১০০.০০		৩২০.০০
বাহিরের মলাট	১২৫.০০		৪০০.০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম দেড় টাকা

Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Edited by : NOLINI KANTA GUPTA
Printed by : AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2
PRINTED IN INDIA

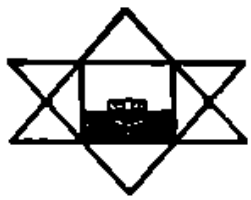

আগষ্ট ১৫, ১৯৬৭

যাই ঘটুক না, ভাগবতী শক্তি সর্বদা পিছনে থেকে কাজ করে চলেছে—একদিন হয়ত যখন কোন সুরুক আশাই করা যায়নি, বাধা ভেঙ্গে যায়, মেঘ উড়ে যায়, ফিরে আবার দেখা দেয় আলো, ফুটে ওঠে সূর্য। সেরকম অবস্থায় সবচেয়ে ভাল হবে, যদি তা করতে পার, অস্থির না হওয়া, হতাশ না হওয়া—শুধু শান্তভাবে প্রসারিত রাখা, নিজেকে খুলে ধরা, প্রসারিত করা আলোর দিকে তার আগমনীর অপেক্ষায়। এতে আমি দেখেছি অগ্নি-পরীক্ষার কাল হ্রাস পায়।

—শ্রীঅরবিন্দ

মাতৃবাণী

শ্রীঅরবিন্দ অতীতের নয়, ইতিহাসের নয়, শ্রীঅরবিন্দ হলেন ভবিষ্যৎ, যে ভবিষ্যৎ চলেছে তার সিদ্ধির দিকে। সুতরাং চিরন্তন যৌবন আমাদের ধারণ করতে হবে যাতে আমরা প্রয়োজনীয় বেগে এগিয়ে চলতে পারি যাতে পিছনে পড়ে থাকতে না হয়।

শ্রীঅরবিন্দের চেতনায় আকস্মিক সংযোগ বলে কিছু নেই। যা কিছু ঘটে সবই হ'ল ভাগবত চেতনার ক্রিয়াফল।

যে শক্তি বর্ত্তমানে কাজ করে চলেছে তা হ'ল সম্মিলনী শক্তি, তার লক্ষ্য একত্ব—ভাগবত সত্যকে প্রকাশ করে যত রূপক তাদের সকলের ঐক্যসাধন।

বস্তুতঃ সকল জিনিষের মধ্যে যে সম্ভাব লুকিয়ে আছে তা ব্যক্ত হয় তারই কাছে যার চেতনায় বয়ে চলে সম্ভাব।

এ হল অনুভবের একটা গঠনমুখী ধারা যা সোজা নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে।

সর্ব্বদা আস্পৃহা ধরে রাখা, সর্ব্বদা অনুভব করা ভগবৎ-সান্নিধ্য তুমি যে স্থানে বা যে আবেষ্টনে রয়েছ তার উপরে নির্ভর করে না। তা নির্ভর করে অন্তরের আন্তরিকতার উপর।

অগ্নি-পরীক্ষা রয়েছে সকলের জন্যই, তবে কিভাবে তার সম্মুখীন হওয়া যায়, জনে জনে পার্থক্য সেখানে। কারও মুখে থাকে হাসি, কেউ বা তুলে দেয় তুমুল কোলাহল।

তারুণ্য অর্থ ভবিষ্যতের মধ্যে জীবনযাপন।

তারুণ্য অর্থ যা হয়ে আছি বর্ত্তমানে তা পরিত্যাগ করে যা হওয়া উচিত তার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা।

তারুণ্য অর্থ অসংশোধনীয় বলে কিছু আছে স্বীকার না করা।

সত্যকার সত্য কি এখানে তা কেউ জানে না।

প্রত্যেকে কথা বলে যেন সে জানে কিন্তু ফলতঃ কেউ জানে না।

সকলের কাছে সত্য যদি ব্যক্ত হয়ে পড়ে তাহ'লে বেশির ভাগ লোকই, এখানেই হোক আর যেখানেই হোক, আতঙ্কিত হয়ে উঠবে অদের অজ্ঞানের আর ভ্রান্ত ব্যাখ্যার আয়তন দেখে।

আমি তাই সবাইকে পরামর্শ দিই বরং শান্ত হয়ে থাকতে, কোন রকম সিদ্ধান্ত না করে বসতে। এই হ'ল সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট পথ।

সত্যকার বিজ্ঞতা হ'ল যে কোন সূত্র হতে জ্ঞান আসুক না তা গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত থাকা। আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি একটি ফুল হতে, একটি প্রাণী হতে, একটি শিশু হতে যদি আমাদের সর্ব্বদা আগ্রহ থাকে আরো জ্ঞানলাভের জন্য। ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র শিক্ষক পরম ভগবান, তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন সকল জিনিষের মধ্য দিয়ে।

মানুষের মধ্যে ভগবান ঢাকা পড়ে রয়েছেন মানুষের মানস ক্রিয়াবলির পিছনে। প্রকৃতির মধ্যে তাই তুমি বেশি সহজে অনুভব করতে পার তাঁকে। কিন্তু ভগবান উপস্থিত রয়েছেন সর্ব্বত্র।

কেউ যদি তোমাকে ভালবাসে সে ভালবাসা তোমাকে সুখ এনে দিতে পারে না। তুমি যদি অপরকে ভালবাস সেই ভালবাসাই তোমাকে সুখী করতে পারে। যে ভালবাসা তুমি দান কর, সে ভালবাসা তুমি গ্রহণ করেছ ভগবানের কাছ থেকে। ভগবানের ভালবাসা চিরন্তন, অব্যভিচারী।

শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীতে এসেছেন এমন একটা শিক্ষা বা সিদ্ধান্ত এনে দেবার জন্য নয় যা পূর্ব্ববর্তী শিক্ষা বা সিদ্ধান্ত সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবে; তিনি এসেছিলেন এমন একটা পথ দেখিয়ে দিতে অতীতকে যে অতিক্রম করবে, বাস্তবে খুলে দেবে সেই পথ যা নিয়ে চলে আসন্ন এবং অনিবার্য্য ভবিষ্যতের দিকে।

অতীত হল একটা প্রস্তুতি আর এখনও মানবজাতির অনেকখানি অংশেরই প্রস্তুত করে তুলবার প্রয়োজন আছে।

শ্রীঅরবিন্দ সাহায্য দেন সকলকে সমানে, কিন্তু প্রত্যেকেই গ্রহণ করে আপন আপন যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে।

অতীতকে অতিক্রম করে চলবার জন্য প্রস্তুত যারা, ভারমুক্ত হয়ে যারা চলবে ভবিষ্যতের দিকে তারা আরও সত্বর লক্ষ্যে পৌঁছবে।

কিন্তু সাহায্য রয়েছে সকলেরই জন্য, সকলেই স্বাগত।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা বুঝতে হলে অনুসরণ করতে হ'লে সকল বৈপরীত্যের উপরে উঠে যেতে হবে।

যারা সত্যের সেবক তারা কোন পক্ষই গ্রহণ করতে পারে না।

সত্য হ'ল দ্বন্দ্বের বৈপরীত্যের ঊর্দ্ধে।

সত্যের মধ্যে সকল দেশই সম্মিলিত, তাদের সমবেত চেষ্টা ক্রমোন্নতির দিকে, পূর্ণ সিদ্ধির দিকে।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন পৃথিবীচেতনায় অতিমানস যখন নেমে আসবে, তখন কি বিপর্যয় সব, অনুরূপ দুর্ঘটনা সব ঘটবে না?

উত্তর ঘটবেই যে তা নয়। বিপুল পরিবর্ত্তন সব নিশ্চয়ই হবে কিন্তু তার অর্থ যে প্রলয় তা নাও হতে পারে। অধিমানস শক্তিদের থেকে একটা দৃঢ় চাপ যখন আসে পরিবর্ত্তনের জন্য তখন তা প্রলয়কারী হওয়াই সম্ভব কারণ সেখানে শক্তিসকলের মধ্যে ঘটে একটা প্রতিরোধ ও সংঘর্ষ। অতিমানসের আছে নিমিষের উপর একটা বিপুলতর—আর যখন সে পূর্ণ তখন একটা পরিপূর্ণ—কর্তৃত্ব আর সমন্বয় সাধনের এমন এক সামর্থ্য যা সকল বাধা সরিয়ে দিতে পারে নাট্যসুলভ সংঘর্ষ ও বলাৎকারের সহায় না গ্রহণ করেও।

প্রশ্ন : বেছে নেওয়া অপরিহার্য্য কেন?

উত্তর কারণ শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে "দেব-মুহূর্ত্তের" কথা আমরা এখন সেই এক মুহূর্ত্তে। যার যে বিবর্ত্তন-ধারা জগতকে রূপান্তর করে চলেছে তা লাভ করেছে ক্রততর তীক্ষ্ণতর গতি।

প্রশ্ন মানুষের মধ্যে চৈত্যসত্তা (Psychic Being) বলতেই বুঝায় কি সমগ্র অন্তরাত্মা? অথবা অন্তঃপুরুষ (যা মূলতঃ হ'ল সকল জীবের মধ্যে ভাগবত-স্ফুলিঙ্গ) আর চৈত্যসত্তা উভয়ে একসঙ্গেই রয়েছে?

উত্তর : অন্তঃপুরুষ হ'ল চৈত্যসত্তার কেন্দ্রগত চিরন্তন সারবস্তু। অন্তঃপুরুষই ফলতঃ হ'ল এক ভাগবত স্ফুলিঙ্গ, নিজেকে সে ঘিরে রাখে ক্রমে ঘনতর সত্তার বহু স্তর দিয়ে, সর্ব্বশেষে জড়তম স্তর, তার স্থান এই শরীরের মধ্যে বলা যায় মণিপুর চক্রের অন্তরে। সত্তার এই সব স্তর গড়ে ওঠে বেড়ে চলে এগিয়ে যায় ক্রমে ব্যষ্টিরূপ ধারণ করে, আপন উৎকর্ষ সাধন করে পৃথিবীতে বহুতর জন্মের ভিতর দিয়ে এবং হয়ে ওঠে চৈত্যসত্তা। চৈত্যসত্তা যখন পূর্ণগঠিত হয় তখন অন্তঃপুরুষের চেতনায় সচেতন হয় এবং তাকে পূর্ণ প্রকাশ করে ধরে।

ছোটদের জন্য

সাধারণতঃ বানানের জন্য চোখের সাহায্য গ্রহণ করবে। প্রত্যেক শব্দটির থাকবে নিজের একটা আকার, চোখ তাকে স্মরণ করে রাখবে, চাক্ষুস স্মৃতি মানস স্মৃতির চেয়ে বেশি কার্য্যকরী।

আর পড়বে অনেক অনেক বই,

চেয়ে দেখবে বোর্ডে, বইএ, ছবিতে—

আর লেখার ধরণ এমন কি ব্যাকরণ এবং তার নিয়মকানুনের জন্যে শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল পাঠ করা, অনেক কিছু পাঠ করা—ও সব জিনিষ যাতে অবচেতনার মধ্যে প্রবেশ করে। এই হ'ল শিক্ষা করবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী

(৩)

(সাবিত্রী উঠে চলেছে আরো উত্তর লোকে স্বর্গের ও-পারে আরো স্বর্গে—আনন্দ প্রবোধ উজ্জ্বল আরো বিপুল প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে—বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ উচ্ছল নিবিড় রাস-লাস্য।)

সাবিত্রীর দৃষ্টি ঊর্দ্ধে ধেয়ে চলে,
বিপুল সুনীল উন্মুক্ত তোরণ পার হয়ে
প্রবেশ করে উত্তর আলোকের প্রসারে—
জানে সে এ তবু শোভাশ্লিষ্ট অলংকৃত দ্বারশ্রেণী
নিয়ে যায় আরো মহত্তর আরো সহজসুন্দর জগতের মাঝে।
অফুরন্ত এ সব স্বর্গের উত্তরণ-আশ্রয়,
সাবিত্রীর ঊর্দ্ধপ্রসারী দৃষ্টি
ধরে দেয় রাজ্যের পর রাজ্য।
তারপর মনে হয় যেন উত্তরণের শেষ শিখর,
সান্ত আর অনন্ত অভিন্ন সেখানে ;
দেখল সাবিত্রী বীর অমরদের অক্ষত আসন,
তাদের জীবন স্বর্গীয় আনন্দের জন্যে, রাজত্বের জন্যে,
অনির্বাণ কিরণলেখার অন্তরীক্ষ লোক সব এখানে।
শ্রেণীর পর শ্রেণী প্রদূর্ত্ত দেবতারা আসীন তাদের অমরত্বে,
সাবিত্রীর দিকে আনত এক অনাগত ভবিষ্যদৃষ্টি,
স্ফটিক-শুভ্র আগুনের স্বচ্ছতা পার হয়ে।
স্বর্গের অপ্সরাকুল পরিবেশন করে শাশ্বতের মদিরা
বরতনু তাদের গড়ে দিয়েছে আনন্দ-লহরীর রেখাবলি,
মোহন-মধুরিমার অঙ্গ-সব ধরে রাখে শুদ্ধ উল্লাস ;
পদভার আলোকমালা ছড়িয়ে চলে,

মানসলোকের সূর্য্য-শিলাখণ্ডে গাঁথা
প্রাঙ্গনের পরে ;
উদ্ভাসল দেহসব রয়েছে জট বেঁধে ওতপ্রোত,
চিন্ময় সত্তা যত আবেগভরে এঁকে যায়
নিবিড় গাঢ়বদ্ধ আনন্দের আলিঙ্গনধারা,
নিত্য-নিলিত জীবনের সুষম গতিচ্ছন্দে
অতীন্দ্রিয় পুলকের একান্ত আবেগভরে ;
সূর্য্যরশ্মি তারা জাগ্রত জীবন্ত দেবতা,
স্বর্ণস্তনী স্বর্গের অপ্সরাকুল,
কুন্তলাঙ্কে প্লাবন নেমেছে যেন আনন্দের শুভ্র বারি হতে ;
প্রোদ্ভাসল ইন্দ্রনীল স্বপনের মাঝে ভেসে চলে,
হিরণ্ময় অঙ্গ তাদের দীপ্ত করে ধরে
তাদের মেঘাকার আবরণ
উদ্ভাসল পদসঞ্চারে চলে যাদুকর বেলাভূমি পরে,
উদ্দাম সারল্যের নিষ্পাপ গতিবেগে,
জানে তারা, অবাধ বিলাস তাদের, নটরাজের নৃত্য—
ঘূর্ণ্যমান আলিঙ্গন যেন হৃদয়ের জ্যোৎস্নাস্নাত রভসলাস্যে।
নির্ভুল রূপাবলির নির্দ্দোষ শিল্পী তারা,
ধ্বনির আর ছন্দিত বাক্যের যাদুকর নির্ম্মাতা।
অনিল-কুন্তল গন্ধর্ব্বেরা গায় মধুক্ষরা
স্তবস্তুতি, বিশ্বচিত্তাকে চলে রূপ দিয়ে,
শ্লোকাবলি যত খুলে ধরে ভগবানের মুখের অবগুণ্ঠন,
ছন্দ যত বয়ে আনে জ্ঞানসাগরের কলরোল।
মৃত্যুজয়ী কায়া সব, ভাস্বর ললাট,
মহান আমাদের পিতামহেরা করে বিচরণ ঐ মহাদীপ্তির মাঝে,
অশেষ শক্তিময় পূর্ণজ্যোতির্ম্ময়
তাদের অধিকারে সব সার্থকতা যার অন্বেষণে
ব্যর্থ চেষ্টা আমাদের।
উত্তর দ্রষ্টা আপ্তবাক্ কবি—সাক্ষাৎ দেখে তারা
শাশ্বত চিন্তাধারা,

নেমে আসে ঊর্ধ্ব হতে পথযাত্রী যেন,
আসে আমাদের কাছে, যায় বিকৃত হয়ে, হয় বিকারগ্রস্ত
আমাদের সন্ধানের ফলে, হয় প্রতারিত
ছদ্মবেশী মনের কাছে ;
দেবতা যত বিকলাঙ্গ মর্ত্যজন্মের বেদনায়,
তাঁরা ধারণ করেছিলেন মহাবাক্য, এখন পরিণত যা ক্ষীণ স্বরমাত্রে,
পার্থিব কণ্ঠে উচ্চারিত ক্লিষ্ট পুলকের মাঝে ;
স্খলিতপদে চলে যারা, ভ্রষ্ট নিপতিত, বীর তারা ছিল একদিন
প্রশান্ত সমুন্নত দেবতা।
সাবিত্রীর মানুষী প্রকৃতি মূর্চ্ছা যায় স্বর্গের পুলকে—
ঔজ্জ্বল্যে আগুনে বিদ্যুৎ-পরিপূর্ণ যেন সেখানে এখন,
দাক্ষিণ্যে সত্যদর্শনের তরঙ্গ-ভঙ্গে বিগলিত,
বীণা যেন ঝংকৃত, অপরের আনন্দে আপনি স্পন্দিত,
অজানা পুলকের তন্ত্রী করে তারে আকৃষ্ট।
দেখে সে পৃথিবীর আলিঙ্গন অপগত তার,
ধারণ করে সে অসম্বৃত প্রেমের অবিনাশী দৃষ্টি ;
আরও উঠে চলে, উত্তীর্ণ স্তরের পর স্তরে,
কণ্ঠে যা উচ্চারণ করে না মন যার স্বপ্ন দেখে না তার ওপারে
প্রকৃতির ঘূর্ণির চূড়ায় অনন্ত বিস্তৃত রয়েছে জগৎ সব,
বৃহত্তর এক প্রশান্ত মাধুর্য্য সেখানে,
সূক্ষ্মতর গভীরতর ব্যোম প্রসার,
বিপুলতর পরিকল্পনা, দিব্যতর ইন্দ্রিয়েরও অলভ্য ;
নিশ্বাস সেখানে বয়ে চলে দৃষ্টিমান মানস প্রবাহ
রূপ হ'ল অন্তরাত্মার স্বচ্ছ আবরণ
রং হ'ল উল্লাসের সুদৃশ্য ভঙ্গিমা,
দৃষ্টিতে ধরা দেয় জড়ের অতীত আকারমালা
স্পর্শগ্রাহ্য বিলাসভোগ্য তবু তারা
ইন্দ্রিয়গত হয়ে যেন স্থূলহস্তে স্পর্শ করে অন্তর্যামীরে।
ইন্দ্রিয় এখানে ঊর্দ্ধায়িত পরিশুদ্ধ প্রদীপ্ত
আন্তর জ্যোতির্লেখার সুখী অনুগত ভৃত্য,

প্রতিটি অনুভব শাশ্বতের বীরসন্তান,
প্রতিটি চিন্তা মধুময় সমিদ্ধ দেবতা;
বাতাস সেখানে ভাস্বর অনুভব, প্রতিটি ধ্বনি স্ফুট কণ্ঠ এক,
অন্তঃপুরুষের দৃষ্টি সূর্য্যালোক যেন, জ্যোৎস্না হ'ল স্বপ্ন তাঁর;
নির্ব্বাক প্রশান্তির জীবন্ত এক বিশাল প্রতিষ্ঠা;
সকলই এখানে সবর্ণ সুনির্ম্মল পুলক।
সাবিত্রীর চেতনা এই সব শিখর বেয়ে উঠে চলে গেল
ঊর্দ্ধগামী বিহঙ্গের মত, অদৃশ্য হয়ে চলে যায়
ঊর্দ্ধগামী হৃদয়ের স্পন্দনে কণ্ঠ তার মিলিয়ে ধরে,
ক্রমে পক্ষ তার নিমীলিত হয়ে যায় থেমে যায়,
এক শেষ শিহরণের পরিতৃপ্তি নিয়ে ফুকারিয়া ওঠে
তারপর হয়ে যায় নীরব নিথর
আতুর আত্মাকে নিঃশেষ ঢেলে দিয়ে
হৃদয়ের আনন্দভার হতে মুক্তি লভে।
নবনব অভিজ্ঞতা উঠে চলে পুলকের রঙ্গীন বক্ষ বেয়ে
চলে ঘুরে ফিরে অগম্য মণ্ডলী অভিমুখে।
কাল সেখানে শাশ্বতের সঙ্গে একীভূত;
বিপুল পুলক মিশে যায় আনন্দঘন প্রশান্তির মাঝে।

মায়ের ধ্যান ও প্রার্থনা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

(১)

মায়ের ধ্যান ও প্রার্থনা সম্বন্ধে কিছু বলব আজ। তোমাদের পরিচিত বই, যাদরের বই। কেন আদর করি, কেন সমাদর করি, তাই একটু বুঝতে চেষ্টা করব। বুঝলে আদরটা হয়ত আরও একটু গাঢ়, সমাদরটা আরও একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

মায়ের প্রার্থনায় মোটামুটি তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়—তিনটি সুর বা ভঙ্গিও বলতে পারি। প্রথমত: দার্শনিক সুর, অর্থাৎ মা জিনিষটি যখন বুঝিয়ে বুদ্ধিগত করে ধরে দেখিয়েছেন, মনের পক্ষে স্পষ্টভাবে গ্রহণীয় করে দেখিয়েছেন—এই যেমন—

"চেতনার কত না স্তর, আর কত বিভিন্ন রকমের। তবে ঐ শব্দটি শুধু সেই জিনিসটির জন্য ব্যবহার করা উচিত জীবের অন্তরে যা, হে ভগবান, তোমার সান্নিধ্যে আলোকিত, যা তোমার সঙ্গে একীভূত, তোমার পরাচেতনার অঙ্গীভূত, সেই জিনিসটির জন্য যার আছে জ্ঞান, যা বুদ্ধের কথায় "সম্যক্ সম্বুদ্ধ"।

এই অবস্থা ছাড়াও চেতনার অনন্ত স্তর রয়েছে। সর্ব্বনিম্ন স্তরে চেতনা নেমে গিয়েছে পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে, যা সত্যসত্যই অচেতনা, এমন একটা রাজ্য যাকে তোমার দিব্য প্রেমের আলো এখনো স্পর্শ করেনি (জড়ের মূলবস্তু সম্বন্ধে এ কথা অসম্ভব বলেই মনে হয় যদিও) অথবা তা এমন একটা জিনিস যা কোন না কোন অজ্ঞানের জন্যে রয়ে গেছে আমাদের ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের জগৎ থেকে বাহিরে।" ১৩।৩।১৪

কিংবা আরও একটি:

"কি কাজ মানুষকে দিয়ে যদি সে না হয়ে থাকে একটা সেতুবন্ধের মত—একদিকে শাশ্বত সত্তা যা কখনও প্রকাশ পায়না আর একদিকে যা প্রকাশ পেয়েছে, এই দুয়ের মধ্যে; একদিকে যত উত্তর ঐশ্বর্য্য, দিব্যজীবনের মহিমা, অন্যদিকে জড়জগতের যত তমসাচ্ছন্ন বেদনাতুর অজ্ঞান? মানুষ হ'ল যা হওয়া উচিত আর যা হয়েছে, এই দুয়ের সংযোগ সূত্র; গন্তব্যের মুখে প্রসারিত সাঁকো, সে একটা মহা ক্রুশ-চিহ্ন (cross) যেন, বাহুচতুষ্টয়ের সঙ্গম স্থল। তার সত্যকার আবাস, তার চেতনার শক্তিপীঠ হ'ল এক মধ্যবর্ত্তী জগৎ, যেখানে ক্রুশের চারিটি বাহু এসে মিলেছে, যেখানে

অচিন্ত্যের আনন্দ ক্রমে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করেছে, অগণিত প্রকাশের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করে দেবার জন্যে।" ২৯।৮।১৪

অথবা এই যেমন—

"সত্যকে নিয়ে আমরা যা ভাবি না কেন, যা বলি না কেন, সত্য চিরকালই তার বাহিরে থেকে যায়। সত্যের সঙ্গে যতখানি সম্ভব মিল থাকে অন্বয় থাকে সত্যের এমন সংজ্ঞা আবিষ্কারের চেষ্টা প্রয়োজন বটে এবং অপরিহার্য্যও যদি নিজের ব্যক্তিগত এবং মানুষের সমষ্টিগত উন্নতি সর্ব্বাঙ্গীন করে তুলতে হয়। তবুও এই সংজ্ঞা সম্বন্ধে সর্ব্বদা অনুভব করা চাই যে তা থেকে নিজে আমি মুক্ত, অনুভব করা চাই চেতনার কেন্দ্র রয়েছে তার উর্দ্ধে, সেই সম্ভবের মধ্যে যা তার একটা মানস সংজ্ঞার মহত্ত্ব সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠব সত্ত্বেও তাকে অতিক্রম করে যাবেই। আমরা যে রকমটি চিন্তা করি জগৎ সেরকমের ঠিক নয়।" ১০।১২।১৪

কিংবা—

"একবার যখন পার হয়ে এসেছি তোমার বিশ্বচেতনার রাজ্যে তারপর প্রতিবারই যখন ফিরে যাই মানস-রাজ্যে, তখন দেখি সেখানকার প্রত্যেক চিন্তাই হ'ল একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব অতল-স্পর্শ অপরূপ সমস্যা।

উর্দ্ধে কোন প্রশ্ন নাই, নিস্তব্ধ নীরবতার মধ্যে সব কিছুই জানা থাকে চিরকাল ধরে, নীচে সবই অভিনব, অজ্ঞাত, অপ্রত্যাশিত।" ৯।৪।১৭

কিন্তু আমরা দেখছি দার্শনিকভাবে কথা বলতে বলতে মায়ের এসে গিয়েছে আর একটা সুর বা ভঙ্গি যাকে আমি বলব যোগের বা সাধনার সুর। কেবল বুদ্ধি দিয়ে বোঝা নয়, তাকে কাজে ফলিয়ে ধরতে হবে, জীবনে প্রকাশ করতে হবে, কি রকমে, কোন পথে, কোন প্রক্রিয়া ধরে, সেই তথ্য সেই সত্য মা দেখিয়ে দিয়েছেন। এই যে বললাম, "একবার যখন পার হয়ে এসেছি তোমার বিশ্বচেতনার রাজ্যে, তারপর প্রতিবারই যখন ফিরে যাই মানস-রাজ্যে, তখন দেখি সেখানকার প্রত্যেক চিন্তাই হ'ল একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব অতল-স্পর্শ অপরূপ সমস্যা।" এটি যোগেরও ধারা। ফলতঃ দর্শন ও যোগ হাত ধরাধরি করে চলে। দর্শনের নিভৃত সত্য হ'ল সাধনা। দর্শন তথ্য বিবৃত করে, সাধনা বলে তার প্রয়োগের কথা। দর্শনের ধারা আর সাধনার ধারা মিলে মিশে ওতপ্রোত হয়ে চলেছে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের মত একটা পরম ঐকতানে।

এই যেমন—

"অসংখ্য মত ঘটনারাজির সংস্পর্শে আমাদের আসতে হয় তাদের ছাপ সব ধরে রাখতে আমাদের অবচেতনায় নিরন্তর যে কাজ চলেছে, তাই হল তোমার নীরব

ধ্যানের সবচেয়ে বড় শত্রু। যতক্ষণ আমাদের মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকে ততক্ষণ আমাদের জাগ্রত চিন্তার অন্তরালে যত এই গ্রহীষ্ণু অবচেতনার একান্ত কর্মচাঞ্চল্য আমাদের কাছে ঢাকা থাকে....” ২৫।১১।১৩

অথবা—

“একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিষ, একমাত্র যার মূল্য আছে, তা হ'ল, সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করা যেন তোমার সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারি, তোমার পরা-চেতনার সঙ্গে আমাদের চেতনাকে যুক্ত করে দিতে পারি, যাতে তোমার ঐশী বিধানের, তোমার প্রেমপূর্ণ ইচ্ছাশক্তির হয়ে উঠতে পারি প্রশান্ত স্থির নিঃস্বার্থ সমর্থ সেবক।” ২০।২।১৪

আরও—

“প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে হবে একটা নূতন পূর্ণতর উৎসর্গের সুযোগ। সে উৎসর্গ হবে না উত্তেজনাময়, চাঞ্চল্যপূর্ণ, হবে না অতুগ্র; কর্মমোহে অভিভূত—তা হবে গভীর নীরব, তার বাহ্যপ্রকাশ অনাবশ্যক, তবে তা প্রত্যেক কার্যের মধ্যে প্রবেশ করবে, তাকে রূপান্তরিত করবে। আমাদের মন একান্তে শান্ত হয়ে তোমার মধ্যে সর্বদা ডুবে থাকবে, আর এই নির্মল নিঝর থেকেই সকল বাস্তবকে সে দেখবে, দেখবে চঞ্চল নশ্বর বাহ্যরূপের পিছনে রয়েছে অন্বিতীয় শাশ্বত সত্য।” ২১।২।১৪

আর একটি—

“প্রতি মুহূর্তে অতীতকে ঝেড়ে ফেলতে হবে, ধূলোর মত সে যেন খসে পড়ে, প্রতি মুহূর্তে যে নূতন নিষ্কলঙ্ক পথখানি খুলছে আমাদের সম্মুখে তাকে যেন মলিন না করে।” ২৯।১২।১৩

“মাঝে মাঝে নিজের ভিতর তাকিয়ে দেখা ভাল, দেখা ভাল নিজে কেউ কিছু নয়, কিছু করতেও পারে না, কিন্তু পরে যে ভগবান আবার তোমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে হয়, জানতে হয় তুমিই সব, তুমি পার সবই।

তুমি হ'লে আমাদের জীবনের জীবন,
আমাদের সত্তার আলো,
তুমি হ'লে আমাদের ভাগ্যের বিধাতা।” ৩।১।১৪

ঐকতানের কথা বললাম, এ জিনিষটি হ'ল তৃতীয় সুর বা ভঙ্গি—এ হ'ল সৌন্দর্যের বা কাব্যের সুর। এই তিনটি ধারা নিয়ে হ'ল মাতৃবাণীর ত্রিবেণী-সঙ্গম,

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী। মায়ের কথা কেবল দর্শনগত তত্ত্ব নয়, সাধনাগত তথ্য নয়, তা হ'ল পরম সুন্দর কাব্য। তা কেবল বুদ্ধিকে বুঝিয়ে দেয় না, অন্তরে জীবন্ত হয়ে ওঠে না, তা আবার সুন্দর হয়ে প্রিয়রূপ ধরে আসে। উদাহরণের অন্ত নাই, দু'একটি নমুনা দেই—

"তোমার প্রেম উচ্ছ্বসিত দোয়ারের মত সমগ্র সত্তাকে ঘিরে ধরেছে, সকল জিনিষের উপর ছেয়ে পড়েছে। ভগবান, তোমার প্রেম সকল হৃদয়ে প্রবেশ করবে, সেখানে জাগিয়ে তুলবে সেই দিব্য-শিখা যার নির্বাণ নাই, সেই দিব্যসুষমা যার পরিবর্ত্তন নাই, সকল বৈরূপ্য, সকল বৈপরীত্য পার হয়ে সকলের মধ্যে স্থাপন করবে সেই অক্ষয় আনন্দ যা আবার পরম আনুকূল্য।...

১০।৯।১৪

"আধারের অতল-তল অবধি হৃদয় আমার ঘুমিয়ে পড়েছে...

সমস্ত পৃথিবী সচল চঞ্চল, একটা নিরন্তর পরিণামের ভিতর দিয়ে সব প্রাণই সুখ ভোগ করে দুঃখভোগ করে, করে লড়াই, করে জয়, পায় ধ্বংস, আবার গড়ে ওঠে...

আধারের অতল-তল অবধি হৃদয় আমার ঘুমিয়ে পড়েছে... ১০।৪।১৭

"তোমার কণ্ঠ এত নম্র, এত সমদর্শী, এত মহিমাময়, ধৈর্য্যে করুণায় পরিপূর্ণ যে তার মধ্যে হুকুমের স্বেচ্ছা-কর্তৃত্বের রেশ মাত্র নাই, মলয় সমীরণের মত তা স্নিগ্ধ কোমল, নিষ্কম্প ধ্বনির মত, বিসম্বাদী সঙ্গতের মধ্যে সম্মেলনের সুর সে। তবে সে সুর শুনতে পায় যে, সে-বাতাস নিঃশ্বাসে গ্রহণ করতে পারে যে, সে মানুষ সন্ধান পায় এমন সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার, এমন অমল প্রসন্নতার ও সমুচ্চ মহিমার সুরভি যে সকল মিথ্যা-মায়া দূর হয়ে যায় অথবা রূপান্তরিত হয়ে সানন্দে স্বীকার করে নেয় সেই ক্ষণদৃষ্ট মহাসত্যকে।" ২৭।৬।১৩

"শিখা যেমন জ্বলে নীরবে, সুবাস যেমন উঠে ওঠে নিষ্কম্প ভাবে, আমার ভালবাসা তেমনি চলে তোমার দিকে।" ৭।১২।১২

"ভগবান, আগুন যেমন আলো ও উত্তাপ দেয়, ঝরণা যেমন তৃষ্ণা জুড়ায়, তরু যেমন ছায়া ও আশ্রয় প্রদান করে, আমি যেন সেই রকম হতে পারি..." ১৭।৬।১৩

কিন্তু অফুরন্ত অজস্র এ ধারা—

মায়ের কথা শব্দমাত্র নয়, তা হ'ল আসলে মন্ত্র অর্থাৎ ধ্বনির মধ্যে পরিস্ফুট ক'রে শরীরী ক'রে ধরে সত্যকে ও সুন্দরকে, চেতনাকে ও আনন্দকে।

মায়ের বাক্য কাব্যই, কাব্যের সংজ্ঞা যদি হয় রসাত্মক বাক্য আর রসের সংজ্ঞা যদি হয় রসো বৈ স—ব্রাহ্মী চেতনার আনন্দ।

রহস্যময়ী এই বাণী কোন জগৎ আমাদের অন্তর্দৃষ্টিতে খুলে ধরে।

"নিশ্চল প্রশান্ত হে চেতনা, সৃষ্টির সীমানায় দাঁড়িয়ে অতন্দ্র প্রহরী তুমি, সনাতনী রহস্যমূর্ত্তি—তোমার গুপ্তরহস্য তবু ব্যক্ত কর কতিপয়ের কাছে।" ১০।১১।১৪

(২)

মায়ের কথায় আবার আছে আরও তিনটি ধারা, ধারা না বলে এবার বলতে পারি স্তর। কারণ এ একরকম গভীরতার মাপ। আগে বললাম যেন একই স্তরের না প্রসারের মধ্যে যে সুরবৈচিত্র্য বা ছন্দ-বৈশিষ্ট্য তার কথা; এবার বলব অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনার কথা।

মায়ের যে প্রার্থনা—কে করে এই প্রার্থনা? কার কাছে এই প্রার্থনা? মায়ের যে ধ্যান, তার ধ্যানী কে? ধ্যানের ইষ্ট কে?

প্রথমত: ব্যক্ত স্পষ্ট যে অর্থ—এ হ'ল মায়ের নিজের প্রার্থনা তাঁর নিজের ঈপ্সিত ইষ্টের অর্থাৎ ভগবানের কাছে। এ হ'ল মায়ের ব্যক্তিগত ভাব, শরীরী যে মানুষটি তিনি। তাঁর নিজের আস্পৃহা আকাঙ্ক্ষা, তাঁর জিজ্ঞাসা-প্রেরণা, তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি—আপন অন্তরের এই ইতিহাস, এই নিভৃত আত্ম-জীবনী বিবৃত করেছেন, ব্যক্ত করে ধরেছেন। এই যেমন যে কথাগুলি দিয়ে তিনি আরম্ভই করেছেন তাঁর ধ্যান ও প্রার্থনা—

"হে পরম বিধাতা! সকল জীবের যাবতীয় জিনিষের জীবন তুমি, জ্যোতি তুমি, প্রেম তুমি। আমার সমস্ত সত্তা ভাবে তোমার কাছে নিবেদিত বটে, কিন্তু কাজে ছোট খাট সব ব্যাপারে এ নিবেদনের প্রয়োগ আমার পক্ষে এখনও কষ্টকর। আমার এই লিখিত ধ্যানের হেতু ও সার্থকতা ঠিক এইখানে যে, তা প্রতিদিন তোমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এ কথা বুঝতে আমার দরকার হয়েছে, কয়েক সপ্তাহ। প্রতিদিনই তা হ'লে এই রকম তোমার সঙ্গে আমার প্রায়ই যে আলাপ হয় তার কিছু একটু স্থূলরূপ দিয়ে ধরতে পারব। যথাসাধ্য তোমার কাছে সব খুলে বলব—" ২।১১।১২

কিন্তু অনতিবিলম্বেই দেখব আমরা যে এ তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত কথা নয়, নিজের বলতে একান্ত নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকা তাঁর ঘটেনি, তিনি যা বলছেন তা হ'ল সব মানুষের নিভৃত আকাঙ্ক্ষার কথা। মানুষ জানে না কথা বলতে, এ ধরণের কথা সব বলতে, তাদের মুখ ফুটেছে মায়ের কণ্ঠে:

"এমন সময়ে আমার মনে হ'ল তাদের কথা যারা জাহাজের উপর ছেগে পাহারা দেয়

পথ নির্বিঘ্ন রাখবার জন্যে, হৃদয় আমার কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল, আমি কামনা করলাম যাতে তাদের অন্তরে শান্তি নেমে আসে, পায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। তারপর মনে হল তাদের সকলের কথা যারা একান্ত আত্ম-বিশ্বাসী ভাবনাহীন নিশ্চেতনার ঘুমে নিমগ্ন, তাদের দুঃখ দৈন্যের জন্যে চিন্তিত হয়ে, তাদের যে প্রসুপ্ত দুঃখ কষ্ট জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠবে সে জন্যে করুণার্দ্র চিত্তে আমি কামনা করলাম যাতে তাদের হৃদয়ে তোমার শান্তির একটুখানি অন্ততঃ স্থান পায়, আধ্যাত্মিক জীবন যেন তাদের মধ্যে ফুটে ওঠে, আলো এসে দূর করে যেন অজ্ঞান অন্ধকার।

তারপর আমার মনে হ'ল সেই সব জীবের কথা যারা এই বিপুল সাগরের বুকে বাস করে, কামনা করলাম যাতে তাদেরও উপর প্রসারিত হয় তোমার শান্তি। আবার মনে হ'ল তারপর তাদের কথা যাদের ফেলে এসেছি বহুদূরে, যাদের প্রীতি এখনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, গভীর স্নেহভরে তাদের জন্য প্রার্থনা করলাম যাতে তারা পায় তোমার সচেতন ও স্থায়ী শান্তি, তোমার শান্তির পরিপূর্ণতা, তাদের গ্রহণ সামর্থ্যের অনুপাতে। তারপর আমার মনে হ'ল তাদের কথা যাদের কাছে আমরা চলেছি, যারা বালসুলভ কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, যারা অজ্ঞানের অহংকারের বশে, হীন স্বার্থের জন্যে লড়াই করে চলে, তাদের হয়ে, তীব্রভাবে বিপুল আস্পৃহা নিয়ে আমি প্রার্থনা করলাম যাতে তারাও লাভ করে তোমার শান্তির পরিপূর্ণ জ্যোতি। তারপর আরো আমি চিন্তা করলাম তাদের কথা যাদের আমি চিনি, যাদের আমি চিনিনা; যে অখণ্ড জীবনধারা পরিস্ফূর্ত্ত হয়ে চলেছে, যা-কিছু রূপের পরিবর্ত্তন সাধন করেছে, যা রূপ গ্রহণ করেনি এখনও, এ সকলের কথা, আরো তাদের কথা যাদের আমি চিন্তায় আনতে পারি না, আবার যা-কিছু আমার স্মৃতির মধ্যে জাগ্রত রয়েছে, আর যা-কিছু বিস্মৃত হয়েছি এদের সকলের জন্যে গভীর সমাহিত চিত্তে, নীরব আরাধনায় তোমার শান্তি আমি ভিক্ষা করলাম।" ১০।৩।১৪

অথবা—

"তোমার সঙ্গে সত্যকার সংযোগ যখন হয়েছে তখনই তোমার ইচ্ছাকে আশ্রয় করে অন্যের জন্য যা আমি ইচ্ছা করেছি তা যেন তারা গ্রহণ করতে পারে, এই আমার প্রার্থনা, ভগবান—" ২২।৩।১৪

কিন্তু মা কেবল মানুষের প্রতিনিধিমাত্র নন; তিনি সব মানুষই হয়ে গিয়েছেন তাঁর সত্তায় চেতনায়, সকলের সাথে একীভূত হয়ে গিয়েছেন, সকলে তাঁর মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে। তাঁর কণ্ঠে তাই ফুটেছে সমগ্রের সমবেত ধ্বনি; মায়ের ধ্যান ও প্রার্থনা মানবের ধ্যান ও প্রার্থনা—

"আমার বোধ হ'ল জাহাজের সকল যাত্রীকে আমি গ্রহণ করেছি, সমান ভালবাসা দিয়ে তাদের ঘিরে রেখেছি, যাতে প্রত্যেকের মধ্যে তোমার চেতনার কিছু একটু জেগে উঠতে পারে।" ৮।৩।১৪

আরও স্পষ্ট করে তিনি সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে বিশেষত: দুঃখের আর্তের পীড়িতের সঙ্গে তাঁর একাত্মতার কথা বলেছেন—

"শৈশবে তের বৎসর বয়সে, প্রায় এক বৎসর, প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিদ্রিত হওয়া মাত্রই আমার মনে হত যেন আমি শরীরের বাহিরে এসে সোজা উপরে উঠে চলেছি—বাড়ী ছাড়িয়ে, সহর অতিক্রম করে—বহু উর্দ্ধে। দেখতাম যেন আমি আমার চেয়েও দীর্ঘতর একটি অপূর্ব্ব সুন্দর সোনার পোষাক পরেছি। যতই আমি উর্দ্ধে উঠতাম, এই পোষাকটিও ততই দীর্ঘ হতে থাকত এবং আমার চারিপার্শ্বে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ত সহরটির উপর একটি বৃহৎ আচ্ছাদন রচনা করে। তারপর আমি দেখতাম চারিদিক হতে লোকেরা আসছে আবালবৃদ্ধবনিতা, অসুস্থ ও অসুখী। তারা সেই প্রসারিত পরিচ্ছদটির নীচে সমবেত হ'ত, তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও বেদনার কথা বলে, সাহায্য ভিক্ষা করে। প্রত্যুত্তরে সেই নবনীত ও জীবন্ত পোষাকটি দীর্ঘ হয়ে তাদের প্রত্যেকের দিকেই যেত এবং তাদের স্পর্শ করা মাত্র তারা সান্ত্বনা পেত, সুস্থ হয়ে উঠত এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখী ও সবল হয়ে তাদের শরীরের মধ্যে পুন: প্রবেশ করত।" ২২।২।১৪

কিন্তু কেবল মানুষের সীমানার মধ্যে নয়, তাঁর সত্তা ও চেতনা জড়জগতে জড়সামগ্রীর সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছে যখন তিনি তাঁর ঘর বাড়ি আসবাবপত্রের কথা বলছেন, বলছেন কতখানি আদরের সঙ্গে, কারুণ্য ও দাক্ষিণ্যের সঙ্গে

"যে সব সহস্র তুচ্ছ জিনিষ আমাদের ঘিরে রয়েছে, এত বৎসর ধরে যারা নীরবে আমার বিশ্বস্ত বন্ধুর কাজ করে এসেছে, তাদের আমি দেখছি স্নেহ-গম্ভীর দৃষ্টি দিয়ে। বাহিরে থেকে আমাদের জীবনের মধ্যে যে শ্রী তারা এনে দিয়েছে তার জন্যে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের ভাগ্যে যদি থাকে তারা দীর্ঘকালের জন্য হোক বা অল্পকালের জন্যে হোক অন্যের হাতে গিয়ে পড়বে, তবে সে হাতে তারা যেন কোমল ব্যবহার পায়; তোমার দিব্য প্রেম, হে ভগবান, যাদের তুলে ধরেছে অজ্ঞান অন্ধকারের বিশৃঙ্খলা হতে তাদের প্রাপ্য-সম্মান পায় যেন তারা।" ৩।৩।১৪

লক্ষ্য করবার যে, মায়ের সচেতন সপ্রেম স্পর্শে জড়বস্তু পর্য্যন্ত কি রকমে

শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে উঠেছে। আবার তেমনি সমানভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন উদ্ভিদ্-জগতের সঙ্গে, তাঁর সাযুজ্য দেখিয়েছেন তরুলতার সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় :

"একটা বিপুল একাগ্রতা আমাকে অধিকার করল, আমি দেখতে পেলাম একটি চেরী ফুলের সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে গিয়েছি। তারপর এই ফুলটির ভিতর দিয়ে যাবতীয় চেরী ফুলের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেলাম। তারপর চেতনার আরো গভীরে নেমে গিয়ে, একটা নীলাভ শক্তির স্রোতে চলে, আমি হয়ে উঠলাম একেবারে চেরীগাছটি, আকাশের দিকে আমার বাহুরই মত শাখা সব পুষ্পার্ঘ্যভার নিয়ে প্রসারিত। ঠিক সেই সময়ে আমি স্পষ্ট এই কথাগুলি শুনতে পেলাম :

'তুমি চেরীগাছের আত্মার সঙ্গে নিজেকে এক করে দিয়েছিলে, তাই তুমি আবিষ্কার করতে পেরেছিলে যে ভগবান নিজেই ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে চেয়ে ফুলদের এই প্রার্থনা অর্ঘ্যদান করছেন।'

"কথাগুলি শুনি যখন তখনি লিখে রাখলাম, পর মুহূর্ত্তে সব মুছে গেল। এখন চেরীর রক্ত আমার ধমনীতে বয়ে চলেছে, আর সেই সঙ্গে রয়েছে একটা অতুলন শক্তি ও শান্তি। মানুষের দেহ আর গাছের দেহে কি প্রভেদ? কোনই প্রভেদ নাই বস্তুত—যে চেতনা উভয়কে অনুপ্রাণিত করে তা এক অভিন্ন।" ৭।৪।১৭

ফলত: মায়ের সত্তা হ'ল সকল মানুষের সকল জীবের সকল প্রাণীর সকল বস্তুর অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর প্রতীক—প্রতীকমাত্র নয়, তাদের সম্মিলিত সত্তা তিনি—সমস্ত পার্থিব চেতনা তাঁর মধ্যে মূর্ত্ত, পৃথিবীর আকুতি, বেদনা ও অভীপ্সা রূপ গ্রহণ করেছে তাঁর আধারে :

"ভগবান, মূক মিনতি নিয়ে তোমার সম্মুখে ব্যথিত জগৎ নতজানু—কিই জড়বস্তু তোমার পদতলে আলুণ্ঠিত, তার শেষ একমাত্র আশ্রয় সেখানে। তোমাকে মিনতি করা অর্থ তোমাকে সে পূজা করে যদিও তোমাকে জানে না, বোঝেও না। তার প্রার্থনা উঠে চলে মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদের মত—যে চলেছে মৃত্যুর পথে সে কেমন যেন অস্পষ্ট অনুভব করে যে তার পুনর্জীবনের সম্ভাবনা আছে—তোমার মধ্যে। সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে পৃথিবী তোমার আজ্ঞার অপেক্ষায়।" ৭।১১।১৫

এই হ'ল মায়ের দ্বিতীয় রূপ বা ভাবস্থিতি—প্রথমে ব্যক্তিগত তারপর এই সমবেত বা বিশ্বগত বা বিশ্বভূত রূপ, কিন্তু মা কেবল বিশ্বই নন, তিনি হ'লেন বিশ্বজননী। তিনি শুধু বিশ্বের প্রার্থনা জানিয়েই ক্ষান্ত হ'ন নি, তাঁর হ'ল জগৎমাতার প্রার্থনা জগৎ পিতার

কাছে—বিশ্বের উদ্ধারের জন্যে—যার বিশ্বের উদ্ধার অর্থ বিশ্বনাতার নিজেরও উদ্ধরণ তাঁর এই নিম্নতন অজ্ঞানময় প্রকাশ থেকে :

"মা জননী—আমিই ত' সে জননী মা—যুগপৎ সংহারকর্ত্রী সৃষ্টিকর্ত্রী তুমি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার বুকের মধ্যে রয়েছে তার বহুরূপ জীবন-লীলা নিয়ে আর তুমিও তার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কণার মধ্যে রয়েছ তোমার সমস্ত বিশালতা নিয়ে।

তোমার আনন্ত্য তার আশ্রয় ধরে উর্দ্ধে উঠে চলেছে, কখনো যা প্রকাশ পায় নাই তার দিকে, এই মিনতি নিয়ে যাতে পূর্ণতর সুষ্ঠুতর প্রকাশ নিরন্তর দেখা দেয়।"

১১।৮।১৪

আরো এই—

"আমি তোমার করুণার দৃঢ় বাহুপাশ।

আমার প্রসারিত বুকে তোমার সীমাহীন প্রেম। আর্ত্ত পৃথিবীকে ঘিরে রাখে বাহুযুগল, উদার হৃদয়ের পরে তাকে আদরে চেপে ধরে। ধীরে নেমে আসে পরম আশীষের চুম্বন এই ধ্বস্তিষ্ট কণাটির উপর—নিরাময়কারী মায়ের চুম্বন।" ১১।৮।১৪

"সমস্ত পৃথিবী আমার কোলে, পীড়িত শিশু যেন, তাকে নিরাময় করতে হবে, দুর্ব্বল বলেই তার উপর পড়েছে বিশেষ স্নেহ। ১৪।১০।১৪

মায়ের ব্যষ্টিগত ভাব সমষ্টিগত ভাব এবং তাঁর স্বরূপগত ভাব এই ত্রিধারার সম্মিলিত মোহন সুর ফুটে উঠেছে মায়ের সেই প্রথম সাক্ষাতের মহাবাক্যে

"শত শত জীব যদি গাঢ়তম অজ্ঞানের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকে—কিছু এসে যায় না তাতে। কাল যাঁকে আমরা দেখেছি তিনি পৃথিবীতে আছেন। তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট প্রমাণ যে একদিন আসবে যখন অন্ধকার আলোকে রূপান্তরিত হবে, যখন তোমার রাজত্ব সত্যসত্যই পৃথিবীর উপর স্থাপিত হবে।" ৩০।৩।১৪

তাঁদের সম্মিলিত আবির্ভাব, জগৎ জননী ও জগৎ পিতার কারুণ্য ভূনভলে নিয়ে আসবে যে মহাসিদ্ধি তার এক মহিমাময়ী অপরূপ মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়েছে মায়ের এই যাদুমন্ত্রে—

"মৃত্যু তার বিরাট কলেবর নিয়ে এল, চলে গেল—তার গতি পথে সমাহিত চিত্তে, সবই রইল নীরব হয়ে।

পৃথিবীর উপরে আবির্ভূত হয়েছে এক অমানুষী সৌন্দর্য্য—অতি অপরূপ মহাসুখের অপেক্ষাও অপরূপ কিছু জানিয়েছে তার আগমনী সান্নিধ্য।" ৭।১১।১৫

মায়ের চেতনায় ত্রিতলের কথা বললাম—মায়ের সাধনার বা সিদ্ধির দিক দিয়ে; কিন্তু এ ছাড়া আরও একটা চতুর্থ তলা আছে—সর্ব্বদাই থাকে যেমন, নেপথ্যে তুরীয়স্থান। এটি হ'ল ভগবান ও ভগবতীর নিজস্ব ব্যক্তিগত রহস্য, তা ঈশ্বর ঈশ্বরীর জাগতিক লীলা সংক্রান্ত কিছু নয়, সৃষ্টিতে, সৃষ্টির জন্য করণীয় কিছু নয়, এ সকলের বাহিরে বা অন্তরে নিভৃতে প্রচ্ছন্ন অহেতুক লীলা, নিজেদেরই জন্যে। মায়ের প্রার্থনাবলীতে এ রহস্য একটা গভীর সুষমার সৌরভের মত নেপথ্যে যেন ছড়িয়ে রয়েছে। এই রহস্যেরই উল্লেখ করেছেন, উল্লেখ মাত্র শ্রীঅরবিন্দ করে গিয়েছেন একটা মধুর নিবিড় দিব্য কারুণ্যমিশ্র কণ্ঠে তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতার আরম্ভে—

"I have gathered my dreams in a silver air
Between the gold and the blue
And wrapped them softly and left them there,
My jewelled dreams of you."

(God's Labour)

"আমার স্বপ্নবালা কুড়িয়ে নিয়েছি
তুলে রেখেছি রূপালী এক আকাশ তলে
সোনালী আর সুনীলার মাঝখানে
জড়িয়ে ঢেকে রেখেছি তাকে
রেখে এসেছি ঐ ওখানে
তোমায় নিয়ে আমার রঙে গড়া স্বপ্নবালা"

এ হ'ল নেপথ্যের একান্ত পরম আনন্দের নিকেতন, এই হল অমৃতত্বের ভূমার, এখান থেকে উচ্ছলিত এক তরঙ্গকণা হ'ল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এই সৃষ্টি—আনন্দম্ অমৃতম্ যৎ বিভাতি।

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

মে ১২, ১৯৫১

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দের "মা" ('The Mother') বইখানি থেকে—"সঙ্গতি ও সৌন্দর্যের বিকাশ মনে ও অন্তরাত্মায়, সঙ্গতি ও সৌন্দর্যের বিকাশ চিন্তায় ও অনুভবে, সঙ্গতি ও সৌন্দর্যের বিকাশ সকল বাহ্যক্রিয়াতে ও আচরণে, সঙ্গতি ও সৌন্দর্যের বিকাশ জীবনে ও তার পরিবেশে, এই চান যিনি মহালক্ষ্মী...যেখানে প্রেম ও সৌন্দর্য বিকাশের অভাব অথবা তা বিকাশ পেতে পরাঙ্মুখ, মহালক্ষ্মী সেখানে যেতে চান না।"

উত্তর : হাঁ। যেখানকার পরিবেশ ও ঘটনাচক্র, যেখানকার আবহাওয়া ও জীবনরীতি, বিশেষত যেখানকার ভিতরের মনোভাব খুবই নীচুদরের এবং স্বভাবতই হীন, স্থূল, স্বার্থপূর্ণ, অপকৃষ্ট, সেখানে প্রেম আসতে কুণ্ঠিত হয়, অথবা এলেও তা প্রকাশ পেতে ইতস্তত করে এবং বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনা। সুন্দরকে স্থান দিতে হলে তার আবাসটিও তেমনি সুন্দর হওয়া চাই। বাহ্য আবাসের কথা আমি বলছি না—কোনো বাস্তব ঘরদোর বা আসবাবপত্রের কথা নয়,—আমি বলছি অন্তরের অবস্থার কথা, তা হওয়া চাই সুন্দর, মহৎ, সঙ্গতিপূর্ণ ও স্বার্থশূন্য। তেমন জায়গাতেই প্রেমের আবির্ভাবের ও স্থায়িত্বের সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু যখনই সে নিজেকে ফোটাতে গিয়ে দেখবে যে সেখানে কদর্য ও নীচুদরের জিনিষের মিশ্রণ এসে পড়েছে, তখনই সে আর সেখানে তিষ্ঠতে না পেরে পালিয়ে যাবে। সেই কথাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন প্রেম সেখানে বিকাশ পেতে "পরাঙ্মুখ" অর্থাৎ বলা যেতে পারে, প্রেম সেখানে এসে পড়লেও বুঝবে যে সে ভুল করেছে। লোকে বলে যে প্রেম কখনো স্থায়ী হয় না, সেটা সম্পূর্ণই তাদের নিজেদের দোষে। প্রেমকে তারা এমনই এক বিশ্রী রকমের জীবনদান ক'রে এমনই হীন, ইতর, স্বার্থপর ও বীভৎস জিনিসের মিশ্রণের মধ্যে টেনে নিয়ে যায় যে বেচারা সেখানে আদৌ টিঁকতেই পারে না। যদিও তাতে তাকে সরাসরি হত্যা ক'রে ফেলেনা বটে, কিন্তু তাকে নিদারুণ অস্থির ও রিক্ট ক'রে তোলে। কাজেই তাকে তখন সে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়। লোকে সর্বদাই

এই কথা বলে অনুযোগ করে যে প্রেম জিনিসটাই হলো অনিত্য ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, তাদের বানিয়ে তোলা ঐ রকমের নোংরা ঘরের মধ্যে যে প্রেম একবারও দেখা দিতে এসেছিল তারই জন্য তাদের যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ঐ বইখানি থেকে না আবার অন্যত্র পড়লেন—"মহাসরস্বতী হলেন বিশ্বমাতার কার্যকুশলতা ও চরমোৎকর্ষ ও সুশৃঙ্খলা বিধায়িকা শক্তির প্রতিরূপ। চারজনের মধ্যে ইনিই হলেন সর্বকনিষ্ঠা, কিন্তু এঁর কর্মনির্বাহিকা শক্তির যে ক্রিয়ানৈপুণ্য তা স্থূল প্রকৃতির কাছাকাছি এবং তা অতি নিখুঁত। ...এঁর প্রকৃতিতে নিবিড় ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানরাজি সদাই বিধৃত, এবং যাকে ইনি মনোনীত করেন তাকে সেই পরম জ্ঞানের সঙ্গে আরো দান করেন সূক্ষ্মবোধ ও ধৈর্য, পাকা কারিগরের মনের নির্ভুল বোধি, হাতের চেতনা ও চোখের ঠাহর।"

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ বলছেন "হাতের চেতনা", এর অর্থ কি?

উত্তর : সে কি কথা? আমি এ সম্বন্ধে তোমাদের কতবারই বলেছি, একশো বার ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছি, তবু সেই প্রশ্ন? কতবার শুনিয়েছি যে যখনই কোনো হাতের কাজ করতে যাবে তখনই আগে হাতের কোষগুলির মধ্যে চেতনা জাগিয়ে নেবে। কোনো খেলার কাজই করো বা অন্য কাজই করো, হাতের কোষগুলির মধ্যে যদি তার কোনো সাড়া না থাকে, তাহলে সে কাজ ভালোরকমভাবে হবেনা। বহুবার এ কথা তোমাদের বলিনি? এ জিনিস করতে পারা যায়, এ বোধ আনা যায়। হাতের চেতনা আনার অভ্যাসের নানা পদ্ধতি আছে, পরে একটা সময় আসে যখন হাত এমনই চেতন ও তৈরি হয়ে ওঠে যে তার উপরে তুমি অনায়াসে নির্ভর করতে পারো, তোমার ক্ষুদ্র মনের দিকের ছাঁশিয়ারি করবার কোনোই আর প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ এখানে আরো বলছেন : "সব রকমের অভাব মাত্রই...তাঁর আগমনকে ব্যাহত করে"?

উত্তর : হাঁ, সব রকমের অভাব, মানে উদারতার অভাব, আগ্রহের অভাব, প্রাচুর্যের অভাব, অভ্যন্তরীণ গুণের অভাব; সবই যেখানে শুষ্ক, সংকীর্ণ, নিরুত্তাপ, সেখানে মহালক্ষ্মী আসেন না। এখানে আমরা টাকার অভাবের কথা বলছি না,

তা বলাই বাহুল্য ; মহালক্ষ্মীর দৃষ্টিতে একজন খুব ধনী ব্যক্তিও হয়তো এই হিসাবে সম্পদবিহীন হতে পারে, আবার একজন দরিদ্র ব্যক্তিও তার হৃদয়ের দিক দিয়ে সম্পদবান হতে পারে।

প্রশ্ন : যখন বলা হয় "un pauvre homme" অথবা "un homme pauvre" (নিঃস্ব ব্যক্তি বা লোকটি নিঃস্ব) তখন তার আসল মানে কি হবে ?

উত্তর : "un pauvre homme" মানে যে ব্যক্তি গুণে, বদান্যতায়, শক্তিতে নিঃস্ব ; যে ব্যক্তি দুঃস্থ, অসুখী, তাকেও তাই বলা হবে। উদার না হলেই তুমি হবে অসুখী—যদি তুমি এমন উদার ও বদান্য হও যে কোনো হিসাব না রেখেই দিয়ে দিতে পারো, তাহলে তুমি অসুখী কখনই হবেনা। তারাই দুঃখ পায় যারা কেবল নিজের দিকেই ফিরে সব কিছুকে কেবল নিজেরই দিকে টানতে থাকে, জগৎকে ও সব কিছুকেই দেখে নিজের দিক দিয়ে। তারাই হয় অসুখী। কিন্তু ঐ রকম হিসেব না ক'রে যদি উদারভাবে তুমি নিজেকে দিয়ে ফেলতে পারো, তাহলে কখনই তুমি অসুখী হবেনা, কখনই না। যে চায় নিতে সেই হয় অসুখী ; যে চায় দিতে সে কখনই তা হয় না।

মে ১৪, ১৯৫১

"মায়ের কথাবার্তা" (Words of the Mother) তৃতীয় পর্যায় থেকে—

"দৈবক্রমে যা ঘটে তা কেবল শৃঙ্খলা ও সঙ্গতির ব্যতিক্রম হিসাবেই ঘটতে পারে। মাত্র এক স্থানেই আছে নিখুঁত সঙ্গতি, সে হলো অতিমানসে যেখানে সত্যের রাজা, দিব্য নিয়মের পূর্ণ বিকাশ। সুতরাং সেই অতিমানসে দৈবাৎভাবে কিছু ঘটবার স্থান নেই। কিন্তু নীচেকার প্রকৃতির মধ্যে উপরের সত্য হয়েছে তিরোহিতচ্ছন্ন ; সুতরাং এখানে সমুচিত শৃঙ্খলার জন্য যে দিব্য উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়ার ঐক্য থাকা দরকার তারই অভাব ; তাই এই নিম্ন প্রকৃতির জগতে সব কিছুই ঘটতে পারে দৈবক্রমে, অর্থাৎ এখানকার ক্ষেত্রে নানারকম শক্তির সংমিশ্রণ হওয়াতে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ধরে কাজ হতে পারে না..."

প্রশ্ন : নিম্ন জগতে যদি বিশৃঙ্খলা হেতুই দৈবক্রিয়া ঘটে, তবে এমন "শুভকারী" দৈবক্রিয়াও তো দেখা যায় যাতে কোনো বিশৃঙ্খলা হলোনা ?

উত্তর : শুভকারী কার পক্ষে ? কারণ জগতে প্রায়ই দেখা যায় যে একের পক্ষে যা শুভ, অন্যের পক্ষে তা অশুভ ; একজন যাতে সুখ পাচ্ছে অন্যজন তাতে দুঃখ পাচ্ছে ; তাহলে সেই বিশৃঙ্খলাই তো এসে গেল। আমি এমন কথা বলতে চাইনি যে কাউকে অসুখী করবার জন্য দৈবক্রমে কিছু ঘটবে, কিন্তু এই বলতে চাই যে সত্যের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই, তার থেকে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। সেই বিশৃঙ্খলার ফলে তুমি সুখীও হতে পারো। এমন অনেকে আছে যারা বিশৃঙ্খলা নিয়েই পরম সুখে আছে, তারা তা বদলাতে চায় না।

প্রশ্ন : কিন্তু এমন শুভকারী দৈবক্রিয়াও তো ঘটনাচক্রের মধ্যে ঘটে যেতে পারে, কারোই কোনোরূপ অনিষ্ট হলোনা ?

উত্তর : সেটা তুমিই কেবল দেখতে পেলে না যে তাতে কারো কিছু অনিষ্ট হচ্ছে কি না, তার কারণ তার কোনোরূপ নিদর্শন তুমি পাওনি। বস্তুত ঘটনা সম্বন্ধে কোনো বিচার আমরা করতেই পারি না, কারণ জগতের ব্যাপার কিছুই আমরা জানি না। কতটুকুই বা জানতে পারি ? আমাদের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ দৃষ্টি যতটুকু। ভেবে দেখ যে কেউই তার সময়ের বড় জোর দেড়শো বছরের বাইরের খবর কিছু জানতে পারেনা, আমি একটা খুব লম্বা সীমানা ধরেই বললাম, আর ওরই মধ্যে তার নিজের জীবনের প্রথম কয়েকটা বছরে কি ঘটেছিল তাও স্মরণে আসে না। এইটুকু অল্প কালের মধ্যে কেমন ক'রে কে জানবে যে জগতে কি ব্যাপার হয়ে গেছে ও তার ফল কি হয়েছে ? কিছুই জানা যায় না। যদিও ধরে নেওয়া যায় যে তোমার স্মৃতিশক্তি এমন প্রখর যে বিশেষ কোনো "দৈবঘটনার" আগেকার ও পরের খবর সবই তোমার জানা আছে, তথাপি তাও হবে কেবল স্থানীয় খবর। পৃথিবীর অন্যত্র লক্ষ লক্ষ স্থানে কিংবা উল্টা দিকে সেই সময়ে কি ঘটেছে তা কেমন করে তুমি জানবে ? কেউই তা জানতে পারেনা। আমরা এটা দেখতে পাই যে সকল ঘটনাই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে শিকলগাঁথা, চেতন ভাবে ; একটা কোনো শাসনক্রিয়া কোথাও উঠলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া অন্য কোথাও হবেই, তাহলে কেমন করে বলবে যে একটা কোনো দৈব ঘটনা আমাদের পক্ষে অনুকূল হলেও অন্যের পক্ষে প্রতিকূল হয়নি ? এ সম্বন্ধে কোনোরূপ মত দিতে পারা অসম্ভব। ...ন্যায্যভাবে কেমন ক'রে কিছু বলতে পারি, যখন জগতের অন্যত্র কোথায়

কি হচ্ছে তার খবর আমরা জানিনা ? সমগ্রভাবে কিছু জানা চলে না, কোন শক্তি কি ভাবে কাজ করছে তাও যখন জানা নেই। আমরা বলি যে শক্তির লীলাতে একটা কিছু ঘটল ; তবে তা দিব্য সত্তার জিনিস নয়, পরস্পরবিরোধী ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়ার ফল। সে ইচ্ছা মন্দ কিংবা বিরুদ্ধ নাও হতে পারে, তবে তা অজ্ঞানের ইচ্ছা। প্রত্যেক শক্তিই চায় তার আপন ইচ্ছাকে সফল করতে, তার মধ্যে যার বেশি জোর সেই হয় জয়ী,—কিন্তু এ রাজ্যে যার জোর বেশি সেই যে ভালো বেশি, এমন কথা নয়। একটা দিক দিলে গেলে যে ওরই কারণে আরো কত দিকের দিলে ফাঁক পড়ে গেল তা কে জানে ? আমরা কিছুই তার জানিনা। কি হয়েছে আর কি হতে পারতো, এর তুলনামূলক বিচার আমরা করতে পারি না। না, এমন কথা আমি কখনো বলিনি যে দৈবঘটনা বিরোধী শক্তিদের দ্বারাই ঘটে, তবে এ কথা ঠিক যে তা হলো অজ্ঞানময় শক্তিদের কাজ।

প্রশ্ন : বিজ্ঞানের মতে আকস্মিক ব্যাপারগুলো ঘটে থাকে অকারণে, অথবা এমন সব ছোটোখাটো ভেঁড়া ভেঁড়া কারণের যোগাযোগ হয়ে পড়ে, যার থেকে শৃঙ্খলার অভাবের কথাই মনে আসে। কিন্তু কেমন করে জানবো যে কোনো ঘটনা "দৈবাৎ" ঘটে গেল ? "দৈবাৎ" বলতে তা একটা কথার কথা মাত্র নয় কি ?

উত্তর তাই তো আমিও বললাম ! দৈব ঘটনার কোনো কারণ নেই এমন কথা আমি বলিনা। তোমরা তাকে বলো "দৈবাৎ" ঘটেছে, যেহেতু তার কোনো কারণ তোমরা খুঁজে পাওনা। কিন্তু দিব্য সত্যের সংস্পর্শ যে পেয়েছে সে অনায়াসে স্পষ্টই জানতে পারে যে তা সেখান থেকে আসা জিনিস কি না।

প্রশ্ন কিন্তু কেউ যদি কার্য কারণের অনুসন্ধান করে—

উত্তর : থামো, আমরা এখানে একটা সংজ্ঞা স্থির ক'রে বলছি যে দিব্য ইচ্ছার ফলে যেটা নয় এবং যার মধ্যে তার নিশ্চয় নেই তাকেই বলব "দৈব ঘটনা"।

প্রশ্ন : তাহলে সাধারণ জগতে অনেক কিছুই ঘটছে দৈব ভাবে।

উত্তর : তাই তো, তাই আমি বলছি। সাধারণ জগতে দৈব ঘটনারই রাজত্ব কেবল সেইগুলি ছাড়া যেগুলির কারণ সাধারণ মানুষের অজানা কিন্তু যারা দিব্য ইচ্ছার সংস্পর্শ পেয়েছে তারা জানে। কেবল সেই জায়গাতেই কোনো গণ্ডগোল নেই। কিন্তু তা যখন প্রায়ই হয়না, তখন বলা চলে যে অধিকাংশ ব্যাপারই দৈবক্রমে ঘটছে।

প্রশ্ন : আমরাও তাহলে এখানে দৈবক্রমে এসে পড়েছি ?

উত্তর : সেটা অবশ্য সাধারণ ভাবে বলা যায়না। আর তা ব্যক্তিগতভাবে বলাও ঠিক নয়। সুতরাং অনির্দিষ্টভাবে এই কথাই আমরা বলব যে কেউ কেউ এসেছে দৈবক্রমে, আর কেউ কেউ এসেছে দিব্য ইচ্ছাতে।

প্রশ্ন : তাহলে সাধারণ জগতেও সকল জিনিসই দৈবক্রমে হয়না। যেমন, কোনো উত্তপ্ত গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে দুইরকম ক্রিয়া দেখা যায় : একটা বিশৃঙ্খল ক্রিয়া আর একটা সুসম্বদ্ধ ক্রিয়া। সাধারণ জগতেও তেমনি দুইরূপ ক্রিয়ার বিশ্রণ হয়—আর একটা অসম্বদ্ধ ক্রিয়া আর একটা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে সুসম্বদ্ধ ক্রিয়া।

উত্তর তুমি নিজেই তো সেটা বুঝতে পারলে।
(মা অন্য প্রশ্নে এলেন)

প্রশ্ন আপনার কথাবার্তার মধ্যে বলেছেন,—"শান্তি তোমাদেরকে অনেকবারই দেওয়া হয়েছে কিন্তু তোমরা প্রত্যেক বারই তা হারিয়েছ ?"

উত্তর হ্যাঁ, শান্তি পেয়েও তোমরা তা হারিয়েছ অসংখ্য বার, তাই বলেছি। যাকে বলে দিব্য শান্তি (শুধু সাধারণ শান্তির কথা নয়, কারণ সারা জগৎ বার বার ঘুরে এলেও তার সাক্ষাৎ পাবেনা), সেই দিব্য শান্তিই তোমাদের দেওয়া হলো কিন্তু বার বার তোমরা তা হারালে। কেন ? যেহেতু তোমাদের নিজেদের ভিতরকার কোনো অংশ তার তুচ্ছ স্বার্থের কথাটা বর্জন করতে নারাজ।

প্রশ্ন : কিন্তু দিব্য শান্তি তো এমনিতেই বর্তমান ? তা "দেওয়া হয়েছে" তো নয়।

উত্তর ভুলে যেওনা যে এটা বলেছিলাম আগেকার দিনে, যখন এখানে মাত্র ১২ বা ১৬ জন সাধক একত্রে জুটতো, তাদের উদ্দেশেই ও-কথা বলেছি। তখন ভাবিনি যে পঞ্চাশাধিক জনের মধ্যে তা পড়া হবে। কিন্তু তখন বিশেষ ক'রে সেই কয়েক জনকেই বলেছিলাম যে বারে বারে তোমাদের শান্তি দেওয়া হচ্ছে আর বারে বারে তোমরা তা হারাচ্ছ। তখনকার পক্ষে তা ঠিকই বলেছিলাম। কিন্তু এখন সাধারণভাবে তোমাদের সকলকে বলতে গেলে তাই বলতে হয়, যেমন তুমি বললে, যে শান্তি তোমরা নিত্যই পাচ্ছ

কিন্তু তা তোমাদের মনের গ্রহিষ্ণুতার মাপে (যেমন চেতনা, আলো, জ্ঞান)। এখানে তোমরা তাকে "হারাচ্ছ" বলবনা, কিন্তু এই হচ্ছে যে একবার তাকে পাচ্ছ আবার পাচ্ছনা, আবার পাচ্ছ আবার পাচ্ছনা; আর ওই হলো তার কারণ, যেমন বললাম। সংখ্যায় তোমরা ষোলো বা আঠারো বা পেরুশো বা সাতশো জনই হও, ওর কারণ প্রায় একই রকম, অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সদিচ্ছা থাকলেও সত্তার মধ্যে এমন কিছু রয়ে গেছে যা তোমাদের মামুলী অভ্যাসগুলোকে আঁকড়ে ধরে আছে। লোকে মনে করে যে বাইরের ছোটোখাটো অভ্যাসগুলোকে বদ্‌লে ফেলতে পারলেই তাতে উন্নতি যথেষ্ট হবে; তারা বলবে, "এই দেখনা, আমি কত জায়গাতে ঘুরেছি, নিত্যই কত আবহাওয়া বদলাচ্ছি, অবস্থাও বদলাচ্ছি, এমনি ক'রে নিজেকে মানিয়ে তৈরি করে নিচ্ছি।" কিন্তু ওতে কিছুই হয়না। ভিতরকার যে অভ্যাস আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া, দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারা, ক্রিয়াপ্রণালী, এইগুলোই বদলাতে চায়না, এগুলিকেই বদলানো কঠিন।

প্রশ্ন আপনি বলেছেন শান্তি "দিয়ে দেবার" কথা, তা কি প্রকৃতভাবে দেওয়াই, অথবা কথাটা সাধারণ অর্থে বলা?

উত্তর প্রকৃতভাবে তা দেওয়াই, তোমাদের কাছে জোর ক'রে পাঠানো, হয়তো কয়েক মুহূর্ত বা মিনিট বা ঘন্টার জন্য তোমরা তা অনুভবও করো। হঠাৎ বোধ হয় যে তোমাদের মধ্যে একটা শান্তি ও শক্তি ও আলো এসে গেছে—কখনো বা তার চেয়েও কিছু দামী জিনিস জ্ঞান, চেতনা, প্রেম। কিন্তু তার পরেই তা আর থাকেনা। তখন তোমরা বলো: "নাঃ, দিব্যশক্তির তেমন উদারতা নেই। কেবল একটু চাখিয়ে দিলে জিনিসটা কেমন, তার পরেই সরিয়ে নিলে, এখন তোমার আগ্রহ আরো বেড়ে যেতে থাক!" এই হয় তোমাদের মন্তব্য।

প্রশ্ন কিন্তু তবুও আমরা এটা জানি যে কোন কারণে আমরা সেই শক্তিকে স্থায়ী করতে পারলাম না, আর সেই সব বাধাকে দূর করতে খুবই চেষ্টা করি।

উত্তর আর তার জন্য সজোরে লড়াই করতে থাকো, যাতে শান্তিটি আরো ঘুচে যায়।...শান্তির স্পর্শ হারিয়ে যখন চেষ্টা প্রয়োগ করতে থাকো, তাতে কি বাধাগুলোকে দূর করতে পারো? তা যদি পারো তাহলে তো এক নম্বরের সাধক হয়ে গেলে। বেশির ভাগ লোকই তা পারেনা। যারা পারে তাদের সাধুবাদ করি, তারা এগিয়ে যাবে

তাড়াতাড়ি। কিন্তু অনেকে আসল কারণটাই জানেনা...শতকরা প্রায় নিরানব্বই ভাগক্ষেত্রেই দোষটা গিয়ে পড়ে বেচারা ভগবানের ঘাড়ে: তিনি এমনই খামখেয়ালী যে একটুমাত্র দিয়েই আবার সরিয়ে নেন। সুমিষ্ট ফলের আস্বাদমাত্র পাইয়ে আবার তখনই মুখ থেকে কেড়ে নেন, আবার ইচ্ছে হলে আবার একটু দেন...তাকে অস্থিরমতি ছাড়া কি বলব!

প্রশ্ন অমন শাস্তি দেবার বদলে ভগবান অহংভাবটাই ঘুচিয়ে দিননা!

উত্তর ও, সেটি হলো প্রত্যেকের নিজস্ব কাজ। সেদিন তোমাদের তাই বলে ছিলাম, শ্রীঅরবিন্দ কি লিখেছেন তা পড়ে শুনিয়েছিলাম "এমন অলস ভ্রান্তিকে মনেও ঠাঁই দিওনা যে তোমার জন্যে আশ্পৃহাও ঘুগিয়ে দেওয়া হবে আর এ কাজটাও ক'রে দেওয়া হবে।" আশ্পৃহা আর অহংবর্জন নিজের দিক থেকেই হওয়া চাই। তবে তুমি তাতে সাহায্য পাবে, সমর্থন পাবে। যখনই এক ধাপ এগোবে তখনই দেখবে যে তার জন্যে যা কিছু দরকার তা তোমার মিলে যাচ্ছে, কিন্তু পা বাড়িয়ে এগোতে হবে তোমাকেই, কেউ তোমাকে পিঠে বয়ে নিয়ে যাবেনা। ...আগে নিজের অহং ত্যাগ করো, এ খুবই চমৎকার কাজ! অহং মুছে গেলে তখন আর বিশেষ কিছু করতে হবেনা, সব কাজই তখন ঠিক হয়ে যাবে, অহং ভগবানের সঙ্গে সংযোগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অহং দূর হলে ঠিক ওই রকমই তুমি হবে, ভগবানের সঙ্গে নিত্যযুক্তের আনন্দে সব কাজ তোমার আপনিই হয়ে যাবে। তবে সাধারণত শেষের দিক থেকে তোমার কাজ শুরু করোনা। যাই হোক, এখন যা বলছি তা খাঁটি কথা; অহং বর্জনের কাজটি তোমারই; সাহায্য অবশ্য পাবে, কিন্তু এগোতে হবে নিজের পায়ে। এমন আশা কোরোনা যে কেউ তোমাকে পিঠে বয়ে নিয়ে যাবে, আর কেবল বাহিত হওয়া ছাড়া তোমার কিছু করতে হবেনা। *

---

* Bulletin of S.A.I.C.E থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

প্রসঙ্গত

মার্চ ৭, ১৯৬৭

মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে

কয়েকটি প্রশ্ন এসেছে বয়স্ক ছাত্রদের কাছ থেকে (যারা শিশু নয়, যথেষ্ট বয়স হয়েছে)। প্রশ্নগুলি "মৃত্যু" সম্পর্কে, মৃত্যুতে কি অবস্থা হয়, বর্তমানে কেন এত বেশি লোক একত্রে দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে ইত্যাদি। ইতিপূর্বে দু'জনের প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি, অবশ্য তা মনের স্তর থেকে, এবং তাকে ছাড়িয়ে যেতেও চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রশ্নগুলি ও তার উত্তর :

প্রশ্ন মৃত্যুর সময় ও নিমিত্ত যদি আগে হতেই নিরূপিত হয়, তাহলে এই যে সব বিধ্বংসী বোমার আক্রমণ, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতির দ্বারা বহু মানুষ একত্রে মারা যাচ্ছে তাদের আত্মা কি ঐভাবেই এককালে একত্র মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেছিল ?

উত্তর বহুজনের একত্র মৃত্যু হলো তাদের সমষ্টিগত নিয়তি। তাদের বেলাতে পূর্বোক্ত কোনো প্রশ্নই নয়। কেবল যার চৈত্যসত্তা ব্যক্তিগতভাবে পরিণতিপ্রাপ্ত হয়েছে তার আত্মা ইচ্ছা করলে তদ্রূপ দুর্ঘটনাতেও বেঁচে যাবে।

প্রশ্ন মৃত্যুর পরে আত্মা যখন দেহ প্রাণ মন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন সে আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেমন ক'রে চেতন থাকে ?

উত্তর আত্মা হলো পরমাত্মারই স্ফুলিঙ্গ, সেই পরম প্রভুর আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে চেতন হবার জন্য কোনো দেহের দরকার হয় কি ?

এই ধরনের মানসিক যুক্তির দ্বারা তারা ঐ সকল বিভিন্ন প্রশ্নের মীমাংসা পেতে চায়, তাই আসে ঐ সব প্রশ্ন···কিন্তু তা অসম্ভব।

জিনিসটা নতুন কিছু নয়, কেবল চেতনার কিছু বিস্তার, সেই কারণেই সম্প্রতি এই জাতীয় প্রশ্ন আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়েছে, এবং তাতে মনে হচ্ছে যে মানুষ মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানে না—মৃত্যু কি জিনিস, তাতে কি হয়, ইত্যাদি

কিছুই না জেনে নানারূপ অনুমান করতে থাকে যার কোনোটাই ঠিক নয়। এই প্রশ্ন নিয়ে ঠেলেঠুলে অনেকটা পর্যন্ত চুকে গিয়ে দেখেছি যে মৃত্যু জিনিসটা বস্তুতপক্ষে মৃত্যুই নয়।

কেবল তা একটা বাহ্যদৃষ্ট ব্যাপার মাত্র, আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টির ভিত্তিতে। কিন্তু চেতনার স্পন্দনে তাতে কোনোই বিশেষ পরিবর্তন হয় না। এই জবাব পেলাম বিশেষ আগ্রহের ফলে (মৃত্যু কি তা না জানাতে যেরূপ আগ্রহ জন্মায় সেই ধরনের আগ্রহ), সে জবাব পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট এবং তা কেবল চেতনাই জানতে পারে...যে, এই অবস্থান্তরের সম্পর্কে যেরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয় তার তেমন কোনো গভীর গুরুত্ব দেওয়া নেই, সেরূপ ভ্রান্ত ধারণা অজ্ঞানতা হতেই উদ্ভূত। আদানপ্রদানের গুহ্য উপায় যার জানা আছে, সে বলবে যে তার কাছে পার্থক্যটা খুব বেশি নয়।

কিন্তু অপর প্রশ্নটির উত্তর পেতে এখনও চেষ্টা করা হচ্ছে। কতকগুলো বিষয় এখনও পরিষ্কার হয়নি, অনুভূতির মধ্যে কিছু কিছু ফাঁক আছে। সুতরাং এ বিষয়ে জ্ঞান সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কারণ খানিকটা আন্দাজে ও মোটামুটিভাবে বলার চেয়ে গোটা উত্তরটার অনুভূতি পেয়ে তা পুরাপুরিভাবে বলাই ভালো। ও-প্রশ্ন এখন তোলা রইল।

প্রশ্ন কিন্তু আপনি বললেন যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই...তাহলে কেউ যখন ওপারে চলে যায় তখন কি সে এ পারের বাস্তব জগতের সব কিছুই টের পেতে পারে?

উত্তর হাঁ, তাই হয়।

প্রশ্ন তাদের বোধশক্তি....

উত্তর হাঁ, তাই।

তবে এ রকম ভ্রমাত্মক ও বাহ্যদৃষ্টিমূলক বোধশক্তি নয়, এর গণ্ডী থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার বদলে অন্যরূপ বোধ. তেমন বোধ কোনো কোনো মুহূর্তে আমি পেয়েছি নিজে ও পার্থক্যটা জেনেছি; যদিও সে অনুভূতি পুরোপুরি হয়নি (বাহ্য ঘটনার বাধাতে), সুতরাং সে কথা এখন না বলে অপেক্ষা করাই ভালো।

কিন্তু তথাপি বোধ একটা থাকেই।

ঠিক এই ধরনের বোধ নয়, বরং কখনো কখনো এর চেয়েও বেশি জোরালো; কিন্তু সেটা অপর দিক থেকে জানা যায় না। কেমন করে বা বোঝাই। একটা দৃষ্টান্ত ছিল—

দৃষ্টান্তমাত্র নয়, সত্যিকার হওয়া এবং সম্পূর্ণ জানা—একজন বহু বছর আমার সঙ্গে থেকে দেহত্যাগ (স্থূলদেহ ত্যাগ) করবার পরেও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে না গিয়ে চেতন সংস্পর্শ বজায় রাখলে জীবিত অন্য একজনের সঙ্গে, আর এই অনুষঙ্গের ফলে আপন চেতনাকে সে জীবিতই রাখলে। আমি তার নাম বলব না আর ঘটনাগুলিও বলব না, কিন্তু এ একেবারে খাঁটি কথা এবং তা এখনও চলছে।

অনেক কাল পূর্বে এই ব্যাপার আমি দেখেছিলাম, কিন্তু আজই সকালে নতুন চেতনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ওটা এসে গেল। তার ফলে (এই "অনুষঙ্গ") এই হলো যে অপর ব্যক্তির চেতনার ক্রিয়া ও সামর্থ্য পর্যন্ত বদ্‌লে গেল—সম্পূর্ণ চেতন অন্য এক জীবন। যখন অশরীরী তখন সেই চেতনাই চেতন ছিল, কিন্তু রাত্রে সূক্ষ্মদর্শনে দেখা যেতো তার উপস্থিতি।

এমনি আরো আছে। তবে এই ঘটনাটি আমার খুব কাছের এবং খুবই ঘনিষ্ট হওয়াতে আমি তার সকল বৃত্তান্তই জেনেছিলাম।

এখনকার নতুন দৃষ্টিতে তা আরো স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট হয়েছে—কারণ, কেমন ক'রে বলি আমি জানতামই, আগেই সব জানতাম কিন্তু এই নতুন চেতনাতে ও নতুন দৃষ্টিতে আরো সানন্দিক ও পরিপূর্ণভাবে জানছি। প্রথম জানার মধ্যে যা ফাঁক ছিল তার পূরণ হয়ে গেছে কারণ তা ছিল প্রাণে ও মনে জানা, আর এখনকার জানা হলো কোষগুলির চেতনাতে জানা।

এটি আরো মনোরম হতো যদি ঘটনাগুলিও সব আমি বলে যেতে পারতাম (কিন্তু তা বলা যায় না)। এখন আমি আরো সম্পূর্ণ আরো "নির্ব্যক্তিকভাবে" জানতে চাই, ঘটনার দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়ে নয়, কিন্তু সমগ্র পদ্ধতিটাই যাতে দেখতে পাওয়া যায়। তবেই আমি এ সম্বন্ধে সমস্ত বলব।

তাও ঠিক এসে যাবে।* শ্রীমা

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

পথের কথা

(১)

জানুয়ারী ২১, ১৯৬৭

একটা ব্যাপার ঘটেছে যার বর্ণনা করা কিছু মুশকিল।

দেহ তার অভ্যাস মতো কাজ করে যাচ্ছিল স্বয়ংচালিত ভাবে ও খুবই স্বাভাবিক রূপে, তার কর্মধারার মধ্যে শুরুত্বের বিচারের কোনো প্রশ্নই ছিল না, অর্থাৎ মনের ও প্রাণের দিক থেকে যেমন দেখা হয় যে অমুক কাজটা "দরকারী" কিংবা অমুকটা "পছন্দসই" কিনা, তেমন কিছুই ছিল না। কিন্তু তার পরে এখন দেহের কোষগুলি উঠেছে চেতন হয়ে, তারা এখন যেন তফাতে সরে দাঁড়িয়ে (না হাত নেড়ে সরে দাঁড়াবার ভঙ্গী করলেন) নিজেদের দিকে চেয়ে দেখছে যে কেমন ভাবে তারা কাজ করছে : তাদের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে যে এত কিছু করবার উদ্দেশ্য কি। তাদের মধ্যে জানবার স্পৃহা জেগেছে যে "কেন,—কেমন ক'রে কি হবে? আমাদের কাজ কি, সে কাজের সার্থকতা কি, ভিত্তি কি? আমাদের জীবনের ভিত্তি কি ও নিরিখ কি হতে পারে?" মনের ভাষাতে বলতে গেলে এই বলা যায় "যখন দিব্যে পরিণত হবো তখন কেমন হবে? তখনকার তফাৎটা কি হবে? দিব্য অস্তিত্ব কেমন জিনিস?" এবং যে ও কথা বলছে সে এই ধরণের এক সামগ্রিক ভিত্তিমূলক স্থূল দেহ যা হাজার হাজার সূক্ষ্ম কোষবস্তু দিয়ে গড়া যারা স্বতন্ত্র অবস্থায় সম্পূর্ণ উদাসীন, কেবল সমগ্রটিকে গড়ে তোলা এবং তারই ক্রিয়ার অবলম্বন স্বরূপ হওয়া ভিন্ন যাদের অস্তিত্বের নিজস্ব কোনো হেতু নেই, স্বতন্ত্রভাবে দেখলে যাদের কোনো অর্থই নেই। অথচ সেই যা হচ্ছে তার একই জিনিস একরূপ গ্রহিষ্ণুতা, নীরবে নিজেকে খুলে রেখে ঐ জিনিসকে ঢুকে আসতে দেওয়া ; অস্তিত্বের এক অতি সূক্ষ্মতন বোধ যা হবে দীপ্তিময়, সুসঙ্গত।

এই প্রকার অস্তিত্বের কথা এখনও বর্ণনাতীত ; কিন্তু সন্ধানের দৃষ্টিতে নিত্যই বোধ আসে (দৃশ্যমান রূপে) একটা বহুবর্ণসমন্বিত জ্যোতির, যার মধ্যে সকল রকমের বর্ণই দীপ্যমান, স্তরে স্তরে নয় কিন্তু ছোপ্ দেওয়া সমুদয় বর্ণের একত্র সংযোগ (না হাত নেড়ে নেড়ে ছোপ্ দেবার ভঙ্গী করলেন)। প্রায় দুই বছর আগে (তার বেশিও হতে পারে, ঠিক মনে নেই) আমার সাক্ষাৎ হয় কয়েকজন

তান্ত্রিকের সঙ্গে, তাদের সংস্পর্শে আমি ঐরূপ আলো দেখতে শুরু করলাম, তখন ভাবলাম ও বুঝি "তান্ত্রিক জ্যোতি", জগৎকে বুঝি এমনি তান্ত্রিকভাবে দেখা যায়। কিন্তু এখন তা আমি নিত্যই দেখি, সব কিছুতেই, একে বলা যায় "জড়বস্তুকে প্রকৃত বোধ"। সকল বর্ণই একত্রে দীপ্তি পাচ্ছে ছোপ্ ছোপ্ ভাবে (না আবার হাত নেড়ে দেখালেন) কিন্তু পরস্পরে মিশে যায়না। এইরূপ ভাবে সব কিছুই তৈরি। মনে হয় যে এই হলো অস্তিত্বের আসল রীতি—এখনও নিশ্চয় ক'রে বলতে পারিনা, কিন্তু এ যে এক চেতন অস্তিত্বের স্বরূপ তাতে সন্দেহ নেই।

আর আমি তা সর্বক্ষণই দেখছি, চোখ চেয়ে, চোখ বুজে, সর্বদা। আর সেই সঙ্গে অদ্ভুত এক অনুভব (দেহের মধ্যে), যেন এক আয়াসভেদ্য সূক্ষ্মতা, গঠনের সাবলীলতা অর্থাৎ কাঠিন্যবর্জিত (আকারের বিলোপ নয়, তার কাঠিন্যের বিলোপ) ; এই আকারের মধ্যেই এক সাবলীলতা। আর সমগ্র দেহ প্রথম যখন তার কোনো অংশে এটি অনুভব করলে...তখন ভাবলে, হতবুদ্ধি হয়ে তখন সে মনে করলে বুঝি তার ভিতরকার কিছু জিনিস বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু স্থির হয়ে নীরবে অপেক্ষা ক'রে থেকে দেখা গেল যে তা নয়, কোষগুলিরই এক নতুন ধরণের তারল্যধর্মী সাবলীল অস্তিত্ব।

সম্ভবত দৈহিক অহংভাবের জায়গাতে এই জিনিস এসে দাঁড়ালে অর্থাৎ দেহগঠনের মধ্যে যে কাঠিন্যবোধ রয়েছে তা ঘুচে গিয়ে এইরূপ এক নতুন ধরণের অস্তিত্ববোধ আসবে। কিন্তু তাতে তার প্রথম স্পর্শটা খুবই "বিস্ময়কর" ঠেকবে, পরে দেহ ক্রমশ তাতে অভ্যস্ত হয়ে আসবে। আগেকার এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তাতে যাবার মুখেই কিছু মুশকিল হয়। যদিও তা ক্রমিকভাবে ঘটে, তথাপি সেই মুহূর্তে (উত্তরণ মুহূর্তে) একটা কিছু হয়, যদিও কয়েক মুহূর্তের জন্য...যা হয় তাকে বলা যায় "অপ্রত্যাশিত"।

আগেকার অভ্যাস মাত্রই এইভাবে দূর হয়। প্রত্যেকটি বৃত্তির বেলাতেও তাই পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া—সকল কিছুতেই। আর যারা পরিবর্তনের সময় তা হঠাৎ হয়ে যায়না, মাঝে একটা অস্থিরতার অবস্থা আসে, সেটাই হয় কষ্টকর। শুধু নিরন্তর একটা অটুট অটল অবিচ্ছিন্ন শ্রদ্ধা, ভগবানের নিশ্চিত অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা ধ্রুব বিশ্বাস, এতেই বাহ্যতঃ সকল দিক বজায় রেখেই সকলকে পার করিয়ে দেয়।

আর এইগুলি যেন সাধারণ তৎপরতার, বাহ্যিক জীবনক্রিয়ার ও অভ্যাসের বড়ো বড়ো ঢেউ, যতবার হটিয়ে দেওয়া হয় ততবার আবার ফিরে এসে ঘেরাও

করে, আবার তাকে ঠেলে সরাতে হয়। আমি তাই দেখেছি যে এত বছর যাবৎ দেহ ও মনগ্র দেহচেতনা কেবলই তার পুরোনো খাচে ফিরে এসেছে, যাতে চেষ্টাকে এড়িয়ে গিয়ে তা নিরাপদে চালু থাকে: কিন্তু এখন তারা সেটা আর না করতে রাজী হয়েছে, বরং এখন বলছে, "আচ্ছা তাই হোক, যদি ভাঙতেই হয় তো তাই হয়ে যাক." অর্থাৎ যা হবার তাতেই সম্মত।

মনের মধ্যে, অর্থাৎ দেহাশ্রিত মনের মধ্যে যখন এমন ভাব আসে (অনেক বছর আগেও আমি তা লক্ষ্য করেছি) তখন লোকে ভাবে যে বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছি, তারা ভয় পেয়ে যায় (আর ভয়ের মধ্যেই সব কিছু হয়), আর তখন ওর থেকে নিষ্কৃতি পেতে তাড়াতাড়ি ফিরে যায় সাধারণ চেতনাতে। স্থূলদেহের বেলাতেও ঠিক তাই না হলেও অনুরূপ জিনিস হয়: মনে হয় স্বাভাবিক দৃঢ়তা বুঝি লোপ পাচ্ছে। অনেক কাল—অনেক কাল পর্যন্ত এইভাবে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপার চলছিল পরে আবার ধীরে সুস্থে কাজ শুরু করা হচ্ছিল। কিন্তু এখন আর তা ওরা বলছেনা, বলছে: "যা হবার তাই হোক, দেখাই যাকনা."—অনেকটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের ধরণে।

কী হবে এবার—কী হবে? "কেমনতরো হবো আমরা? কেমন ভাবে তা হবো?"

জিনিসটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

মার্চ ৮, ১৯৬৭

এই রূপান্তরের ব্যাপার নিয়ে আমি ক্রমশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে তিনরূপ পথে ওতে অগ্রসর হওয়া যায়, আর পুরোপুরি রূপান্তর আনতে হলে সেই তিন রকম উপায়ই অবলম্বন করা দরকার।

তার মধ্যে একটি, যেটি সব চেয়ে জরুরী, তাকে বলা যেতে পারে "আধ্যাত্মিক" উপায়, পরাচেতনার সংস্পর্শে আসা। হাঁ, তার তিন দিক দিয়েই—প্রেম, চেতনা, শক্তি—সেই পরমতত্ত্ব প্রেম-চেতনা-শক্তির সংস্পর্শে এসে তার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ। দেহকোষগুলি গ্রহিষ্ণু হয়ে তাকে গ্রহণ করবে ও অভিব্যক্ত করবে, তাইতেই পরিণত হবে।

সকল উপায়ের মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ এবং অপরিহার্য।

আর এক, গুহাবিদ্যার উপায়, যাতে দরকার হয় মধ্যবর্তী স্তরগুলির সাহায্য। সেই সকল স্তরের যত শক্তি এবং সত্তা তার খবর জেনে তাকেই কাজে লাগানো হয়। এতে অধিনানস স্তরের দেবতাদের সাহায্য নেওয়া হয়। এই হলো দ্বিতীয় পন্থা। এতে বিশ্বনাতার সকল দিকের, শিব কৃষ্ণ প্রভৃতি সকল জনের সাহায্য মেলে।

অন্য এক উপায়, উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তির প্রচেষ্টাকে নিরোগ করা হয় বিজ্ঞানের সীমানা ছাড়িয়ে, নীচের দিক থেকে চেষ্টা উপরের দিকে। এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। এতে তন্ত্র তন্ত্র ক্রিয়ার ফলে মোটামুটিভাবে পাবার সম্ভাবনা কমিয়ে দিয়ে তার বদলে সরাসরিভাবে সুনির্দিষ্ট জিনিসটা মেলে।

তিন উপায়ের একত্র সংযোগে কাজটা তাড়াতাড়ি হতে পারে।

প্রথম উপায়টি ভিন্ন কোনো কিছুই সম্ভব নয়, ওটির অভাবে অন্যগুলি মিথ্যা হয়ে যায়, কেবল অনির্দিষ্টভাবে ঘুরপাক খাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় না। কিন্তু প্রথমটির সঙ্গে যদি অপর দুটিকে যোগ করতে পারো, তাহলে এ কাজ সরাসরি হবে, নির্ভুল হবে ও ত্বরান্বিত হবে।

বর্তমান "নিরীক্ষা"র ফলে এই কথাই জানা গেল।

শ্রীমা

শ্রীঅরবিন্দের যোগ*

সুধা বসু

(৮)

পূর্ণযোগের সহায়চতুষ্টয় ও যোগদীক্ষার বিষয় আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এবার যোগসাধনার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ কি নির্দেশ দিয়েছেন তা আমাদের বুঝে নিতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণযোগের সাধনাকে প্রাচীন যোগপন্থাগুলির সমন্বয়ে নবীন করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সমন্বয়ের অর্থ এ নয় যে খণ্ড খণ্ড করে সংগ্রহ করে তাই জোড়া দিয়ে দিয়ে একে নির্মাণ করা হয়েছে। যোগসাধন প্রাণের ধর্ম, তা জীবনের স্পন্দে স্পন্দিত। যোগের ক্রিয়া সর্বাঙ্গীণ অখণ্ড নিটোল। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে আলাদা আলাদা করে জুড়ে জুড়ে একটি জীবিত মানুষ গড়ে ওঠে না বা তাকে জানা যায় না। কিন্তু পূর্ণভাবে একটি মানুষকে অখণ্ডভাবে জানতে পারলে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। আবার সমগ্র মানবজাতির সম্বন্ধে সামান্য ও বিশেষজ্ঞানও তা থেকে পাওয়া যায়। পূর্ণযোগের সাধন-শরীরটিও সেইরকম প্রাচীন যোগপথগুলি সমন্বিত করে সব সাধনের সার বস্তু উদ্ধার ও গ্রহণ করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পূর্ণযোগের অবয়ব সংস্থান জানতে হলে তার অখণ্ড ও সমগ্র বোধে বোধ মিলিয়ে সাধন করেই সেটা জানবার চেষ্টা করতে হবে। তাতে প্রাচীন সাধন পদ্ধতির মর্মোদ্ধার করেও এর রীতি ও নীতিতে একটি নবীন প্রাণের নক্সা পাওয়া যাবে যাতে পদে পদে পথ চলার হদিস মিলবে।

মনের ওপারে তাকে চাপিয়ে আছে যে অধ্যাত্মশক্তি তাকে বলা হয় বোধি। এই বোধিকে অবলম্বন করে তিনটি বৃত্তি দেখা দেয়—ইচ্ছা জ্ঞান ও বেদনা (feeling)। এদের আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। কর্ম জ্ঞান ও ভাব আমাদের ভিতরে একই সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জীবনের চলা ফেরা কর্ম ভোগ শান্তি স্থিতি সবের মধ্যেই তা সব মানুষে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। আবার দেখা যায় যে প্রতিটি মানুষের গড়ন ও ধরনে এক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কেউ কর্মঠ কেউ জিজ্ঞাসু কেউ ভাবুক—অর্থাৎ তাদের মধ্যে কর্ম জ্ঞান ও ভাব একসঙ্গে থাকলেও কারও কর্মে কারও

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

জ্ঞানে আবার কারও বা ভক্তিতে প্রবণতা বেশী। যার মধ্যে যেটা প্রধান সেটা অবলম্বন করে চললে অবশ্য পথ চলা সহজ হয়। কিন্তু তিনটি একেরই সমভাবে সাধ্য এবং জীবনে তিনটি কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এটা প্রথমেই বুঝে নিতে হবে। গীতা ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ এই যোগত্রয়ী যে একায়, সেটা ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই ত্রয়ী ছাড়াও হঠযোগ ও রাজযোগ এই দুই যোগপথ ও তাদের বিধান সাধারণভাবে সব যোগের মধ্যেই আছে। পূর্বে এগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করে যোগসাধনে এগুলির অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখেছি। পূর্ণযোগের সাধককে তার নিজের সাধনে প্রত্যেকটিকেই সমন্বিত করে নিতে হবে যার যতটুকু প্রয়োজন সেটা বুঝে নিয়ে। তার অধিক নয়, কমও নয়।

শ্রীঅরবিন্দ প্রথমেই কর্মযোগ, তারপর জ্ঞানযোগ তারপরে ভক্তিযোগ ও শেষে চতুর্থ পাদে এসে আত্মসিদ্ধিযোগের (**Yoga of Self-perfection**) কথা বলেছেন। প্রথম দিকে যোগত্রয়ীর প্রাচীন মার্গ ও বিধান থাকলেও সেগুলির অনুবৃত্তি মাত্র করা হয়নি, নতুন করে সেগুলিতে প্রাণসঞ্চার করা হয়েছে। তিনি এদের নামও দিয়েছেন বিভিন্ন, তাতে বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে। কর্মযোগকেও তিনি বলেছেন **The Yoga of Divine work** (দিব্যকর্মযোগ)। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ যথাক্রমে **The Yoga of Integral knowledge** (পূর্ণজ্ঞানযোগ) ও **The Yoga of Divine Love** (দিব্যপ্রেমযোগ) নাম পেয়েছে, সমন্বয়ের দিকটি ও দিব্য সমগ্র ভাবনার ইঙ্গিতটি এই নামকরণেই পরিস্ফুট। সাধকের যে দিকেই প্রবণতা থাকুক সে পথ ধরে সে পূর্ণভাবেই অগ্রসর হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসিদ্ধির যোগে (**The Yoga of Self-perfection**) উন্নীত হলে পরে পরম সমন্বয় সে লাভ করবে।

গীতাতে আমরা যেমন পেয়েছি—কর্ম দিয়েই সাধারণত যোগ শুরু করা যায়। সর্ব কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে জ্ঞানে—"সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। যোগ শেষ পরিণতি ও পূর্ণতা লাভ করে ভক্তিতে। আমরা যে কোন যোগপথ আশ্রয় করি না কেন, আত্মাকে জেনে সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তা পূর্ণযোগ হবে না। সমন্বয় বোধটি গোড়া থেকেই আট বেঁধে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রথম সাধককে ওই যোগত্রয়ী অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যাতে ওই সঙ্গে নিজের মূল রুচি বুঝে নিজেকে পূর্ণ করে চলা সম্ভব হয়। এইভাবে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি একসঙ্গে স্বভাবে মিলিয়ে নিয়ে আত্মবোধের আলোতে নিজের ঘটটি ভরে নিতে নিতে চলা আরম্ভ করলে সেটা হবে যথার্থ পূর্ণযোগের সাধনা। কিন্তু গোড়াতেই শ্রীঅরবিন্দ সে কথা না বলে প্রাচীন পথগুলির বিশ্লেষণ সমীক্ষা ও অনুীক্ষা করে করে

পূর্ণযোগের সাধন নির্বাচন করার কৌশলটি ধরাতে চেয়েছেন, যাতে মানবশক্তি সংগ্রহ করে সাধক তার নিজস্ব পথটি চিনে নিয়ে অগ্রসর হতে পারে। অথচ পূর্ণযোগের যথার্থ অধিকারী যে খুবই কম এটা আমরা ভাল করেই বুঝতে পেরেছি। শ্রীঅরবিন্দ প্রাচীন যোগপন্থাগুলিকেও পূর্ণ করে নবীন করে তুলেছেন, তাদের প্রত্যাখ্যান করেননি।

All life is Yoga অর্থাৎ যা জীবন তাই যোগ, এই যদি সত্য হয় তাহলে এও বলতে হয় যে যা জীবন তাই কর্ম। সেজন্য কর্ম ছাড়া যোগ হতেই পারে না। যোগের প্রসঙ্গে গোড়াতেই কর্মের কথা আসে। জীবনের আদি ও অন্ত যোগ হলে কর্ম পেয়েই বসে আর তাতে রসের যোগান পড়লে হয় ভাবসঞ্চার। পরে তাতে জ্ঞানের উন্মেষ হয়। কর্ম না করে থাকা সম্ভব নয়। সর্বজনীন যে পূর্ণযোগ তাতে কর্ম কখনও বিযুক্ত নয়। পতঞ্জলিও কর্মের কথা ভেবে-ছিলেন এবং রাজযোগের প্রাথমিক অংশে ক্রিয়াযোগের কথা বলেছেন। এই ক্রিয়াযোগ হল জীবনের চলা-ফেরার মধ্যে থেকেই যোগ, জীবন থেকে বিযুক্ত নয়। অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনে অনেক সময় এই চলা-ফেরার জীবন থেকে বিযুক্ত হতে হয়, সকলের মধ্যে থেকে তা করা যায় না। কিন্তু ক্রিয়াযোগের ফলে সাধকের সর্বাঙ্গ সিদ্ধি হতে পারে, যোগশাস্ত্রকার একথা বলেছেন। এই ভাবনার উৎস গীতায়। তারও পূর্বে ছান্দোগ্যোপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশে আমরা এই সন্ধান পেয়েছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ হঠযোগ ও রাজযোগকে জ্ঞানযোগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেখানে উদ্দেশ্য ছিল মনোলয় দ্বারা মনের ওপারে যাওয়া। ধ্যানের ফলে সমাধি ও তার পরিপাককে জ্ঞান। জ্ঞানযোগের প্রসঙ্গে এগুলির আলোচনা বিশদভাবে আছে। আমরা এখন কর্মযোগ দিয়েই আলোচনা আরম্ভ করব।

Self-Surrender in works—সমর্পণ-বুদ্ধি নিয়ে কর্ম করা কর্মযোগের প্রাথমিক অনুশাসন। তাঁর কাজই আমার কাজ এই ভাব আসা চাই। গীতা আগাগোড়া এই ভাবে কর্ম করার শিক্ষা দিয়েছেন। কর্ম কি? না, একটা কিছু করা। কিছু না করে এক মুহূর্তও বেঁচে থাকা যায় না। প্রকৃতিই কর্ম করিয়ে নেয়—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ"। কিন্তু সেই কর্মের লক্ষণ কি আর লক্ষ্যই বা কি তা তো জানতে হবে। গীতাই বলেছেন—"ভূতোদ্ভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ"; পরম চৈতন্য থেকে শক্তির উৎসারণই কর্ম। সেই পরম অক্ষর থেকে যে কর্ম উথলে পড়েছে, তাঁর স্বভাব থেকেই তা উদ্ভূত। কর্মই হল তাঁর বিসৃষ্টি। একটা অব্যক্ত আশয় (**Matrix**) রয়েছে, তাকে বলতে পারি মূল প্রকৃতি এবং

তা যতেই ভূতসৃষ্টি। ভূতকে আশ্রয় করে যে ভাব তা চিৎপ্রকর্ষ। এই চিৎএর প্রকর্ষই হল জীবের মূল স্বরূপ বা স্বভাব যাকে অধ্যাত্ম বলা হয়েছে।

জড় থেকে চৈতন্যের অভিযানে জড়ত্বের পর উদ্ভিদের মধ্যে এসে জড়ের সুপ্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন, আবদ্ধ এক আধোজাগার অবস্থায় উন্মেষিত। মনু তাকে বলেছেন অন্তঃসংজ্ঞ অবস্থা। এর পর পশুর মধ্যে এসে সেই আচ্ছন্ন চৈতন্যশক্তিতে প্রাণের প্রবলতা বলের ভূয়ঃ প্রকাশ ক্রমে উন্মেষিত হয়েছে কিন্তু তাতে মন বা মস্তিষ্কের ছাঁচ তখনও নিরাকৃত। মানুষ জাতিতে চৈতন্যের প্রকাশে সেই মন জাগতে আরম্ভ করেছে। একটা ক্রম ধরে বিকাশের উন্মুখীনতায় জড়ের আধারেই প্রাণচৈতন্য প্রকৃষ্ট ভাবে ফলিত হয়েছে মানুষের বুদ্ধিতে। এই প্রাকৃত বুদ্ধি দিয়ে মানুষ নির্মাণ করেছে তার জীবনের বহুল উপকরণ। সভ্যতার অভ্যুদয়ে বুদ্ধির বলই শ্রেষ্ঠ বল। কিন্তু এই মানুষ অন্তরাবৃত্ত হয়ে যখন যোগী হল, তখন তার অহংকেন্দ্রে সচেতন এই মনবুদ্ধিকেই সে আর এই ভাবে উন্মীলিত হতে দেখতে ও বুঝতে পারল। এ এক ধুন ভাঙার মতই মানবচৈতন্য প্রাকৃত দশা থেকে মুক্তি পেয়ে বিজ্ঞান ও আনন্দের সন্ধান পেল। সেই যোগের অধিকার মানুষ ব্রহ্মবোধের প্রতিবোধে সব কিছু জানবার শক্তি লাভ করেছে, যা জানতে পারলে আর অজানা কিছু থাকে না। এই ভাবে মূল রসের বা প্রেমের সন্ধান পেয়ে চেতনার নিত্য নব পরিচয় ও আলোর দিগন্ত সব যোগীর কাছে খুলে যেতে আরম্ভ করেছে। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের এই হল যোগকর্ম। এমন করে ভূতের মধ্যে ভাবের উৎকর্ষ হয়ে চলেছে। বিশ্বসৃষ্টিতে পরম পুরুষের এই যজ্ঞকর্মে অক্ষর থেকে ক্ষরণ ও আবার সেই চিৎপ্রকর্ষের ধারা ধরে উজিয়ে স্বধামে যাওয়া—এই যোগের ক্রিয়া আপনা হতেই প্রকৃতিতে প্রসর্পিত হয়ে চলেছে তার স্বভাব অনুযায়ী। পরম পুরুষের তাই ইচ্ছা। জড় থেকে প্রাণে ও পরে মনে যে স্বতঃস্ফূর্ত যোগক্রিয়া, তাতে মানুষের দায় ছিল না। কিন্তু মানব মনে সচেতন বোধ এসে পড়ায় তাঁর লীলাকর্মে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ও দায় মানুষের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। তার পরিণতি ও লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে মানুষকেই দিব্যস্বভাবের অধিকারটি বুঝে নিতে হবে। এতে ক্রমবিকাশের পথে কালও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে। অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জীবের বিলুপ্তির মত এক পুনরাবৃত্তি ও মহতী বিনষ্টি হতে এই মানব জাতিকে অন্তরাবৃত্ত যোগকর্মের পথেই রক্ষা পেতে হবে। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এ দুয়েরই যেটা কাম্য বা পরাগতি তা এই অন্তরাবৃত্ত যোগকর্মের ফল।

অন্তর্মুখীনতা ও আত্মসচেতনতা থেকেই যোগকর্মের শুরু একথা অনেকবার

উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যখন অন্তরে রসের যোগান পেয়ে ভাবের রাজ্য খুলে যেতে থাকে, তখন সেই রসাস্বাদনের তীব্র নেশায় কিম্বা জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোয় কেন্দ্রের সবটা ফাঁকা পড়ে তার রঙ্গকাণ্ডিতে যোগী সাধক আর বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছা করেন না, এমন অবস্থা এসে পড়তে পারে। এ অবস্থায় জগৎ-বিমুখীনতা আসে এবং কর্ম তখন গৌণ হয়ে যায়। সেটা পূর্ণযোগীর লক্ষ্য নয়। সেজন্য গীতায় উপদেশ করা হয়েছে যোগস্থ থেকে কর্ম করে যেতে হবে। কর্ম ত্যাগ করা কোন মতেই চলবে না। এমন যে ঘোর কর্ম সম্মুখ সমর, তাকে পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রে যোগকর্ম বলে দেখিয়ে দিয়ে যোগস্থ থেকে যুদ্ধ করতে উপদেশ করে সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে অর্জুনকে নানা ভাবে সব দিক দিয়ে ভগবান বুঝিয়ে দিয়েছেন। জ্ঞান ও প্রেম হল ভিতরের উপলব্ধির বস্তু, কর্মে সেই বস্তু উৎসারিত হয়। তাই শুধু কর্ম দেখে সাধারণ লোকে যোগীর ভাব বুঝতে পারে না। কর্ম যদি জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত তবে কেন এই ঘোর কর্ম যুদ্ধের নির্দেশ—এই বিভ্রান্তি ও প্রমাদ অর্জুনের প্রশ্নে ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে কর্মকে জ্ঞানের সমান মর্যাদা দিয়েছেন যাতে অকর্মবাদ খণ্ডিত হয়ে যায়। জীবনের মূলনায়নে কর্ম ও জ্ঞানকে যথাস্থান দিয়ে তিনি বলেছেন নৈকর্ম্যও চাই। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে হাত পা ছেড়ে দিয়ে নিয়ত কর্ম পরিত্যাগ করে বসে থাকতে হবে। কোন মতলব না রেখে কর্মফলের অপেক্ষা না করে প্রশান্ত যোগস্থ হয়ে কর্ম করা চাই। "অনাশ্রিত কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্নচাক্রিয়ঃ॥" এই সব কথা বলে কর্মযোগেই শ্রীকৃষ্ণ বারবার বিভিন্ন দিক দিয়ে দিয়ে দেখিয়ে অর্জুনের বুদ্ধিকে আকর্ষণ করেছেন। এতে কর্ম-বিরতির নেশা ছুটে যায় ও অকর্মবাদের মূল পর্যন্ত সব জট খুলে যায়। কিন্তু কর্মকে নিয়ে গেলেন কোথায়? "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।" অসঙ্গ হয়ে যোগস্থ থেকে যে কর্ম সে কর্মই বা কেমন সেটা তো বুঝে দেখতে হবে।

কর্তব্য কর্ম বা সহজকর্মের যে প্রবৃত্তি নিয়েই মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে তা সহসা ছেড়ে দিতে নেই। তাকেই যোগকর্মে রূপায়িত করতে হবে। প্রত্যেক মানুষের যে নিয়ত বা নির্দিষ্ট কর্ম আছে, সেটা বুঝে নিতে হয়। কিন্তু সেটাই যদি তাকে পেয়ে বসে, তাহলে তা নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে এক মদমত্ততার সৃষ্টি হয় এবং অশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিতে সেটা পাকে পাকে জড়াতে থাকে। তাই কর্ম যখন এরকম বন্ধনের কারণ হয় তা বুঝতে পারলে কর্মত্যাগের কথা বলা আছে। কেন

না জ্ঞানেই দিব্যকর্মের প্রতিষ্ঠা হবে, অজ্ঞানে নয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষের দিকে গীতা বলছেন—

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"

যা তোমার স্বভাবে সহজ কর্ম তাই দিয়ে তাঁর অর্চনা করবে। সেই কর্মেই তখন চরম সিদ্ধি লাভ হবে। কিন্তু মূলের ওই কথাটা ভুললে চলবে না যে যা থেকে সর্বভূতের প্রবৃত্তি এবং যা দিয়ে এই সবই ব্যাপ্ত, স্বভাবকর্ম দ্বারা সেই তিনিই অর্চনীয়। সেই পরম সত্তার স্বভাব হতেই আমার স্বভাব ও স্বকর্ম। আমার ভিতর থেকে তিনিই কর্ম ঠেলে ঠেলে দিচ্ছেন। তখন "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই ভাবই পেয়ে বসবে। অর্থাৎ তুমি হৃদয়ে থেকে যেমন আমাকে যাতে নিযুক্ত কর আমিও তেমন তাই করে থাকি—এই দৃষ্টি ও অনুভব খুলে যাবে। কর্মযোগের পরমা গতি হল এই হৃদিস্থিত অন্তর্যামীর কর্মে আত্মসমর্পণ। কিন্তু এই সিদ্ধি আসে সকলের শেষে, তাই এই ধারণাটি গোড়ায় একটু ধরিয়ে দিয়ে প্রাকৃত মানব কর্ম থেকে দিব্য কর্ম পর্যন্ত কর্মের এক গতি-পরম্পরা ও চলার পথটি দেখান হয়েছে। তার পাঁচটি ভূমি। প্রথমেই আসে শরীর যাত্রা নির্বাহ বা জীবন ধারণের জন্য কর্ম। দ্বিতীয় ভূমিতে লোকসংগ্রহের জন্য বা বিশ্বহিতের উদ্দেশ্যে কর্ম। তৃতীয় ভূমিতে পাই কৃৎস্নকর্ম—যোগীকে যেভাবে কর্ম করতে হবে সেই অকর্তার কর্ম। চতুর্থ ভূমিতে নিমিত্ত কর্ম এবং এসবের পরিপাকে পঞ্চম ভূমিতে দিব্যকর্মের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রধানত গীতা অবলম্বন করে শ্রীঅরবিন্দ এগুলি ব্যাখ্যা করলেও তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে কর্মের যোগপথগুলিকে আলোকিত করেছেন এক চিরনবীনতা দিয়ে।

জীবন ধারণের জন্য কর্মের কথা প্রথমেই আসে। কেননা কর্মত্যাগীকেও ভিক্ষা করে শরীর রক্ষা করতে হয়। আধুনিকযুগে এই কর্মে বিশেষ জোর দেওয়া হয়ে থাকে, এটা **economic level**-এর কর্ম। এ সম্বন্ধে আমরা বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গ মার্গের সম্যক্ আজীবিকাকে ধরতে পারি। মানুষকে এমন জীবিকা বেছে নিতে হবে যেটা তার স্বভাবের বা অধ্যাত্ম জীবনের পরিপন্থী না হয়। এ যুগে এই জীবিকারও বিভ্রাট ঘটেছে দেখা যায়। কর্মের জন্যই কর্ম করা হয়, ভাবের সঙ্গে যোগ নেই। অনেকে আবার জীবিকার জন্যও কর্ম পায় না। প্রত্যেকের স্বভাব অনুযায়ী স্বকর্ম যে সমাজ দিতে পারে তাকে যথার্থ ধর্মসমাজ বলা যায়। সেখানে যার যে যোগ্যতা

তা কর্মে মুক্তি পেলে সুস্থ ও সমৃদ্ধ মানব সমাজ গড়ে ওঠে। অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে কর্মের সংঘর্ষ তখন দূর হয়।

দ্বিতীয়পর্বে লোকসংগ্রহ কর্ম, বহুজনহিতায় বৃহত্তর মানব সমাজের জন্য কল্যাণ-কর্ম। আলোচনা করতে গেলে প্রথমে এতে কল্যাণ রূপটিই দৃষ্টিগোচর হয়, তাতে চেতনার ব্যাপ্তি ঘটে। এ যুগেও মানবতাবাদ (Humanism), পরোপকারবাদ (Utilitarianism) এই সব আদর্শ সামনে রেখে কর্ম করার প্রেরণা দেওয়া হয়ে থাকে। স্বভাব অনুযায়ী ব্যক্তির সেই কর্তব্য কর্মের ফলে সমষ্টি মানবজাতি উপকৃত হয় এটা দেখা গেছে। সর্বভূতের হিতৈষণা জনসেবা জীবসেবা দেশসেবা জগৎসেবা ইত্যাদি সবই লোকসংগ্রহ কর্মের মধ্যে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র ও লোকমান্য তিলক গীতার ব্যাখ্যানে এ দিকটায় জোর দিয়েছেন। The greatest good of the greatest number—সর্বাপেক্ষা অধিক জনগণের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ যাতে সাধিত হয়, সেই জগৎহিতবাদই কর্মযোগের মূলে একথা তাঁরা বলতে চেয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করে এর ফলিত দিকটির সারবত্তা দেখিয়ে দিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গী যেন আবার চরমে না যায় সেদিকে সাবধান করেছেন। কেননা জগৎ হিতের জন্য বা পরের কারণে নিঃস্বার্থ হয়ে কর্ম করছি, এ থেকে অহঙ্কার ও প্রমাদ এসে অনেক সময়আমাদের ভুল বিভ্রান্ত করে। মূলে যদি যোগস্থ হয়ে এ কর্ম করা যায় তবেই শেষ রক্ষা হয়, নয়তো শরীরযাত্রা নির্বাহ ও লোক সংগ্রহার্থে কর্ম কর্মযোগ না হয়ে ক্ষুদ্র অহংকে স্ফীত করে শুধু জৈবকর্মেই পর্যবসিত হতে পারে। অধ্যাত্মবোধ বাদ দিলে এ দুটি কর্মই শেষে ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। প্রাকৃত মন নিয়ে যোগ হয়না। যোগে দীক্ষা চাই এবং যোগসাধনই প্রকৃত কর্ম। যোগী যখন শরীর যাত্রা নির্বাহ কর্ম ও লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করেন তখন তার মূল্যও বিভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে এই পরম্পরাটি সাংখ্যদৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কর্মের এই তৃতীয় ভূমিতেই প্রকৃত যোগকর্ম বোঝা যায় যেখানে অকর্তা হয়ে কর্ম করতে হবে। কর্ম হয়ে যায়, তুমি দ্রষ্টা মাত্র—এইরকম ভাব। বুদ্ধদেবও বলতেন আত্মসচেতন হয়ে কর্ম করতে হবে। 'আমি'কে বাদ দিয়ে 'আমি' থেকে আলাদা হবার অভ্যাস করলে প্রকৃতিতে কাজ হয়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে ও দেখতে পারা যাবে। এই হল সাংখ্যের বিবেক জ্ঞানের সাধন। পুরুষ দ্রষ্টা মাত্র, প্রকৃতি হতে বিবিক্ত। তখন কর্ম আর অকর্ম এক হয়ে যায়। ভাবটা এই রকম দাঁড়ায়, 'তুমিই করাও কর্ম, লোকে বলে করি আমি', নয়তো আমি কিছুই করিনা অথচ আমাকে দিয়েই কর্ম করা হয়ে যায়। আমার 'আমি' তো বহুরূপী কিন্তু কেন্দ্রে একটি মাত্র যোগস্থ তার রূপ। সে কূটস্থ শান্ত সাক্ষীরূপ অকর্তা।

এই বোধ ধারণায় পেতে হয়। বাহির থেকে বিচিত্র তরঙ্গমালার আঘাতে বাহিরের সব আমিগুলি টলে গেলেও ভিতরে অচল অটল সেই আসল 'অহম্'টি। এই ভাবের ধারণায় ও দেখায় অভ্যস্ত হলে তখন ভিতর হতেই শক্তি ও রস কর্মে উৎসারিত হবে এবং বাহিরের বিচলিত ভাবও আর টলাতে পারবে না। আত্মবোধ ক্রমে ক্রমে জেগে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হবে। তখন পুরুষ বিবিক্ত থেকেও আত্মশক্তিতে সমৃদ্ধ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর আবার উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা। অকর্তা হয়েও কর্মের রাসটি টেনে ধরে থাকা বা অক্ষরে থেকে শক্তি বিচ্ছুরিত করা তখনই সম্ভব হয়। কর্মযোগের এই প্রতিষ্ঠার ভূমি বুঝতে স্বামী বিবেকানন্দের পওহরী বাবার দৃষ্টান্ত দেখানোর কথাটা মনে পড়ে। গুহাহিত থেকেও যোগীর পক্ষে এমন শক্তি সঞ্চার সম্ভব যে প্রতি জীবে সেই যোগশক্তির আবেশ হয়।

অকর্তার কর্ম হলে ব্যাপ্তিচৈতন্যের বোধ আসে। তখন শুধু 'আমি' নই, সমস্ত বিশ্ব কর্ম করে চলেছে এই দৃষ্টির উন্মেষ হতে থাকে। প্রকৃতিই সকলকে কর্ম করিয়ে নিয়ে চলেছে এবং তার মূলে রয়েছে এক দিব্য সংকল্প। তখনই বুঝতে পারা যাবে যে এই 'আমি' সত্যসত্যই তাঁরই মাঝে। দিব্যপুরুষের সংকল্পই আমার স্বাধীন ইচ্ছা বা স্বাতন্ত্র্য। কবির ভাষায় তখন বলতে ইচ্ছা করে—'মোর জীবনের বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।'

এইবার চতুর্থ ভূমি নিমিত্ত কর্মযোগের কথা আসে। ভগবান গীতাতে বিশ্বরূপ দেখিয়ে অর্জুনকে বললেন—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্। আমি পূর্বেই এদের সব বধ করেই রেখেছি, তুমি শুধু নিমিত্তমাত্র হয়ে শত্রু নিধন কর।" শুধু তোমাকে কর্মের আদেশ করছি না, সে কর্মও কালপ্রবাহের মধ্যে সিদ্ধ করে রেখেছি। তুমি বর্তমানে নিমিত্ত হয়ে সেটি সকলের সামনে ফলিয়ে তোল, অর্থাৎ আমার কর্মে তোমাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ কর। যুদ্ধকর্মে তোমার প্রবৃত্তি নিয়েই তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, তোমার স্বভাবে ক্ষত্র বা রজোগুণের ক্রিয়া। তোমার সেই প্রকৃতিই তোমাকে ঘোর কর্ম করিয়ে নেবে। তোমার এই স্বকর্ম বা সহজ কর্মে তুমি নিমিত্ত মাত্র। আমরা ভগবানের কণ্ঠনিঃসৃত এই পরম আশ্বাসের ভরসাকরী বাণী শ্রবণ করলাম। এটি শুধু শোনা নয়, বোঝা নয়, যোগকর্ম করে করে হতে হয় তাঁরই হাতের যন্ত্র। কর্মযোগের এই পর্যন্ত সাধকের সাধ্য। শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছেন 'আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা।'

এর পরে আসে দিব্যকর্মের কথা, যেখানে কর্মযোগ সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ। কর্মযোগের এই চরম লক্ষ্যটি শ্রীঅরবিন্দ অতিমানস সিদ্ধির ফলস্বরূপ দেখিয়েছেন।

গীতায় যেখানে এস ঈশাবা মাত্র আছে অকর্মবাদ সেখানে আর কোন মতেই টিঁকে থাকতে পারে না, বিনষ্ট হয়ে যায়। শ্রীভগবান বলছেন—"নমে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥" এমন কিছুই তো নেই বা থাকতে পারে না বা তাঁকে করে পেতে হবে তবুও তিনি কর্মেই ব্যাপৃত থাকেন, কর্ম ত্যাগ করেন না। এখানে অবতার সম্ভবের আভাস পাওয়া যায়। দিব্যকর্ম বুঝতে হলে ভগবান স্বয়ং অবতরণ করে যে ভাবে কর্ম করেন সেভাবে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। এই অবতরণ সম্ভব হয় কখন? জগতের মূল অধ্যাত্মনীতির ঋতচ্ছন্দ যখন ধর্মের গ্লানিতে বিপর্যস্ত হয় তখন অধর্ম উদ্ভূত হয়ে সৃষ্টিকে রসাতলে টেনে নামিয়ে নিতে চায়। বিনাশের এক চরম মুহূর্ত উপস্থিত হলে ভগবান নিজেই পূর্ণশক্তি নিয়ে এই অপরূপ মনুষ্যরূপেই অবতীর্ণ হন। সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারী যেমন বিনাশ করেন, তেমন আবার ধর্ম সংস্থাপন করে জগৎকে নবীন করে গড়ে তোলেন। এ যুগে এর অর্থ করতে পারি প্রেমধর্মের সংস্থাপন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের যথাকৃত স্বপ্নলীলা সার্থক করতেই না জাগ্রত কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের অবতারণা। কিন্তু আজও তো সে স্বপ্নের সমগ্র সার্থকরূপ জীবনের কোলাহলে আমরা ধরতে পারিনি বা দেখতে পাই না। শ্রীঅরবিন্দ যে তিনটি আমূল রূপান্তরের কথা বলেছেন, তার মধ্যে প্রথমেই **Psychicisation** বা চৈত্য রূপান্তর সম্ভাবিত হলে প্রেমধর্মের প্রতিষ্ঠা হবে। সাধারণ জীবনেও কৈশোর কালে সে চেতনার আভাস পাওয়া যায়। বৃন্দাবনের লীলাও সেখানে কিশোর কিশোরীদের চিত্ত অবলম্বন করে সম্ভাবিত; বয়সের এই ইঙ্গিতটি সেখানে দেওয়া আছে। ভগবানের লীলার সাথী হওয়াই এক্ষেত্রে মানুষের পরম পুরুষার্থ। সমষ্টি মানব চেতনায় চৈত্যপুরুষ জাগ্রত হলে বৃন্দাবনের স্বপ্ন সার্থক হবে। সে হবে এক প্রেমের জগৎ। কর্ম হবে দিব্য, জ্ঞানে উজ্জ্বল ও ভক্তিরসে সমৃদ্ধ। এই চৈত্যরূপান্তর থেকেই পূর্ণশক্তির রূপান্তর ও অতিমানস শক্তির আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। শ্রীঅরবিন্দ **Spiritualisation** ও **Supramentalisation** নাম দিয়ে সেই ব্যক্তি ও সমষ্টির বিরাট সম্ভূতিকে আমাদের সামনে দিব্যরূপে প্রতিভাত করেছেন। এখন আমরা তার আভাস পেলেও সে প্রেমসমাজ গড়ে তুলতে পারিনি। বোধি ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য আনতে পারিনি, এক কথায় প্রাণ দিয়ে আমরা মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারিনি। তাই এত হানাহানি, সংঘর্ষ যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে চলেছে। জীবনের কর্মক্ষেত্রে আমরা বুদ্ধি দিয়ে মীমাংসা করে নিতে চাই কিন্তু হৃদয় থেকে সে বুদ্ধি উৎসারিত না হলে কোন সমাধান আসতে

পারে না। ওদেশেও Christ-এর বাণী ছিল Love Thy neighbour তোমার পাশের লোককে ভালবাসো। হৃদয় পবিত্র না হলে কিছু তো হবে না। আর তা হলেই চৈত্য রূপান্তর সম্ভাবিত হবে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে অবিশ্বাস করি, সন্দেহ করি কিন্তু ভালবাসতে পারি না। এতে বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, ঠাণ্ডা লড়াইএর যন্ত্রণার শেষ নেই। সবই মানবজাতির চৈত্যরূপান্তরের কথা গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এই বিশ্বযুদ্ধ কত বড় এক সমস্যা। তাই না অতিমানস রূপান্তরের পরম সিদ্ধির সময়টি জানতে চাইলে Mother বলেছেন "Let us work 5000 years।" পূর্ণযোগ তো একার নয়! সবার যোগে এ যে এক বিশ্বযজ্ঞ।

এখন শুধু নিজের সাধনা ও মুক্তির কথা ভাবলে তো কোন সমাধান পাওয়া যাবে না। গুহাশ্রিত হয়ে থেকে গেলেও চলবে না, কর্মযোগে যুক্ত হতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন সব সাধকদের যে, একটা জীবন সে কর্মে তারপর ভগবানকে দিস। সাধারণ লোকে যাতে কর্মে আনন্দ পায়, রস পায়, যুক্ত হতে পারে সেজন্য বিদ্বান দূরে সরে থাকতে পারেন না; সকলের সঙ্গে কর্মযোগে তিনি যুক্ত থাকবেন—'জোষয়েৎ সর্ব কর্মাণি'। এই সমস্যাসঙ্কুল যুগে আজ আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। সমগ্র বিশ্ব নিয়েই আমাদের কারবার। কেউ আমরা বিচ্ছিন্ন নই। বাংলার কবিতা লিখতে বসেও কবিকে অনেক দূরে বোমায় চূর্ণ করার দৃশ্য দেখতে হয়, লিখতেও হয়। কাজেই সমস্যা ব্যাপক ও গুরুতর।

কর্মের পঞ্চভূমি আলোচনা করে আমরা দেখলাম যে যোগীকে সর্বব্যাপী বিশ্বচৈতন্যে সমসাময়িক সমস্যাগুলিরও কর্মে মীমাংসা ও সমাধান পর্যন্ত দেখিয়ে দিতে হয়। সম্যক আজীবের কর্ম প্রাথমিক জীবনধারণের কর্ম মাত্র। লোক সংগ্রহার্থে বা বিশ্বহিতের উদ্দেশ্যে ঐ কর্ম ব্যাপ্তি লাভ করে, পরিণত হয়, বৃহৎ হয়। কিন্তু এই দুটি ভূমিতে কর্ম যোগীর কর্ম যেমন হতে পারে আবার প্রাকৃত ভূমিতেও তেমন কর্ম থেকে যেতে পারে। যোগীর কর্ম হলে এর পরের ভূমিকার সন্ধান পাওয়া যাবে, গীতা যাকে বলেছেন কৃৎস্নকর্ম। যথার্থ যোগী অকর্তা হয়েও কর্ম করে চলেছেন, তাই এই ভূমিকেই যোগভূমি বলা যায়। বিবিক্ত তটস্থ থেকে তাই কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম, এইভাবে সিদ্ধ হয়ে চলে। তখন দেখা যায় সমস্ত দুনিয়াই কর্ম করে চলেছে এক দিব্যসংকল্পের বাহন হয়ে, এই পৃথিবীতে সেই দিব্যসংকল্প সিদ্ধ করতে। যেমন আমি তেমন প্রতিটি জীবই এক "নিমিত্তমাত্র"

হয়ে কর্ম করবে—এই নির্দেশ স্বয়ং শ্রীভগবানের। এই নিমিত্ত কর্ম পূর্ণ হবে ও পরিণতি লাভ করবে দিব্যকর্মের প্রতিষ্ঠায়। শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগের বিবৃতিতে প্রধানত গীতার মহান আদর্শ অনুসরণ করে তাতে দিব্য-ভাবনার সমাবেশ ঘটিয়ে দিব্যকর্মকে সম্ভাবিত করেছেন। ভগবানের অবতার কর্মে অংশ গ্রহণ করে দেবকর্মকে মূর্ত করে তোলার আদর্শ পরিস্ফুট হয়েছে কর্মযোগের প্রসঙ্গে শেষের দিকে শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে। পরে এ বিষয়ে আবার বিশদ আলোচনা করা হবে। আমরা এ পর্যন্ত নিশ্চিত করে বুঝলাম যে ভগবানের অচ্যুত প্রতিষ্ঠা থেকে পূর্ণযোগের দেবকর্ম কখনই বিযুক্ত হতে পারে না। কর্তা ও কর্ম অদ্বৈত রসে সাযুজ্য লাভ করে সিদ্ধকর্ম সম্ভাবিত করে চলতে থাকেন, জ্যোতি থেকে উত্তর জ্যোতিতে তার নিত্য নবীন দিগন্তগুলি খুলে যেতে থাকে।

কর্মযোগে গীতার মহান আদর্শ দুটি মূল ভাবের উপর বিধৃত—সমত্ব ও একত্ব। ভগবানের আত্মসমর্পণ কর্মে প্রথমে একত্বের ভাবনায় যেমন জগদতীত পরমাশক্তির আবেশ, সমত্বের ভাবনায় তেমন বিশ্বব্যাপী বৃহতে পরাশক্তির উন্মেষ সূচিত হয়। গীতায় দেখতে পাই প্রথমেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সমাধান দেখানো হল পরম একত্বে, যেখানে মৃত্যুর বা অসৎ থেকেই জীবনের উৎস, সেই সর্বোচ্চ গ্রামের সুরে জীবনসঙ্গীতকে বেঁধে দেওয়া হল। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "অবিনাশী তু তদ্‌বিদ্ধি...", সে এক অবিনাশী পরম সত্তাই (oneness) সমগ্র জগৎজীবন ছেয়ে আছে, তাকে জানো। তাতে প্রতিষ্ঠিত থেকে বোধ মুক্ত করবে কি না। এই অবিনাশী এক আত্মাকে জানা, এতেই শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগের ভাবনার মূল বেঁধে দিয়েছেন। সেই সর্বব্যাপী একপ্রাণই যেমন আমার মাঝে তেমনি সর্বভূতে স্পন্দিত। অস্পন্দ আধারে প্রখর স্পন্দের মত তাঁর কর্ম নিঃসৃত হয়েই চলেছে এই প্রাণস্পন্দের সাথে সাথেই। "একো দেব সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাস সাক্ষী চেতা কেবলোনির্গুণশ্চ।" সেই একমেবই সর্বভূতে একমেবই মহেশ্বর রূপ, তাঁরই কর্ম তিনি কর্ম করে চলেন। এযুগেও co-operative movement-এ সকলে মিলে কাজ করার প্রেরণায় এই মূল একত্ববোধের আভাস মেলে। এতে সঙ্ঘশক্তি দৃঢ় হয়। অহংও ক্ষীণ হয় যদি সকলেই সেই বিরাট ভূতমহেশ্বরেরই অংশ এইভাবে কর্ম করার শিক্ষা পাওয়া যায়।

একত্বের পরেই সমত্বের কথা আসে "সমত্বং যোগ উচ্যতে"। একত্ব বা ঈশ্বরভাবনা পিছনে রেখে চেতনাকে ব্যাপ্ত ও বৃহৎ করলে ঘটে ঘটে রামদর্শন বা সর্বাত্মভাব আসে। সে অবস্থায় সমত্ব রাখার অর্থ কর্মের স্রোত যে যাকেই আশ্রয়

না কেন, তাতে অচল অটল সুমেরুবৎ দৃঢ় থেকে নিজকে বজায় রাখা। কর্মের অধিকার পেয়েছি তাই কর্ম করি। সমষ্টি চৈতন্য থেকে আমার এই অধিকারের মূলে তাঁরই প্রেরণা, এই ভাব। এতে ফলাকাঙ্ক্ষার দোষ কেটে যায় এবং কর্ম হয় নিষ্কাম। জগৎ হিতের জন্য কর্ম করি আর নিজের আদর্শ ধর্মবোধ নিয়ে কর্ম করি কাঁচা আমিটা স্ফীত হতে থাকলেই সর্বনাশ। কিন্তু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মহাপ্রাণও যে কেঁদেছিল সর্বমানবের কল্যাণ কামনায়। সবাকার কান্না তাঁর আত্মাকে অভিভূত করেছিল দিব্য প্রেমে। তাই তাঁর বিরাট কর্মপ্রেরণায় সর্বজীবের পুষ্টি ও কল্যাণ। এ ভাবে দেখতে পারলে কর্ম নিষ্কাম হয়। অকর্তা হয়ে ভগবৎ প্রেরণায় নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠিত হলে কর্মের ও ফলাকাঙ্ক্ষার দোষ কেটে যায়। কর্মফলে ব্যর্থতা এলেও হতাশ ভাব আসতে পারে না। জগদতীত এক পরম বিধান যে কর্মের ভার তিনি দিয়েছেন তাই আবার সহজ কর্ম। আবার সমস্ত মন বুদ্ধি অহং দিয়ে যা করবার করে যাই কিন্তু এই কর্মের প্রযোজক ও কর্মফলের হেতু তো তিনিই। এই বোধে সমতার প্রতিষ্ঠা হয়।

কিন্তু কর্মে সমতার প্রতিষ্ঠা অত সহজ নয়। মনুষ্যের বুদ্ধি লাভ-লোকসানের হিসাব করেই থাকে। কিন্তু বুদ্ধিমান জানে যে কর্ম না করে থাকা যায় না। এবং ফলাফল তাঁর হাতে রেখে নিয়ত কর্ম করে যেতে হবে। কেন না কর্ম না করে ক্ষণমাত্রও থাকা চলে না এবং কর্মের প্রেরণায় ফলাকাঙ্ক্ষাও থাকে। তাই একমাত্র তাঁর কর্ম বুঝে কর্মের বিচার তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে পারলে কর্মফল ত্যাগ করা যায় ও কর্মও সহজ হয়। সেজন্য এই সমতাও সাধনা করে লাভ করতে হয়। তাতে প্রথমেই তিতিক্ষার কথা আসে; যা আসে আবার চলে যায় সেই সব আগমাপায়ী ঝামেলাগুলি সহ্য করতে হবে। "আঘাত খেয়ে অচল রব" এই রকম জোরালো এক সংকল্পশক্তি চাই। এই তিতিক্ষার পরিণামে ভিতরটা যখন পাষাণের মত হয়ে যায় তখন এক শক্তি জাগে। একটা dynamo মত অবস্থা হয় কাজেই সে শক্তি বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং ক্রমে বেড়ে চলে। বহির্জগতের যে আঘাতগুলি আক্রমণ করে সেগুলিও তখন রূপান্তরিত হয়। তাতে ঐ শক্তির বিকিরণে অন্য কেন্দ্রগুলিতেও কাজ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেবকর্মের অবস্থা এসে পড়ে। তাঁর দিব্যসংকল্পই আধারে আধারে বহন করে চলেছি। ঝলকে ঝলকে এই পাষাণের নিষ্প্রাণতা থেকেই যেন শক্তি উৎসারিত হয়ে চলেছে। সমতার এই চরম অবস্থায় সহস্রবার ক্রুশে বিদ্ধ হয়েও সেই দিব্য সংকল্প রূপায়িত করে চলতে হয়। কাজেই দেখতে পাই যে অমরতির তিতিক্ষার শক্তি দিয়ে মৃত্যুও জয় করা যায়।

এইভাবে আমরা কর্মে আত্মসমর্পণকে প্রাত্যহিক জীবনের কর্মে রূপ দিতে শুরু করতে পারি। প্রথমে সমস্ত কিছুকে সহ্য করতে হবে। কর্মে অধিকার আছে কর্মফলে নয়, এই বোধ জাগ্রত থাকবে। এথেকে অকর্তার বোধ এলে অহং ক্ষীণ হতে হতে গলে যাবে। তটস্থ উদাসীন থাকলে চিত্ত মার্জিত হবে এবং তাতে মহাপ্রকৃতির সঙ্কল্প তখন প্রতিভাত হবে। এইভাবে জীবনের চলা ফেরায় কর্মকে যোগে পরিণত করতে পারি।

(ক্রমশঃ)

বিলাতের ডায়েরীর কয়েক পাতা

(ব্যক্তিগত বিবরণী)

এ. বি. পুরাণী

(পুনরাবৃত্তি)

রয়েল ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ও সালোন সোসাইটি ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

ওখানকার সেক্রেটারি মিঃ এফ্ রিক্টারের (Mr. F. Richter) সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট ছিল সকাল সাড়ে দশটাতে, তিনি এক অমায়িক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আমি তাঁর কাছে প্রস্তাব করলাম যে ইংলণ্ডে শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্বগুলি ও অবদান সম্বন্ধে আরো ভালো ভাবে প্রচারের চেষ্টা হওয়া দরকার।

তিনি আমার কাছে বৌদ্ধ তত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের কাছে নির্বাণ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা আধুনিক যুগের মনের পক্ষে সুনির্দিষ্ট বা সন্তোষজনক নয়। যেমন, তিনি কোনো ব্যক্তির তীরের আঘাতে কাতর হবার উপমা দিয়ে বলেছেন যে সেই স্থলে কে ঐ তীর নির্মাণ করেছে তা জেনে কোনো লাভ নেই, কেমন ক'রে আরোগ্য হতে পারে তাই জানাই দরকার। দুঃখ-কষ্ট কেন আছে তা জেনে কিছু লাভ হবে না। আছে যখন তখন তাকে দূর করা চাই। তিনি বলেছিলেন "আমি তার উপায় জানি মানুষ দুঃখ পায় তার কামনার তৃষ্ণা থেকে, কামনাকেই দূর করতে হবে।"

এ হলো প্রয়োগবাদের কথা। এই কথা বলে মনের প্রশ্ন বা অনুসন্ধিৎসাকে থামানো যায়না। তাই বলে বুদ্ধের অবদান সামান্য নয়, বহুজনকে তিনি আলোকদান করেছেন। অবতার মাত্রই আলোর সন্ধান নিয়ে আসেন, কারণ প্রত্যেকেরই সংস্পর্শ বা সাযুজ্য পর্যন্ত থাকে পরম জ্যোতির সঙ্গে। কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁর মানবিক পার্থিব জীবনে তখনকার মানুষদের বিবর্তনগত অবস্থার মধ্যে এসে সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। সুতরাং বুদ্ধের সময়ে তখনকার মানুষ ওর চেয়ে বেশি কিছু গ্রহণের উপযোগী ছিল কিনা সে কথা আমরা জানি না।

কথাবার্তার পরে উক্ত সোসাইটির উদ্যোগে একটি সভা আহ্বানের দিন স্থির

হলো ২৮ অক্টোবর, ১৯৫৫ : স্থান ওভারসীজ্ হাউস, পার্ক প্লেস, সেন্ট জেমস্ ষ্ট্রীট, এস্ ডব্লু ১।

২৮ অক্টোবর, ১৯৫৫

মিষ্টার রিকৃটার এই দিন অপরাহ্নে আমাকে এক ভারতীয় রেস্তোরাঁতে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। লাঞ্চের সময় তিনি আমার কাছে আশ্রম সম্বন্ধে ও শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে চাইলেন। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন "L' Institut Fraçais" প্রতিষ্ঠানে, ঘুরে ঘুরে সেখানকার লাইব্রেরি দেখালেন, লাইব্রেরির দেয়ালগাত্রে খুব সুন্দর এক আধুনিক ডিজাইনের চিত্র অঙ্কিত ছিল। ঐ ইনষ্টিট্যুটের ডিরেক্টরের সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, তিনি আমাকে ওখানকার "মাননীয় সদস্য" ক'রে নিলেন। তখন থেকে ওখানকার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হলো।

মীটিং ছিল সন্ধ্যা ৬টার সময়। মিঃ গুক্স, আই, সি, এস্ ওখানকার প্রেসিডেন্ট, তিনি এলেন দেরীতে। মিঃ রিকৃটার আমার পরিচয় জ্ঞাপন করবার পরে আমাকে ঠিক সময়ে ভাষণ দিতে হলো। শ্রোতাদের কাছে আমি শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি সম্বন্ধে বুঝিয়ে বললাম। প্রেসিডেন্ট তারপরে বললেন সম্পূর্ণ অন্য কথা, পাশ্চাত্যের মানসিক উন্নতির সম্বন্ধে সুখ্যাতি করে। তথাপি বোঝা গেল যে শ্রোতাদের মনে ভালোই সাড়া জেগেছিল। শ্রোতাদের মধ্যে জনকয়েক ভারতীয় ছিলেন তার মধ্যে পি, ডি, মেহতা এসে তাঁর উপলব্ধির ও সন্তোষের কথা জানিয়ে গেলেন। আরো কয়েকজন ছিলেন যাঁরা লণ্ডনের বাইরে থেকে এসেছিলেন।

সেক্রেটারির সঙ্গে আবার আমার সাক্ষাৎ হয় ১১ নভেম্বর তারিখে। তিনি ১৫ই আগষ্টের উৎসবটি ইংলণ্ডে করার উপলক্ষে আমার কাছে পরামর্শ চান। অন্যান্য পরামর্শ দেবার সঙ্গে আমি তিন জন ব্যক্তির নাম করলাম যাঁরা সেই উপলক্ষে ভাষণ দিতে পারবেন।

আমি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করছি জেনে তিনি আমাকে এই পত্র লেখেন—

প্রিয় মিষ্টার পুরাণী,

এই সঙ্গে প্রেরিত প্যারিসের ভারত সভ্যতা ইনষ্টিট্যুটের চিঠিখানি পড়ে দেখবেন। কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটার কারণে তারা আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তাদের পরিকল্পিত আমন্ত্রণ জানাতে পারেনি।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে যারা আগ্রহী ও বিশেষত এই সোসাইটির সভ্যেরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং এই দেশে আপনার আগমন তাদের কাছে স্মরণীয় থাকবে,

আমরা প্রফেসর ল্যাঙ্গলির বই থেকে ইতিপূর্বেই শ্রীঅরবিন্দের বার্তা সম্বন্ধে কিছু কিছু জেনেছে। কিন্তু আপনি ভারতে ফিরে যাবার পূর্বে আমাদের আরো কিছু আলোচনা হওয়া দরকার যাতে তাঁর দিব্যজীবন বার্তা প্রধানত এই সোসাইটির মারফতে আরো অধিক প্রচারিত হতে পারে।

১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কিংবা তার আগের দিন ৩০ নভেম্বর তারিখে কি চায়ের সময়ে আমাদের সাক্ষাৎ হতে পারে? এবং আপনারই ওখানে যদি হয়?

শুভ ইচ্ছা জানাই
এফ্. রিক্‌টার
য়ুরেল ইণ্ডিয়ান পাকিস্তান ও সীলোন সোসাইটি
৩ ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট
লণ্ডন এস্ ডব্লু. ১
২৬ নভেম্বর, ১৯৫৫

৩১ ডিসেম্বর তারিখে তিনি লিখলেন:

আশা করি, ভারতে ফিরবার পথে সমুদ্রযাত্রা আপনার নিরাপদ হয়েছে। মহাত্মাজীর সম্বন্ধে আপনার উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ যাদের শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল তারা সকলেই তা নিত্য স্মরণ করবে।

আপনি সোসাইটিকে যে পরামর্শগুলি দিয়েছিলেন তা আমি সযত্নে লিখে রেখেছি, এবং ল্যাঙ্গলির বইখানি বহু কপি কিনে রাখবার জন্য আফ্রিকাতে আপনার বন্ধুবর্গকে লিখে জানিয়েছি।

বিনীত
এফ্. রিক্‌টার

লীড্‌স্ ২৮ সেপ্টেম্বর—২ অক্টোবর, ১৯৫৫

লণ্ডন শহর হতে অনেক দূরে থাকায় খুব ভোরে উঠে কেন্সিংটনের বাস ধরে কিংস ক্রস্ ষ্টেশনে গিয়ে লীড্‌স্ যাবার ট্রেনে উঠে সেখানে পৌঁছলাম ১২টা ৪৫ মিনিটে। সেখানকার ভাইস চ্যান্সেলারের সঙ্গে সংযোগ ঘটল শ্রীমতী নোরা হিরণ নামক দুই ভক্তের বন্ধুর মাধ্যমে, ইনি পণ্ডিচেরী গিয়েছিলেন। অরুণ মারিওয়ালা নামক সুরাটের এক ছাত্র ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক প্রতিনিধি ষ্টেশনে এসেছিলেন

আমাকে নিয়ে যেতে। স্যাড্‌লার হলে আমার থাকবার স্থান নির্দিষ্ট হলো, সেখানে গিয়ে উঠলাম সন্ধ্যার সময়।

ইতিমধ্যে দেখে এলাম টাউন হল, মিউজিয়ম ও মিউনিসিপ্যাল টেক্নিক্যাল কলেজ। লীড্‌স্ স্থানটি বিখ্যাত ওখানকার ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্পের জন্য, তা ছাড়া মুদ্রিত ও পশমের বস্ত্রশিল্পের জন্য।

টাউন হলে যাবার পথে দেখলাম কয়েকজন ব্যক্তি ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে একজনের বক্তৃতা শুনছে। ভিড়ে মিশে দেখলাম এক যুবক হাতে পিতলের ক্রস্ নিয়ে রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম সম্বন্ধে বলছে, আর অনেকে তাকে নানারকম প্রশ্ন করছে ও সে তার জবাব দিচ্ছে। আমি সেখান থেকে সরে পড়তে চাইলাম কিছু না বলে, কিন্তু একজন—বোধ করি আয়রিশম্যান—জিজ্ঞাসা করলে যে ওখানে আমার কি বলবার কিছু ছিল। আমি বললাম যে ক্রিশ্চান ধর্মের নানা সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। সে আমাকে অনুরোধ করলে ঐ যুবককে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে। আমি তাকে বললাম যে দুটি মাত্র প্রশ্ন আমার মনে আসছে (১) খৃষ্টের জন্মের আগে যখন কেউ ক্রিশ্চান হতে পারেনি তখন তাদের ভাগ্যে কি ঘটত? (২) এখন যারা ক্রিশ্চান নয় তথাপি ভগবান মানে, তাদের বেলাতে কি হবে? এর পরে আমরা সে স্থান ত্যাগ করলাম।

মিউজিয়মের চিত্র বিভাগে চার পাঁচটি খুব সুন্দর ছবি আছে—বিশেষ ক'রে তার মধ্যে একটি যাতে সমুদ্রের উপর ঘন কালো মেঘ ক'রে এসেছে। সেখানে একটি কয়লার খনির মডেলও রক্ষিত ছিল। স্যাড্‌লার হল হলো যার মাইকেল স্যাড্‌লারের স্মৃতিরক্ষার গৃহ, তিনি অনেক বছর লীড্‌স্ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে ভারতে প্রশিক্ষণের উন্নতিকল্পে যে স্যাড্‌লার কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল, ইনি তার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ইনি লীড্‌স্ ইউনিভার্সিটিতেও এই সতর্কবাণী করেছিলেন যে উচ্চশিক্ষার মধ্যে অতিরিক্ত বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা এসে কাব্য, কলা ও সাহিত্য প্রভৃতি মানবতার বিষয়গুলিকে হটিয়ে দিচ্ছে। এতে ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে হানি হচ্ছে। তাঁর নামের এই বাড়িটিতে সকল দেশের ছাত্রেরা অপেক্ষাকৃত সস্তায় অবস্থান করার সুযোগ পায়।

ওখানকার কর্তা নিষ্টার হিগিন্‌সনের সঙ্গে সন্ধ্যাটি আরামে কাটল, আমি তাঁকে বললাম শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির কথা, শিক্ষা ও শিল্প সম্বন্ধে তাঁর মতামতের কথা। ওঁর অনুরোধে আমি ওঁকে ওয়ার্ডস্‌ওয়র্থ থেকে কিছু পড়ে শোনালাম।

তিনি জানতে চাইলেন যে শিক্ষার মূল নীতি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কি মতামত। আমি বললাম, প্রথম কথা এই যে শিক্ষার্থী শিশুকে একটি বিকাশোন্মুখ আত্মা বলে গ্রহণ করতে হবে, কারণ তারও মধ্যে সেই ভগবৎ স্ফুলিঙ্গ আছে যেমন শিক্ষকের মধ্যেও আছে। যে প্রকৃত শিক্ষক হবে সে নিজের মধ্যেও যেমন সেই স্ফুলিঙ্গটিকে উদ্দীপ্ত করবে তেমনি ছাত্রের মধ্যেও তাই করবে। তার মানে, আমি ওর চেয়ে বড়ো এই জটিল মনোভাব দূর করতে হবে। শিশু কেবল তার স্বাভাবিক যন্ত্রগুলিকে ব্যবহার করতে জানেনা, কারণ ঠিক ভাবে কেমন ক'রে তার ব্যবহার করতে হবে তা সে শেখেনি। শিক্ষকের কাজ হবে তার সেই স্বাভাবিক শক্তিগুলিকে সমুচিত ভাবে কাজে লাগাতে, শিক্ষা দেওয়া, এবং মানুষ সংস্কৃতির দিক দিয়ে যতটা উন্নতি করেছে সেই সম্পর্কে তাকে জ্ঞান দেওয়া, যতটা পর্যন্ত সে তা নিতে পারে। প্রকৃত শিক্ষক এতেই খুশি হবে যে বিকাশোন্মুখ আত্মাগুলিকে সাহায্য করবার ভার তার উপর দেওয়া হয়েছে—তার জ্ঞানের দ্বারা সে যে জ্ঞানোন্মেষ করতে পারবে এতেই সে আনন্দ পাবে।

দ্বিতীয়ত, এটি স্মরণ রাখতে হবে যে শিক্ষা পাচ্ছে শিশুটি শিক্ষক তাকে সে-শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছেনা, সে কেবল শিক্ষা পেতে তাকে সাহায্য করছে। নানা বিষয়গুলি সে শিশুর সামনে ধরবে, এবং তার মধ্যে সেই শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে যার দ্বারা সে নিজে বেছে নিতে পারে যে কোনগুলির প্রতি সে আগ্রহশীল।

ইউনিভার্সিটি পরিদর্শনের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫। বেলা দশটা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এর মধ্যে ছিল রেজিষ্ট্রারের কাছে লাইব্রেরিতে, ও দর্শন বিভাগে যাওয়া—ভাইস চ্যান্সেলার ও প্রফেসরদের সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া, বয়ন বিভাগ ও এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যাওয়া, সিনিয়র কমন রুমে যাওয়া। ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধির সঙ্গে আমি স্যাড্লার হলে ফিরলাম।

পরে পার্কিন্‌সন্‌স্ হলে পৌঁছলাম বেলা ১১টায় এক সুটকেসের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের বইগুলি নিয়ে। সহকারী রেজিষ্ট্রার চারিদিকে ঘুরিয়ে দেখালেন। পার্কিন্‌সন্‌স্ হল সুইডেন থেকে আনীত মার্বেলের প্রস্তুত প্রকাণ্ড এক সৌধ, পাথরগুলি এখানেই কাটা হয়েছে। এর ভিতর দিয়ে প্রবেশদ্বার এবং এখানে ছাত্রদের সম্মেলন হয়, আর একে ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন বিভাগগুলি। অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের তুলনায় লীড্‌স্ হলো আধুনিক ইউনিভার্সিটি, সেটাই এখানকার গর্ব, ওরা বলে আগেকারগুলি সেকেলে।

লাইব্রেরি গৃহটি গোলাকার, দেয়ালের গায়ে তাক্ বসানো, সেগুলি পুস্তকে ভরা;

সেখানে দেখতে পেলাম দেকার্তের বইগুলির আদি সংস্করণ, শেক্সপিয়রের ১৬২৩ সালের পুঁথি সংস্করণ, ১৪৩৮ সালে ছাপানো ইউক্লিডের জ্যামিতি যার পাশে দেওয়া চিত্রগুলি, নিউটনের 'principia'-র প্রথম সংস্করণ। তখন মনে হলো কত শতাব্দী ধরে ইউরোপের বিজ্ঞান স্থাপিত হয়েছে।

একটি আশ্চর্য জিনিস দেখলাম। ২"×২"×১" মাপের ছোট একটি বাক্স, অনেকটা ব্যাগের মত, তার মধ্যে ২"×২" সাইজের ছোটো ছোটো ৪০।৫০টি বই রাখা আছে (যেমন আমাদের গীতার অনুষ্ঠ সংস্করণ); এ হলো "বেঁটে লাইব্রেরী"; বইগুলি সবই ক্লাসিক্যাল, শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য। আগেকার কালে কেউ ভ্রমণে বের হলে এইরকম বেঁটে লাইব্রেরি সঙ্গে নিতো।

দর্শনবিভাগে সাক্ষাৎ হলো প্রফেসর টাউল্‌মিনের সঙ্গে। আমি তাঁকে বললাম, আশা করি এই পাকিন্‌স্ হল যেমন সুন্দর, এখানকার ছাত্রেরা তারই উপযোগীভাবে শিক্ষার উন্নতি করবে। তিনি বললেন, "হাঁ, এই বিভাগটি খুব মজবুতভাবে নির্মিত। কিন্তু একে ভেঙে ফেলে আরো বড়ো ইমারতের কল্পনা হচ্ছে, কিন্তু তাতে কাজের বেলায় আমাদের খুব অসুবিধা হবে।" আমি বললাম, "আমার অভিজ্ঞতা এই যে ল্যাবরেটরি খুব বড়ো বড়ো বাড়িতে সরিয়ে নিয়ে গেলে আসল গবেষণার কাজ কমে যায়। তবে আধুনিক রিসার্চের যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাও করতে হয় কারণ ক্যাভেন্ডিশ বা রিচার্ড আর্করাইটের যুগে যেমন অবস্থাতে কাজ চলত তা আর এখন চলেনা।"

লীড্‌স্‌এর ল্যাবরেটরিগুলি ছোটো ছোটো কারখানার মতো নির্মিত। প্রত্যেক বিভাগে নানারকম শিল্পোন্নতির দিক দিয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে—প্রেশন, সিমেন্ট, কৃত্রিম রেশম, বিদ্যুৎ উৎপাদন, এঞ্জিনের কাজ, রং করার কাজ। প্রত্যেক বিভাগে ছাত্রেরা কাজ করছে ও চেষ্টা করছে যে যতটা শিখে নিতে পারে।

প্রফেসর টাউলমিনের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করলাম ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের লেখা শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বইটির কথা। লাঞ্চের সময় প্রফেসরদের কমন রুমে যেতে ভাইস চ্যান্সেলার স্যার চার্লস মরিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তিনি আমাকে ডাইনিং রুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে সাত আট জন এসে জড়ো হলো, আমি দেখলাম যে তারা সকলেই ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল। লাঞ্চের সময় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা উঠল। সেই আলোচনাতে আমিই বেশির ভাগ অংশগ্রহণ করলাম। আমি সেখানে এই বললাম:

"এখনকার ধারণা এই যে মানুষের সমষ্টিগত জীবনের সার্থকতা নির্ভর করছে তার অর্থনৈতিক উন্নতির উপর। কথাটা অর্ধসত্য। সমষ্টি জিনিসটা নিশ্চেতন কিছু নয়,

তারও প্রগতিশীল সত্তা আছে। গোড়াতে ব্যষ্টির মতো সমষ্টিও আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তারই একটা উপায়। তাতে স্থাবির থেকে আরো উৎকর্ষ আসে। কিন্তু আর্থিক উৎকর্ষই তো চরম লক্ষ্য নয়, যদিও অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা তার ভিত্তি হতে পারে। বিভিন্ন সমষ্টিমানব বিভিন্ন প্রকার সংস্কৃতির দ্বারা আবদ্ধ করেছে; ইউরোপ, বিশেষত ইংলণ্ড, গুরুত্ব দিয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শে মানুষের স্বাধীনতা ও সমতার উপর। ভারত তার আপন সংস্কৃতিধারা অনুযায়ী জীবনের অন্যরূপ মূল্য দিয়েছে, নৈতিক ও ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের দিক দিয়ে। সমষ্টি জীবনের জন্য অর্থনৈতিক নিরেট ভিত্তিও যেমন প্রয়োজন তেমনি তার পূর্ণ সার্থকতার জন্য আধ্যাত্মিক দিকের সমুচিত মূল্যদানও অপরিহার্য। বরং আরো বলা যায় যে জীবনের অর্থনৈতিক মূল্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক মূল্য বেশি রকম কাম্য। মানবজাতির মিলন এখন ক্রমশ এগিয়ে আসছে, তাতে পরস্পরের সংস্কৃতি যদি সহযোগিতা করে তাহলে সে মিল আরো সমৃদ্ধ হবে—বৈচিত্র্যই তাকে আরো সম্পূর্ণতর করবে। মুশকিল এই যে সমষ্টি চেতনা এখন জাতিগত চেতনারূপে ক্রিয়াশীল হয়ে ভ্রান্ত ব্যক্তিচেতনার মতো কেবল নিজেরই কামনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে সচেষ্ট। এই জাতিগত অহংভাব থেকেই বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। দু'টি বিশ্বযুদ্ধ হয়ে যাবার পরে এখন আধুনিক মানবের আত্মসমর্পন শিথিল হয়েছে।

"আজকের দিনের অনেক ঘটনা থেকেই দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতি চাইছে মানবজাতির ঐক্যসাধন—পৃথিবীতে তাই হবে অভিন্ন সমষ্টি জীবনের শেষ আদর্শ। এই সম্ভাব্য ঐক্য কেবল অর্থনৈতিক বা নিয়মনৈতিক ভিত্তি নিয়েই গড়ে উঠবে না—যদিও অবশ্য তাতে অংশ গ্রহণ করবে। তা ছাড়া তখন দরকার হবে মানুষের ভিতরকার দিব্যত্বের সত্যকে স্বীকার করা, কারণ এর দ্বারাই মানুষের মধ্যে সক্রিয় সৌভ্রাত্র স্থাপিত হতে পারে। সেই হিসাবে ইউ. এন্. ও (U.N.O.) শক্তিহীন, যেহেতু তা কেবল নিয়মকানুনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যারা ওর ভিতরকার কাজে নিযুক্ত তাদের এই মনোভাব থাকা উচিত মানুষরা হলো এক পরিবারের অন্তর্গত, ছোটো দেশ বা বড়ো দেশে কোনো প্রভেদ না রেখে। দাবার ছকের মতো কোনো একটা মতকে প্রাধান্য দেওয়া বা দল গড়ে তোলা চলবে না। প্রশ্ন সেখানে এই: মানব জীবনকে কেমন অবস্থায় দাঁড় করানো যায় যাতে সমগ্র মানবজাতি পরিপূর্ণতার দিকে শান্তির সঙ্গে অগ্রসর হতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন বাইরের কাঠামোর ছাঁচ অনেক বদলানো, কিন্তু তাকে সার্থক করতে দরকার একটা আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন।

"কথাটা প্রথমে শুনা স্বপ্ন মাত্র বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বর্তমানের জটিল অবস্থার মধ্যেও এ আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা অসম্ভব নয়। যেমন, ঐক্য স্থাপনের আগে দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে যে দেয়াল টেনে দেওয়া আছে তাকে ঘোচানো যেতে পারে— ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে যে কাসটমসের দেয়াল রয়েছে তা ঘুচিয়ে দিয়ে সকল রাজ্যের একটা মোটামুটি আয় অতীতের হিসাব থেকে নির্ধারণ হতে পারে। গত যুদ্ধের সময় নিটার চার্চিল এই প্রস্তাব করেছিলেন যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রজাধিকার এক হয়ে যাক। এখন শান্তির সময় বহু প্রজাধিকারের আদর্শ স্থাপিত হতে পারে, যথা, ইংরেজ, আফ্রিকান ও ভারতীয় ব্যক্তি তিন দেশেরই প্রজা হতে পারে। অবশ্য এ আদর্শ বাস্তবে রূপান্তরিত করা কঠিন হবেই। অপরপক্ষে কিন্তু সর্ব্বব্যাপী অ্যাটমিক যুদ্ধের আয়োজন করা যে সহজ কাজ তাও নয়।"

স্যার চার্লস মরিস আমাকে পণ্ডিচেরীর আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি শুনে খুশি হলেন যে সেখানে স্ত্রী-পুরুষে আগাগোড়া একত্রে শিক্ষা পায়।

লাঞ্চের পরে তিনি আমাকে তাঁর অফিসে নিয়ে গেলেন স্যুটকেসটি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমি শ্রীঅরবিন্দের সমস্ত বইগুলি ঐ ইউনিভার্সিটিকে উপহার দিয়ে বললাম এগুলি যেন লাইব্রেরিতে পৃথক স্তবকে রাখা হয়। প্রসঙ্গত আমি বললাম যে, "The Ideal of Human Unity", "The Human Cycle", ও "The Foundations of Indian Culture" বইগুলি যেন তিনি পড়ে নেখেন। বিকালে আমি প্রফেসর জেফারসনের সঙ্গে আধুনিক কাব্য সম্বন্ধে আলাপ করলাম।

৩০ সেপ্টেম্বর

এদিন অরুণ ভারিওয়ালার ওখানে লাঞ্চ ছিল, তিনি ক্লাসে পড়াতে যাবেন বলে আমিই স্বেচ্ছায় খাদ্য পাক করতে চেয়েছিলাম। আমি রাঁধলাম ভাত, ডাল, বাঁধাকপি, হালুয়া ইত্যাদি, বেলা ১টাতে আমরা লাঞ্চ খেলাম। তারপর আমরা সাক্ষাৎ করলাম Quaker ধর্মাবলম্বী নিটার ও মিসেস জোসেলিনের সঙ্গে তাঁদের গৃহে। অতঃপর দেখতে গেলাম তিনটি ক্ষুদ্র লেক যার ভিতর দিয়ে একটি জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে। শেষেরটিতে সেই জল বাঁধ দিয়ে ধরে রাখা হচ্ছে, সেখানে নৌকাবিহার ও বাচ খেলা হয়।

১ অক্টোবর, ১৯৫৫

সকালে গেলাম আর্ট বিভাগের Mr. Sousmarez-এর সঙ্গে লর্ড আরউইনের প্রতিষ্ঠান "নিউজব্যান" দেখতে। স্থানটি দেখে আমার মনে পড়ল মধ্যযুগের রাজপুত দুর্গের কথা। আগেকার দিনে এই আরউইনদের প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। সেখানে দেখলাম বড়ো বড়ো নাচঘর, ১৬।১৭।১৮ শতাব্দীর আসবাবপত্র, তখনকার ভাস্কর্য, তৈলচিত্র, গৃহসজ্জা—যেন প্রকাণ্ড মিউজিয়ম, বিস্তৃত লন ও উচ্চভূমি দিয়ে ঘেরা। এত বড়ো প্রতিষ্ঠানকে সযত্নে রক্ষা করা খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, তাই লর্ড আরউইন এটি বেচে দিয়েছেন লীড্‌স্ মিউনিসিপ্যালিটিকে, তারাই এর রক্ষণাবেক্ষণ করে।

২ অক্টোবর, ১৯৫৫

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে সভা আহূত হয়েছিল, আমার তাতে ভাষণ দেবার কথা ছিল। চারজন কোয়েকার ও দুজন ভারতীয় তাঁদের ভাষণ দিলেন। ইংরেজরা এই অভিমতের উপর খুব জোর দিলেন যে ক্রিশ্চান ধর্মের নীতিগুলি মানতেন বলেই মহাত্মা গান্ধী অমন মহাপুরুষ হয়েছিলেন, তিনি ক্রিশ্চান ধর্মের সত্যগুলি পালন করতেন। আমি যা বললাম তার মোট কথা এই যে (১) ভারতে সকল ধর্মকেই অনুমোদন করা হয়, (২) শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ করে বললাম, তিনি দেখিয়ে গেছেন যে শ্রদ্ধার সঙ্গে যে ধর্মের পথই অনুসরণ করা হোক, একই উপলব্ধিতে গিয়ে পৌঁছবে। বস্তুত ধর্ম মানে কোনো নীতিপালন বা অনুষ্ঠান নয়, তার দ্বারা উপলব্ধিতে যাওয়া চাই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে ভগবৎ উপস্থিতি, কারো মধ্যে বা গুপ্তভাবে, কারো মধ্যে প্রকটভাবে। মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় সংস্কৃতি হতেই সৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি একাধিকবার বলতেন যে "হিন্দুদের মধ্যে তিনি হিন্দু, মুসলমানদের মধ্যে তিনি মুসলমান, ক্রিশ্চানদের মধ্যে তিনি ক্রিশ্চান।" তাঁর যা কিছু আধ্যাত্মিক সম্বল তিনি গীতা থেকে পেয়েছিলেন। আমার মনে হয় যে তাঁর জীবন থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে, ক্রিশ্চান ধর্মের উচ্চসত্যগুলিকে পালন করার জন্য যে ক্রিশ্চান হবার প্রয়োজন তা নয়।

ছন্দ ও গতি

শ্রীঅরবিন্দ

গভীরতর আধ্যাত্মিক সত্যের কাব্যময় প্রকাশকেই বলে মন্ত্র। এই মন্ত্র তখনই উচ্চারিত হয় যখন কাব্যভাষার অঙ্গীভূত তিনটি নিবিড়তা সংবদ্ধ হয়ে একটিমাত্র স্পন্দন সৃষ্টি করে। এই তিনটি নিবিড়তা হলো, ছন্দগতির নিবিড়তা, বক্তব্য ও বিবৃতি অর্থাৎ প্রকাশশৈলীর নিবিড়তা এবং আত্মার সত্যদর্শনের নিবিড়তা। যে-কোন মহৎকাব্যের সৃষ্টি এই তিনের সমন্বয়েই। এর যে-কোন একটির স্বল্পতাই শ্রেষ্ঠ কবি-সম্প্রদায়ের রচনার মধ্যে গুণের তারতম্য ঘটায়, এবং এর যে-কোন একটির অসার্থকতাই কবি-কর্মে পরম বিচ্যুতি নিয়ে আসে। আর এই ত্রয়ী নিবিড়তা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে একাত্ম হয়ে ওঠে, তখনই মন্ত্রের জন্ম হয়।

একদিক থেকে দেখতে গেলে কাব্যের ছন্দোগতিই হলো মূল কথা। কারণ অন্যান্য যতো গুণই থাকুক, এই ছন্দোগতি না থাকলে কাব্য স্বীকৃতি পায় না। অনেক সময়েই দেখা যায় যে সার্থক ছন্দোগতির গুণেই একটি কবিকর্ম অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে, যদিও সে কাব্যে ভাব দর্শন সাধনা এবং প্রকাশশৈলীর চমৎকারিত্ব অনেক কম। প্রসংগক্রমে বলে রাখা ভালো যে এই সার্থক ছন্দোগতি বলতে আমরা অক্ষর বা মাত্রা-গত ছন্দের কথা ভাবছি না। অক্ষর বা মাত্রা-গত ছন্দ ও মিল কাব্যের দেহগত সৌষ্ঠবমাত্র, এর প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু কবি-আত্মার গভীরতর প্রয়াসের কাছে 'এহো বাহ্য আগে কহ আর'। মাত্রার বৈচিত্র্য অক্ষরমিলের চমৎকারিত্ব এবং শব্দের প্রয়োগ-নৈপুণ্য কাব্যের বাহ্যিক গঠনকে সুঠাম করে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা শুধু কানকে তুষ্ট করে, আত্মার পিপাসা মেটায় না। আত্মার পিপাসা মেটে তখনই যখন মাত্রা-ছন্দের মধ্যে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে একটি অশ্রুত মধুর ছন্দোসম্পদ এসে মেলে এবং কাব্যের সামগ্রিক গঠনকে প্রদীপ্ত করে তোলে।

তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে 'মাত্রা'ই, যার অন্য নাম নির্দিষ্ট নিয়মে ধ্বনি-গঠনের পদ্ধতি, হলো কাব্যের ছন্দোগতির যথার্থ বাহ্যিক আধার। কিন্তু অধুনা **Whitman Carpenter** এবং ফ্রান্স ও ইটালীর মুক্তক-কাব্যের (**vers libre**) প্রণেতাদের মধ্যে একটি ভিন্নতর প্রবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। এঁদের কাছে মাত্রা বন্ধন, এর সনাতন সৌষ্ঠব এঁদের কাছে হালকা বাহ্যিকতা মাত্র এবং এঁরা এমনও মনে করেন যে সহজ সাবলীল কাব্যছন্দের

এ হলো বিকৃতি। এই আধুনিক প্রবণতায় 'মাত্রা' তাই অস্বীকৃত। আধুনিক এই দৃষ্টিভঙ্গী শেষ পর্যন্ত কিছুতেই টিকতে পারে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত এঁরা কবিকর্মে এমন উচ্চাঙ্গের ছন্দোসৌকর্য আনতে পারেন যার পাশে অতীতের সার্থকতম কাব্যপ্রয়াস নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অন্তঃসারশূন্যই থেকে যাবে। অদ্যাপি সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। পরন্তু মুক্তক-কাব্য যেখানে একটি ধ্বনিনিয়ত বাহ্যিক গদ্য-গঠন (যা মাত্রা-সন্নিতিরই রূপান্তর মাত্র) আশ্রয় করেছে অথবা গ্রীক 'Choric poetry'-র মতো একটি অসমঞ্জস ও জটিল মাত্রা বিন্যাস গ্রহণ করেছে, সেখানেই তা সফল হয়েছে।

ছন্দোগত মিল যে ধ্বনির পরম্পরা সৃষ্টি করে, কাব্যের সুসমঞ্জস গতির তা-ই হলো মূল উপাদান। ওই ছন্দোগত মিল কাব্য-প্রেরণাকে অবাধ করে দেয়, আমাদের মধ্যে মানসোত্তর যে এক আকূতি রয়েছে সেই আকূতিকে উৎসারিত করে এই ছন্দোসংগীত। **Milton**, যাঁর যৌবনের সুন্দর অথচ অগভীর কাব্যের মধ্যে সেই ছন্দোগত মিলের সার্থক প্রকাশ ঘটেছিল, তিনিও শেষের দিকে এর গূঢ় রহস্যকে অস্বীকার করেছিলেন। **Whitman**-এর পদ্ধতিও আরো অনেক ব্যাপকভাবে এই ভুলই করেছে। ভাবনা ও অনুভবকে একটি নির্দিষ্ট ও পরস্পরিত ধ্বনিসৌষম্যের মধ্যে বিন্যস্ত করলে তা যে কী চূড়ান্তভাবে মন ও হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, মানুষ যখন এই সত্য আবিষ্কার করলো তখন তা শুধু-মাত্র একটি কাব্য-কৌশল রূপেই মানুষ গ্রহণ করলো না, তাকে গ্রহণ করলো মনস্তত্ত্বের একটি সুগভীর সত্য-রূপে, যে-সত্যের সচেতন প্রকাশ বৈদিক সাহিত্যে। প্রাচীন ভারতীয়রা যে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রিয় ভাবনা ও চিন্তাকে—যেমন দর্শন, বিজ্ঞান ও আইন একটি ছন্দোময় মাত্রাবিন্যাসের মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, তা শুধুমাত্র স্মৃতির সহায়ক হিসেবেই নয়, কারণ গদ্যে লেখা সুবিপুল 'ব্রাহ্মণগুলি' তাঁরা অনায়াসেই মুখস্থ রাখতেন তার মূল কারণ এরা বুঝেছিলেন যে মাত্রাহীন গদ্যের তুলনায় মাত্রাবিন্যস্ত বাক্যের স্থিতি সহজ ও সুদীর্ঘ এবং এ বাক্য উচ্চতর স্বাভাবিক 'শক্তির অধিকারী'। তাঁরা এও বুঝেছিলেন যে এই মাত্রাবিন্যাসের মধ্যে কেবলমাত্র যে নিবিড়তর ধ্বনিগুণই আছে তাই নয়, এর এমন-একটি নিয়ম নির্দেশক শক্তি রয়েছে যা ভাষা ও বোধকে উচ্চগ্রামে নিয়ে এসে একটি সংহত রূপ দেয়। স্রষ্টা সৃষ্টির সমস্তকিছুকে একটি ছন্দের মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন—এই বৈদিক উপলব্ধির মধ্যে সম্ভবতঃ একটি সত্য আছে এবং এই বিশ্বব্যাপী মাত্রাবিন্যাসকে মেনে চলে বলেই পৃথিবীর মৌল প্রবর্তনাগুলি এখনও অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে। সৃষ্টির অবিনশ্বরতার মূলেই হ'লো এই সুসমঞ্জস ঐকাতান, যা একটি নিগূঢ় পরম্পরায়

নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং কাব্যের মাত্রাছন্দ সৃষ্টির সর্বাত্মক পরস্পন্দিত এই ঐকতানেরই সচেতন প্রকাশ।

তথাপি মাত্রাছন্দের এই আত্মস্থ শক্তি যখন কাব্যে প্রকাশ পায়, তখন মনে ও তীব্রতার দিক থেকে সে প্রকাশে তারতম্য ঘটে। প্রচলিত ধারণায়, যে কোন সহৃদয় ভাষাকে একটি মনোহর মাত্রা বিন্যাসের মধ্যে তুলে ধরলেই তা কাব্য হয়ে ওঠে। কাব্যের এই সংজ্ঞা এমন বহুল প্রচলিত যে তার ফলে Macaulay এবং Kipling-এর মতো কবিও কাব্য সমারোহে তাঁদের স্থান করে নিয়েছেন। উদারতা বহুগুণ তাই এ জাতীয় ধারণার সংগে আমি বিতর্কে অবতীর্ণ হতে চাইনা। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে শক্তিময়ী ভাষাকে একটি চতুর মাত্রাবিন্যাসের সংগে গেঁথে দিলেই তা কাব্যের উচ্চমান লাভ করেনা। ফরাসী মাত্রাছন্দস রোমান্স্ এবং মধ্যযুগীয় Ballad গীতিকাব্য নিছক মাত্রা সৌসম্য থেকেই ছন্দ আহরণ করেছে এবং এর প্রকাশশৈলীর নিস্তরংগ সমতা এ কাব্যকে সহনীয় করেছে মাত্র। একাব্যের হয়তো রূপ আছে, কিন্তু রস নেই; এ কাব্যে এমন একটি ছত্রও নেই যার ছন্দ হৃদয়কে স্পর্শ করে বা যার প্রকাশে গভীরের অভিব্যক্তি রয়েছে। এমনকি পরবর্তীযুগের ইউরোপীয় কাব্যেও ওই একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে—যদিও শব্দ ও ছন্দের কলাকৃতিতে এ যুগের কবি আরো বেশী পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ছন্দ সুষমা ও বর্ণন-কুশলতার জন্যেও এ কবিসম্প্রদায় যে শুধু সাধারণেই স্বীকৃতি পেয়েছেন, তাই নয়—এরা সমালোচক-মনেরও প্রশংসা অর্জন করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও এ পদ্ধতির কাব্যের উপর যে চূড়ান্ত রায় হবে তা এই যে, এ হলো শুধু মাত্র মনোহর পদচারণা, দর্শনীয় গতি-পরম্পরা। এর মধ্যে স্থায়ী হবার শক্তি আছে সন্দেহ নেই কিন্তু এ কাব্য তার স্রষ্টাকে হয়তো সাবলীল গতিতে আকাশযানে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, এর বেশী কিছু করেনা। আত্মার নিগূঢ় প্রবর্তনা এ আধারে কিছুতেই ধরা পড়েনা। এ পদ্ধতির গুণ ও শক্তি দুইই আছে—হয়তো মাত্রাছন্দস রোমান্স্ বা সমরনীতি অথবা জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক কবিতা কিংবা যে-কোন কবিতা যা জীবনের প্রতিধ্বনি—তার পক্ষে এ পদ্ধতি উপযোগী। এ কাব্যও স্পন্দিত করে, তবে তা আত্মাকে নয়, জৈবিক অস্তিত্বকে—যেমন করে দুন্দুভি-নিনাদ অথবা trumpet. কিন্তু একথা স্মরণীয় যে দুন্দুভি বা trumpet সংগীত-ঐশ্বর্যের শ্রেষ্ঠ উৎস নয়।

আমরা যে বহুস্তর ছন্দ-ধ্বনির কথা বলছি, তা যেমন প্রযুক্ত পদ্ধতির মধ্যে নেই, তেমনি এ পদ্ধতির উচ্চতর স্তরেও তা মিলবেনা। শক্তিমান কবি এবং কখনও কখনও এমনকি শ্রেষ্ঠ কবিও সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট প্রখ্যাসিদ্ধ ধ্বনিগঠন ও তার মাধুর্য নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকেন, কারণ তা কানকে তুষ্ট করে, একটি বৈচিত্র্যহীন

সুগন আনন্দে সৌন্দর্যবোধকে সজাগ রাখে এবং কাব্যের গভীরতর আবেদনের প্রয়োজনকে এড়িয়ে এই প্রথাসিদ্ধ সহজ ধ্বনি গঠনের মধ্যে এরা অনায়াসে তাঁদের ভাব কল্পনাকে উৎসারিত করতে পারেন। এ কাব্য মনোহর, এ কাব্য পাঠকের সৌন্দর্যবোধ তার কল্পনা ও তার ধ্বনি পিপাসাকে মেটায়, কিন্তু এর চমৎকারিত্ব এই পর্যন্তই। এ কাব্যের গীতিময়তার পরে আর কিছু প্রত্যাশা থাকেনা, এমন কিছু থাকেনা যা মনকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে, আত্মাকে আকস্মিক মাধুর্যে এক অজানা গভীরে টেনে নিয়ে যায়। চলতা স্রোতের মতো এ কাব্য নিস্তরঙ্গ গতিতে উপর দিয়ে ভেসে ভেসে চলে আবার কখনও-বা এ কাব্য শুধুমাত্র দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে, যখন কবির একমাত্র উদ্দেশ্য সহজলভ্য যথাযথ কোন আধারে তাঁর বক্তব্যকেই মাত্র প্রকাশ করা।

বুদ্ধিবৃত্তিকে তৃপ্ত করে অথবা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিয়ত সম্ভাবনায় আকৃষ্ট করে রাখে, এমন কোন মাত্রা-বিন্যাস বা ছন্দের এমন কোন রূপবৈচিত্র্য অথবা ধ্বনিতরংগের মধ্যেই সার্থক কাব্য নেই। সাহিত্যের এমন কোন কোন পর্ব দেখা গেছে যখন এই ধরণের নৈপুণ্যেরই জয়জয়কার। ভিক্টোরীয় যুগের কবিতা আমার ধারণায় এই জাতীয়ই : এতে নিপুণতা যা তা কখনও কখনও শিল্পীর, কখনও-বা তা Classical বা Romantic কারিগরের। সে নৈপুণ্যে কখনও ঐকতানবাদককে মনে পড়ে, কখনও-বা শক্তিমান কারুশিল্পীর প্রয়োগকুশলতা তাতে ধরা পড়ে, আবার কখনও সে নৈপুণ্যে মাত্রা ছন্দের জাদুকর উঁকি মারে। একাব্যে নিঃসন্দেহে সংগীতের বাহাদুরী আছে, কিন্তু যা নেই তা হ'লো মর্মের সংগীত : প্রেরণার দু'একটি-মুহূর্ত ছাড়া সর্বাস্তিকভাবে একাব্যে সেই 'আত্মা' নেই যে আত্মা থাকে সৃষ্টিনিয়ন্ত্রণের পিছনে, থাকে শ্রোতার অনুভবের কেন্দ্রস্থলে।

আত্মা যখন কাব্যের এই গঠনগত চাতুর্য ও বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে স্বীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে সুরু করে এবং এক গভীরতর আকৃতি ব্যক্ত করে তখনই কাব্যছন্দের চূড়ান্ত মহিমার সূচনা অন্তঃপ্রকৃতি যখন সজাগ তখনই তাদের আবির্ভাব। হয়তো একথা আমরা বলতে পারি যে কাব্যে এ মহিমা আসে তখনই যখন, কীটস্-এর ভাষায়, কবি ধ্বনি ও শব্দ সম্পর্কে কৃপণ হয়ে পড়েন, নিজের প্রয়োগশিল্প সম্পর্কে কবি তখন এমন সচেতন হয়ে ওঠেন যে প্রত্যেকটি শব্দের অন্তর্নিহিত সমস্ত সম্ভাবনাকে তিনি কাজে লাগান। এইভাবেই কাব্য গদ্যছন্দের প্রয়োগ-রীতিকে অতিক্রম করে যায়। গদ্যছন্দের বৈশিষ্ট্যই হলো একটি সামগ্রিক ধ্বনি-সুষমার সৃষ্টি করা, যার মধ্যে রচনার অঙ্গগুলি তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে।

এমনকি যে-সব ধ্বনি এই ধ্বন্যাত্মকতাকে স্ফূর্ত করে তারা ও ওই সামগ্রিক ধ্বনি-সুষমাকে রক্ষা করার জন্যে নিজেদের অনেক ক্ষেত্রেই নিশ্চুপ করে দেয়! অথচ কাব্যে মাত্রা ও মিলের পূর্ণ বিকাশ এবং কাব্য যে-ছন্দের অপ্রত্যাশী তা স্পষ্ট এবং স্বকীয়তা-সমৃদ্ধ। কিন্তু তথাপি যেখানে কাব্য বৃহত্তর কোন ছন্দ-আকৃতিকে প্রকাশ করেনা, সেখানে শুধুমাত্র একটি সামগ্রিক ধ্বনিরই সৃষ্টি হয় যার মধ্যে কাব্যের বিভিন্ন অঙ্গ নিশ্চুপ হয়ে যায়। অথচ কাব্যের উচ্চগ্রাম এবং নিবিড়তম যে-সব ছন্দধ্বনি, সেখানে প্রতিটি শব্দধ্বনির পূর্ণ প্রয়োগ—তা সে প্রয়োগ ধ্বনির সংক্ষিপ্তিতেই হোক অথবা তার বিস্তারেই হোক। এই প্রয়োগ যেমন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, তেমনি অনির্দিষ্ট ব্যাপকতার এবং এই শব্দধ্বনি কাব্যের সামগ্রিক ধ্বনি-সুষমার মধ্যে এমন-কিছু এনে ধরে যা সাধারণ কবিতায় নেলে না।

এ হলো কাব্যের যান্ত্রিকের দিক, যে স্থূল উপায় দিয়ে ফললাভ হয় তার দিক। একথা স্মরণীয় যে গঠনের দীপ্তি অথবা ধ্বনিসৌকর্যই কাব্যের মূলধর্ম নয়। কাব্য সেখানেই সার্থক যেখানে তা সুপ্ত সংগীতের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে, পাঠকের অন্তরের অন্তস্তলে যে সীমাহীন ধ্বনিপরম্পরা রয়েছে তার রহস্য প্রকাশ করে দেয়। সার্থক রচনায় বুদ্ধি অথবা শিল্পবোধ ব্যক্ত করা যাদপেই উদ্দেশ্য নয়। কবি যা প্রকাশ করতে চান তা হলো আত্মার গুহাহিত এক পরম রমণীয় সত্য। শব্দ, ছন্দ, ধ্বনি, রীতি প্রভৃতি বিভিন্ন অংগ কাব্যে অবশ্যই থাকবে, কিন্তু এ-সব-কিছুর নিয়ন্ত্রক হলো আত্মা যা তার নিজস্ব ভংগীতে আত্মপ্রকাশ করে। এর ফলে যা সৃষ্টি হয় তাই হলো এক অলোক সংগীত এবং এর মধ্যে আত্মিক জীবনস্পন্দ, আত্মিক অনুভূতি এবং সুগভীর বুদ্ধি-অতীত বোধেরই চূড়ান্ত বিস্তার। কাব্যের এই উচ্চগ্রাম ধ্বনিসুষমার আত্মাই ছন্দ মিল নির্ধারিত করে।

এইভাবেই মহৎ কাব্যের সৃষ্টি হয়। এ কাব্যে ছন্দভিত্তিক গতিস্পন্দ অবশ্যই রয়েছে কিন্তু তা এমন এক মহত্তর সংগীতে রূপান্তরিত হয়ে যায় যা মন্ত্রেরই সংগীত। বক্তব্য ও প্রবৃত্তির অভাব—অপূর্ণতার উপর এ পথেই আত্মার সীমাহীন ঐশ্বর্য ছড়িয়ে পড়ে। এ কাব্যের যিনি শ্রোতা তিনি সেই চিরন্তন আত্মা, উপনিষদে যাঁকে বলা হয়েছে শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম, সব শোনার পেছনে যিনি শ্রোতা যিনি নশ্বর বাক ও বাচ্যের অন্তরালস্থ নিজের দর্শন ও ভাবনার অযোঘ সুরচ্ছন্দটি শোনবার জন্যই কান পেতে থাকেন। *

---

* **Future Poetry** থেকে। অনুবাদক—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

কঠিন ডানায় ওড়া

(পূর্বানুবৃত্তি)

বীরবাহু

করাচী ত্যাগ করিয়া আসার পূর্বে স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী কয়েকজন নূতন বৈমানিকদের সঙ্গে লইয়া একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁর নিকট অনেক নূতন সব তথ্য জানা গেল। ভারতীয় বিমানবাহিনীতে ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স ডাইভ বম্বার বিমানের দুইটি স্কোয়াড্রন গঠন করিয়া শীঘ্রই যাহাতে যুদ্ধোপযোগী সাজ ও সরঞ্জাম লইয়া প্রস্তুত হইতে পারে সেজন্য এয়ার হেড্ কোয়ার্টার হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইউনিট দুইটি হইবে সাত নম্বর ও আট নম্বর রয়াল ভারতীয় বিমানবাহিনীর স্কোয়াড্রন। সাত নম্বর স্কোয়াড্রনের জন্য অফিসার কমাণ্ডিং হইবেন স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী আর আট নম্বরের জন্য স্কোয়াড্রন লীডার প্রসাদ। স্কোয়াড্রন লীডার প্রসাদ প্রথমে স্থলবাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন এবং কিছুদিন পরে স্বেচ্ছায় নিজেকে বিমানবাহিনীর জন্য ভলান্টিয়ার করেন। বিমানবাহিনীতে যোগ দিবার পর, বিমান উড়াইবার কৌশলে পারদর্শী হইলে, প্রথমে ভারতীয় বিমানবাহিনীর এক নম্বর স্কোয়াড্রন যোগ দেন, ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স বিমান উড়াইবার কৌশল আয়ত্তে আসার পর এয়ার হেড্ কোয়ার্টার তাহাকে আট নম্বর ভারতীয় স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডিং অফিসারের পদের জন্য মনোনীত করিয়াছে।

স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর দ্বিতীয় সংবাদই আমাদের মনোযোগ বেশী আকর্ষণ করিল। তিনি বলিলেন করাচীতে বিমানের মেরামত ও বন্যাট শিক্ষায় রত বৈমানিকদের দুইভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ সাত নম্বর করিবার জন্য পাঠান হইবে ও অন্য অংশ দ্বারা আট নম্বর স্কোয়াড্রন গঠন করা হইবে। করাচীতে তাঁহার এই সময় আগমনের হেতু এখন তিনি জানাইলেন। তিনি বলিলেন যে তাঁহার প্রথম হইতেই যে সব এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকরা ছিল,—তিন নম্বর ফ্লাইটে অথবা তিনশত তিপ্পান্ন নম্বর স্কোয়াড্রনে,—তাহাদের নূতন স্কোয়াড্রন সাত নম্বরে লওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন। করাচীতে আমাদের সাথে ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স বিমান মেরামত ও গঠন শিক্ষারত এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকদের মধ্যেও যাহারা তাঁহার ফ্লাইটে বা স্কোয়াড্রনে ছিল তাহাদেরও তিনি সাত নম্বর স্কোয়াড্রনে লওয়ার

জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি জানিতে চাহিলেন এই ব্যবস্থায় কাহারও আপত্তি আছে কিনা।

আপত্তি কাহারও থাকিবার কথা নয়; বৈমানিকদের যাহাকে যেখানে পাঠান হইবে, বিনা আপত্তিতে তাহার সেখানে গিয়া নিজ কাজে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। এ-কথা সকলেই বিশ্বাস করিত। বিনা আপত্তিতে যদি কোন কাজে যোগ না দেওয়া যায়, তবে সে কাজে মনোযোগের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা বেশী; কিন্তু বিনা আপত্তিতে শুধু নয়, আনন্দের সাথে যে কোন অবস্থায়, যে কোন যায়গায়, যদি কাজে যোগ দেওয়া যায়, ত সে কাজে কখনও কোন অবহেলা হইতে পারে না। সে কাজ সব সময় ভালভাবেই সম্পন্ন হওয়ার কথা। স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর স্কোয়াড্রনে যাওয়াতে কাহারও আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায়, বৈমানিকরা নিজেদের খুব সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিল। সকলেই আনন্দের সাথে তাঁহার স্কোয়াড্রনে বদলি হওয়ার জন্য আবেদন করিবে বলিয়া মনস্থ করিল।

এর পর প্রায় মাস দুয়েক পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কয়েকজনকে করাচীর ফুটবল মাঠের ভাঙ্গা হাটে থাকিতে হইয়াছিল। প্রত্যহই কয়েকজন বৈমানিক তাহাদের বদলির হুকুম লইয়া হয় সাত নম্বর বা আট নম্বর স্কোয়াড্রন যেখানে সংগঠন হইতেছিল সেখানে রেল গাড়ীতে চাপিয়া যাইতেছিল। সকলে চলিয়া যাইবার পর শেষে একদিন দপ্তরে আমার ডাক পড়িল, ও বদলির হুকুম পাওয়া গেল। এইবার করাচীর পর্ব্ব চুকাইয়া ফাফানউ অভিমুখে রওনা হইলাম। ফাফানউ এলাহাবাদের নিকটে। এলাহাবাদ রেল ষ্টেশনে অবতরণের পর কয়েকমাইল রাস্তা জীপ গাড়ীতে চড়িয়া ফাফানউতে পৌঁছিলাম। বিমান অবতরণের জন্য বিরাট পথ ঘন আমগাছের বন কাটিয়া পিচ দিয়া তৈয়ারী হইয়াছে। চারিদিকে ঘন সবুজ—করাচীর বালু আর চক্ষু ঝলসান সূর্যের তেজ ভুলাইয়া—চারিদিকের সবুজ রংয়ে, মাঠের ফসলের তাজা সবুজ আর আম জাম গাছের গাঢ় সবুজ রংয়ে চক্ষু জুড়াইয়া গেল। গ্রীষ্মের দিন বলিয়া গরম যথেষ্ট ছিল। কিন্তু গাছের নিচে গেলেই হাওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যাইত।

জীপ গাড়ীতে উঠিয়াই জীপ চালককে কতগুলি বিমান আমাদের স্কোয়াড্রনে এ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলাম। করাচীতে ট্রেনে ওঠার সময় হইতেই ভাবিতেছিলাম অন্ততঃ দশ-বারখানা বিমান নিশ্চয়ই আমাদের স্কোয়াড্রনে পৌঁছিয়াছে, আর প্রত্যহ দুইবেলার অর্থাৎ দিনে এবং সন্ধ্যার পর বিমান উড়াইবার কৌশল আয়ত্তের জন্য কতকগুলি বিমান লইয়া বৈমানিকরা ওঠা ও নামার মহড়া দিতেছে। আর এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকরা করাচীতে শেখা সমস্ত বিদ্যা ও কৌশল প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেক বিমানকেই

সর্বাঙ্গসুন্দরূপে উড়িবার নিমিত্ত উপযোগী করিয়া রাখিতেছে। সকলেই চেষ্টা করিতেছে যাহাতে আমাদের কোন বিমানই এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকদের ত্রুটি বা শৈথিল্যের জন্য নষ্ট না হইয়া যায়; এমন কি উড়িবার জন্য অনুপযোগীও না হয়। আকাশে উড়ন-রত বিমান নষ্ট হওয়ার সাধারণ মানে, সেই বিমানে উড়ন-রত বৈমানিকও হয়ত বিমানের সাথে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কাজেই প্রত্যেক কাজে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। নানা কথা চিন্তায় ছিল। কিন্তু জীপ চালকের জবাব শুনিয়া একেবারে মর্মাহত হইয়া গেলাম। সে বলিল, ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স ডাইভ বম্বার বিমানের একখানিও এখনও পৌঁছায় নাই। শুধু দুইখানা ছোট বিমান, হার্ভার্ড ট্রেইনার পাওয়া গেছে। আর শুধু কমাণ্ডিং অফিসার বা ফ্লাইট কমাণ্ডার ছাড়া আর কাহারও হার্ভার্ড বিমান উড়াইবার ফুরসুৎ নাই। অন্য সকলকেই তিন প্রকার কাজে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হয়; পি. টি-তে (Physical training) প্যারেডে। তাহাও বিনা বন্দুকে মার্চ করিয়া আর আহারে। আহার্য প্রচুর পরিমাণে পরিবেশন হয় এবং নানা প্রকার সম্ভার দিয়া তাহা প্রস্তুত।

এই সব কথা শুনিয়া বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলাম। পি. টি বা প্যারেড্ করা হইতে বিমান উড়াইতে বা মেরামত করিতে আনন্দ অনেক বেশী উপভোগ করা যায়। আর একটা কথা অনুভব করিলাম। নূতন বিমানের সাথে পরিচয়ের পর হইতে শুধু তাহাকেই আরও ভাল করিয়া জানার জন্য মন প্রাণ চাহিতেছিল। যতদিন পরিচয় ঘনিষ্ঠ না হয়, ততদিন পর্যন্ত একটা ভীষণ অভাব বোধ—আর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইলেই অভাব বোধের পরিবর্তে আনন্দবোধ। মন বিশ্লেষণকারীরা এই অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তাঁহারা বহুবার নানাভাবে এই বিশ্লেষণের কথা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বেশী আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

কোয়াড্রনে পৌঁছাইবার পর কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর সাথে দেখা করিতে দপ্তরে গেলাম। এবং স্যালিউট করার পর তাঁহার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি আমার দৃষ্টি দেখিয়াই বুঝিলেন নূতন বিমান এখনও না পাওয়ার কারণ জানার জন্য খুব উদগ্রীব হইয়াছি। সে-সব কথা কিছু না উল্লেখ করিয়া তিনি নূতন সব সংবাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বুঝিলাম নূতন বিমান পাওয়ার আরও কিছু বিলম্ব আছে। তাঁহার কথায় বুঝিলাম পি. টি, ও প্যারেড্ করিয়া শরীরস্বাস্থ্যের উন্নতি করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কথায় হাসির সাথে যেন একটু শ্লেষের আভাস ছিল বলিয়া মনে হইতেছিল। তখন বুঝি নাই। কয়েকদিন পরে কারণ জানিতে পারিলাম। আমাদের সাথে রয়াল এয়ার ফোর্সের একশত দশ নম্বর

স্কোয়াড্রনকেও ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স ডাইভ বম্বার বিমান দেওয়ার কথা। একশত দশ নম্বর সদ্য বিলাত হইতে আগত—এবং সেই স্কোয়াড্রনে সকল বৈমানিকই গোরা—কাজেকাজেই নূতন বিমান যে কয়টা প্রস্তুত হইয়াছে, সব কয়টাই তাহাদের দেওয়া কর্তব্য। হাজার হউক গোরারাই ত বিমানযুদ্ধ করিতে শিখিয়াছে—ভারতীয়রা ত নোটে শিখিতেছে—এখনও বলা যায় না, ভারতীয় বৈমানিকরা তাহাদের কাজে কৃতকার্য না অকৃতকার্য হইবে? সে কথা বলা যাইবে যুদ্ধের শেষে।

পি. টি ও প্যারেড করাইতেন দুইজন; সিন্ধু দেশ হইতে আগত পাইলট অফিসার তাহির রফিক এবং দক্ষিণদেশ হইতে আগত পাইলট অফিসার রাধাকৃষ্ণণ। দুইজনেরই গলার স্বর ও ভঙ্গি প্যারেড ও পি. টিতে হুকুম দেওয়ার জন্য উপযুক্ত। পাইলট অফিসার তাহির রফিক কিন্তু সাধারণভাবে কথা বলিতে পারিতেন না; তোতলা ছিলেন। কিন্তু পি. টি বা প্যারেড হুকুম দেওয়ার সময়ও কোন প্রকার তোতলামি প্রকাশ হইত না। তিনি খুব ভাল গান গাহিতে পারিতেন—যার গান গাওয়ার সময়ও কোন তোতলামি প্রকাশ হইত না।

দিন কয়েক পি. টি ও প্যারেড করার পর স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের নিকট হাজির হওয়ার জন্য জরুরী তলব আসিল। ভাবিলাম নিশ্চয়ই নূতন বিমানের সংবাদ পাওয়া যাইবে। গন্তব্যে পৌঁছান মাত্র স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী আমার আচমকা বিস্তৃত গুঁচলো গোঁপ জোড়াটি কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। এই আচমকা আঘাতে প্রায় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, কোন কোন নূতন পাইলট ও ফ্লাইং অফিসার এই আচমকা বিস্তৃত গোঁপ জোড়াটির দিকে তাকাইয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইতেছেন। ভীতি সঞ্চার হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার গোঁপ-জোড়াটি কাটিয়া ফেলা প্রয়োজন। কতদিনের যেহনত, কত সযত্নে বর্দ্ধিত, এবং বাহোর সহর হইতে আনীত মোম সংযোগে গোঁপ পাকাইবার কৌশল আয়ত্তে আনিতে কত প্রচেষ্টা প্রয়োজন হইয়াছে, সব এক হুকুমে নস্যাৎ হইয়া গেল। আর কিছু না হউক, পাকান গোঁপজোড়াটি লইয়া কোথাও গম্ভীর মুখে কাহারও সম্মুখে দাঁড়াইলে, অর্দ্ধেক কাজ প্রায় বিনা বাক্যব্যয়ে সম্পন্ন হইয়া যাইত। এ হেন গোঁপ-জোড়াটি কাটিয়া ফেলার জন্য অকস্মাৎ হুকুম পাইলাম। স্কোয়াড্রন বিমানের সংখ্যা ত নোটে দুইখানা। তাহাও ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স নয়, সাধারণ হার্ভার্ড ট্রেইনার—এত আচ্ছিন্নের পর হুকুম হইল গোঁপজোড়াটি কাটিয়া ফেলিতে হইবে! দুঃখে একেবারে মুসড়াইয়া পড়িবার অবস্থা হইল। চিন্তা করিয়া দেখিলাম গোঁপজোড়াটি ছাড়া চাপরাস রাখিবার আর কোন সরঞ্জাম ত নাই। শেষ পর্যন্ত গোঁপজোড়াটি মুড়াইয়া চাপরাশ হারানর পথে যাগাইয়া যাইব নাকি? কিন্তু স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারকে কথা দিয়াছিলাম এবং পরদিন দৈনিক রুটিন

হুকুমে অমুক চন্দ্র অমুককে তাহার গোঁপজোড়াটি কাটিয়া ফেলার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে বাহির হইল। হুকুমের নীচে জোয়াড্রন কমাণ্ডারের সহি। এখন আর উপায় নাই। কেননা গোঁপ রাখিতে হইলে পুনরায় এয়ার হেড্ কোয়ার্টার হইতে অনুমতি চাহিতে হইবে। তখন অনুমতি পাওয়াতে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ যখন কমাণ্ডিং অফিসার নিজেই গোঁপবিহীন এবং তাঁহারই অনুরোধে গোঁপ কাটিয়া ফেলার কথায় স্বীকৃত হইয়াছি। শেষকালে একদিন সকালে গোঁপ কাটিয়া ফেলিয়া প্যারেডে উপস্থিত হইলাম; নিজেকে তখন একেবারে উলঙ্গ বোধ হইতেছিল, —আর আড়চোখে চাহিয়া দেখি অন্য বৈমানিকরা সকলেই যেন হাসি চাপিয়া রাখার চেষ্টায় মুখ বিকৃত করিয়া রহিয়াছে। প্যারেডের পর সকলে মিলিয়া খুব একবার হাসিয়া লওয়া গেল। এবং সেই হাসিতে দুঃখের কাহিনী বিস্মৃত হইতে চেষ্টিত হইলাম।

মাঝে দুই একদিন মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া গ্রামের চেহারা দেখিয়া কাটাইলাম। গ্রামবাসীরা ভয়ে সন্ত্রস্ত। তাহাদের শুধু স্থলবাহিনীর সহিত মেলামেশা—কারণ স্থলবাহিনীর সাধারণ সিপাই সৈনিকরা ত তাহাদেরই সমপর্যায়ের মানুষ, তাহাদের মধ্য হইতেই স্থলবাহিনীতে যোগ দেয় এবং পনের বিশ বৎসর পরে যখন তাহারা সৈন্যবাহিনী হইতে অবসর প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের নিজ গ্রামে গিয়াই পুনরায় চাষ-আবাদের কাজে লাগিয়া যায়। শুধু তফাৎ এই হয় যে, তাহারা স্থলবাহিনীতে থাকা কালে রোমান হরফে ইংরাজি ভাষা, অঙ্ক ও সাধারণ নাগরিক জ্ঞানে শিক্ষিত হয়, সেই সাথে হিন্দিভাষাও শেখে। সেইজন্য তাহাদের চাষ-আবাদ, তাহাদের গৃহগুলি, গৃহপালিত পশু, ও তাহাদের সন্তানাদি সাধারণ চাষি-গৃহস্থের তুলনায় অনেক উচ্চ মানের হয়। গ্রামে ঢুকিলেই বলা যায় কোন গৃহস্থ স্থলবাহিনীতে সৈনিক ছিল। তাহাদের কথা-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে একটা স্বাতন্ত্র্য সাধারণের হইতে কিছু পার্থক্য চেষ্টা না করিলেও নজরে আসে।

গ্রামবাসীদের সাথে আলাপ-পরিচয় করাটা তখন পর্যন্ত দিল্লীর উপরের কর্তাদের সুনজরে ছিল না। সাধারণতঃ উপরের কর্তারা চাহিতেন—তখনকার দিনের কথা বলিতেছি—যে সৈনিক সে সাধারণ গৃহস্থের বা চাষির সন্তান হইলেও, যখন সে সৈন্যবিভাগে রহিয়াছে, তখন সে তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবে, এবং সাধারণের সাথে হৃদ্যতা রাখিবে না। এই হৃদ্যতা বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ সাধারণ মানুষের সাথে তাহার হৃদ্যতা থাকিলে কর্তাদের হুকুমে বিনা বাক্যব্যয়ে ও বিনা অনুশোচনায় সে সাধারণের যে-কোন হানি করিতে অপারগ হইবে। তাহাতে কর্তাদের হানি হওয়ার আশঙ্কাই বেশী গুরুতর হইল। মনে রাখা প্রয়োজন তখন ভারতের কর্তা

ছিল ব্রিটিশ। তাহাদের সমস্ত কাজের মধ্যেই নিজেদের হিত পুরামাত্রায় জাগ্রত থাকিত, তাহাতে সাধারণের ক্ষতি-বৃদ্ধি হউক বা না হউক কিছু যায় আসে না।

কোন কাজকর্ম নাই। খাইয়া দাইয়া, পি, টি, প্যারেড করিয়া, বন জঙ্গল মাঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেশ একটা আনন্দের মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাওয়ার অবস্থায় আসিয়া পড়া গেল। বিধি এবার হেড্ কোয়ার্টার্স বারবার বাদ সাধিলেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ক্যাম্বেলপুরে বদলি হইয়া যাওয়ার জন্য হুকুম আসিল। আবার তোড়জোড় করিয়া বাঁধাছাঁদার হিড়িক পড়িয়া গেল। তবে এবার ভাল যে কোন অপারেশনাল (operational) বিমান ছিল না। শুধু দুইখানা হার্ভার্ড ট্রেইনর বিমান। এবং বেশী উড়ান হয় নাই বলিয়া নূতন অংশগুলির সংখ্যা খুব কম। কাজেই স্টোরের কাজ অনেক সহজ হইল। এ ছাড়া আরও একটা ভাল ব্যাপার হইল যে জুনিয়ার অফিসারদের সংখ্যা এইবার অনেক হওয়াতে, স্পেশাল ট্রেনে সমস্ত ব্যাপারেই, রান্না-খাওয়া হইতে শুরু করিয়া নাওয়া বসা পর্যন্ত সমস্ত কাজের তদারকির ভার জুনিয়ার অফিসারদের উপর ন্যস্ত হইল। স্পেশাল ট্রেনে আরামে যাইব বলিয়া কতকগুলি গল্পের পুস্তক সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় জরুরী তারে জামসেদপুরে দাদার সাংঘাতিক অসুস্থতার সংবাদ পাওয়া গেল। স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী সবদিক বিচার করিয়া মাসাধিক কালের জন্য ছুটি মঞ্জুর করিলেন, এবং ছুটির পর সোজা ক্যাম্বেলপুরে আসিতে নির্দেশ দিলেন। দাদা কিছুটা সুস্থ হইলে, প্রায় দুইমাস পরে, জামসেদপুর হইতে পুনরায় ট্রেনে চড়িয়া ক্যাম্বেলপুরে পৌঁছান গেল।

কোথায় গঙ্গা-যমুনার অপর্যাপ্ত জলে শস্য-শ্যামল উর্বর উত্তর প্রদেশ আর কোথায় এক সিন্ধুনদ ছাড়া নদনদীবিহীন উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ! সিন্ধু নদের উপত্যকাভূমি উর্বর, সবুজ শ্যামল ক্ষেত্রে নানা ফসল উৎপাদন করে; কিন্তু যেখানে নদ পাহাড় কাটিয়া চলিয়াছে যেমন উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব অংশ, সেখানে শুধু নদের পার্শ্ববর্তী সামান্য ক্ষেত্র উর্বর, আর সব স্থান অনুর্বর, হয় প্রস্তরখণ্ডগুলি সব চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে অথবা শত বৎসরের হাওয়ার আর বৃষ্টিতে উপরকার উর্বরভূমি ধৌত হইয়া নিচেকার অনুর্বর ভূমি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। নিচেকার অনুর্বর ভূমিতে শক্ত মাটির সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর মিশ্রিত। বৃষ্টির জলের স্রোতে আর হাওয়ায় শক্ত মাটি কাটিয়া গিয়া সারি সারি মঞ্চের আকার ধারণ করিয়াছে। মঞ্চগুলি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যেন ধূসর রংয়ের পাথরে খোদাই করা মন্দিরের সারি। আর মন্দির গাত্রে নানা প্রকার জীবজন্তু আকৃতি খোদাই করা হইয়াছে। বারিপাতের জলের স্রোত আপনিই আপনার

নিষ্কাশনের পথ কাটিয়া খাল বানাইয়া মন্দিরাকৃতি মাটির মওগুলিকে সারিবন্দি করিয়া নির্মাণ করিয়াছে। ভাল করিয়া দেখিলে মনে হয় আমাদের দেশের মন্দিরগুলি নির্মাণের পরিকল্পনা কি তবে মাটির এই মন্দিরাকৃতি মওগুলি হইতে লওয়া হইয়াছে? হয়ত অতি প্রাচীনকালে কোন কারিগর বা নক্সাকার এই মওগুলি হইতেই তাহার নির্মিত মন্দিরের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল।

ক্যাম্বেলপুরের ছাউনি নূতন। ব্যারাক বাড়ীগুলিতে সব ইঁটের দেওয়াল, আর ঢেউ খেলান টিনের ছাত। জল প্রচুর না হইলেও যথেষ্ট আর খুব সুস্বাদু। জলের আরও একটি প্রধান গুণ ছিল। অতি দুষ্পাচ্য আহার ভোজন করার পর এক গ্লাস জল পান করিলে অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হইত। খাদ্য প্রচুর, বিশেষত: আমিষ খাদ্য ও ফল। ফল নানা প্রকার ও এত সস্তা যে দামের কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। এক টাকায় এক বস্তা ন্যাসপাতি—বস্তায় হয়ত এক শতেরও অধিক ন্যাসপাতি। শুধু দুধের বেলায় কিঞ্চিৎ অসুবিধা ছিল, তাহাও প্রথম দিকে; কিছুদিন পরে, সেই অসুবিধা আর হইত না। কেননা গো-মহিষের দুগ্ধ অপর্যাপ্ত না হওয়ায় গো-মহিষের দুধের সাথে উটের এবং ছাগলের দুধও মেশান হইত। চা-পানের সময় চায়ের সুগন্ধের পরিবর্তে একটা অন্য প্রকার গন্ধ পাওয়া যাইত। কিছুদিন পরে যখন উট দুধের গন্ধ সহ্য হইয়া গেল, তখন দুধে উটের গন্ধ না থাকিলে মনে মনে একটা অভাব বোধ হইত।

গ্রামের বাহিরে এক বালুকাময় প্রান্তরে ছাউনি ফেলা হইয়াছে এবং ছাউনির প্রায় একেবারে কিনারা হইতেই কাল পিচের বিমান অবতরণ পথ নির্মিত হইয়াছে। অবতরণ পথ মোটে একটাই। সাধারণত: উত্তরণ বা অবতরণের সময় বিমানকে হাওয়ার বিপরীত গামী করিয়া চালান প্রয়োজন হয়। হাওয়ার গতির দিক দিনে দুইবার বদল হয়। সেই জন্য প্রত্যেক বিমান বন্দর নির্মাণের সময় অবতরণ-পথ দুইটি করা হয়, যাহাতে বিমান অবতরণ বা উত্তরণের সময় হাওয়া-প্রবাহের বিপরীত দিকে বিমান চালান যায়। হাওয়ার গতি যদি বিমান উড়িয়া যাইবার সময় বা অবতরণের সময় বিপরীতমুখী না হয়, তাহা হইলে বিমান উলটাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট থাকে, আর সেই সময় বিমান চালকের খুব সাবধান হইয়া বিমান চালনা করা প্রয়োজন। এ-সতর্কতায় একটু ভুল হইলেই বিমান উলটাইয়া যাত্রীর এবং আসে পাশের সকলের প্রাণগুলি না গেলেও অন্য সমূহ ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সমুদ্র উপকূল হইতে ক্যাম্বেলপুর বহুদূরে হওয়ার জন্য, হাওয়া সকালে যে দিক হইতে বহিত, বিকাল বেলায় সেই দিকের বিপরীত দিক হইতে বহিত। সেইজন্য অবতরণ-পথ মোটে একটিই যথেষ্ট ছিল।

কায়েনপুর পৌঁছাইয়া দেখিলাম যে কতকগুলি আনকোরা নূতন ভল্টিভল্‌জিয়ান্স বিমান আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং স্কোয়াড্রন পুরা উদ্যমে নূতন বিমানের সমস্ত জ্ঞান আহরণ করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। বৈমানিকেরা সকালে বিকালে উড়িয়া যাওয়ার ও অবতরণ করার মহড়া দিতেছে। আর এঞ্জিনীয়াররা বিমান উড়িয়া যাওয়ার পূর্বে ও পরে বিমানের প্রত্যেক অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে যে, কোন অংশ বিকল হইয়া গিয়াছে কিনা। অথবা বিকল হইবার পূর্বলক্ষণাদি প্রকাশ পাইল কিনা।

পূর্বেই বলিয়াছি ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স বিমান সোজা আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া বোমা ফেলার জন্য নির্মিত হইয়াছিল এবং এই বিমান নির্মাণের জন্য সমস্ত অংশই নূতন ধরণে ও আকারে গঠন করা ছিল। এই বিমানে শত্রুপক্ষের বিমানের সাথে আকাশ যুদ্ধের জন্য সরঞ্জামও কম ছিল না। সম্মুখ দিকে গুলি নিক্ষেপের জন্য চারটি বন্দুক ও বিমান চালকের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলের নিচে রক্ষিত একটি ক্ষুদ্র বিদ্যুতের বোতাম টিপিলে চারি বন্দুক হইতে একই সাথে গুলি নিক্ষিপ্ত হয়—যার বন্দুকের গুলির ব্যাস অর্দ্ধ ইঞ্চি। কোন ব্রিটিশ বিমানে অথবা জার্মান বা জাপানী বিমানে এক ইঞ্চের এক তৃতীয়াংশের বেশী ব্যাসের গুলি নিক্ষেপের জন্য বন্দুকের ব্যবহার তখনও সুরু হয় নাই। জাপানীদের বিমানে ত এক ইঞ্চের পঞ্চমাংশ ব্যাসের গুলিই ব্যবহার হইত। এবং নূতন বিমানের প্রত্যেক বন্দুক হইতেই প্রতি মিনিটে পাঁচশতেরও অধিক গুলি নিক্ষিপ্ত হইত। বিমানের পশ্চাৎ দিক হইতে যাহাতে শত্রু-বিমান আক্রমণ না করিতে পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা ছিল। পশ্চাতের ককপিটে হাইড্রলিক চালিত গানটারেট হইতে মেডিগোন্স এক সাথে চারটি বন্দুক হইতে গুলি নিক্ষেপ করিতে পারিত। সেই বন্দুকগুলি হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চ ব্যাসের গুলি নিক্ষিপ্ত হইত। গানটারেট হাইড্রলিক চালিত হওয়াতে পশ্চাতের যে-কোন দিক হইতেই শত্রু-বিমান আসুক না কেন, অতি শীঘ্রই চারিটি বন্দুক সেই দিকে ঘুরাইয়া তাগ করা সম্ভব ছিল।

বোমা লওয়ার ক্ষমতাও কম ছিল না। পেটের খোলের মধ্যে দুইটি পাঁচশত পাউণ্ডের অথবা একটি হাজার পাউণ্ডের বোমা এবং দুই ডানার নিচে আড়াই শত পাউণ্ডের দুইটি—মোট দেড় হাজার পাউণ্ড বোমা লইয়া প্রায় তিনশত মাইল বেগে উড়িয়া যাওয়ার ক্ষমতা এই বিমানের ছিল। বোমা ফেলার সময় যখন সোজা অবতরণ করিত তখন পাঁচশত মাইল বেগ অনায়াসে পার হইয়া যাইত। সোজা অবতরণের সময় প্রতিবেগ যাহাতে পাঁচশত মাইলের বেশী না হয়, তাহার জন্য দুই ডানার উপরে

ও নিচে হাওয়া ব্রেক করিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রয়োজন মত হাওয়া ব্রেক বিমান-চালক এক হাতল সরাইয়া প্রয়োগ করিত।

ককপিট দুইটি। সম্মুখের ককপিটে বিমানচালক স্বয়ং ও পশ্চাতের ককপিটে অন্য একজন, সে কিন্তু একাধারে অনেক—নেভিগেটর, গানার এবং বেতারবার্তা পরিবেশনকারী।

স্কোয়াড্রনে পৌঁছাইয়া দেখিলাম কয়েকজন এঞ্জিনীয়ার বৈমানিক নূতন আমদানী হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে ওয়ারেন্ট অফিসার মিত্রর সাথে পূর্ব-পরিচয় ছিল। নানা স্থানে পৃথক পৃথক ইউনিটে আমরা একই সময়ে ছিলাম। এবং হৃদ্যতা ভাল করিয়া জমিয়াছিল করাচীতে গুপ্তদার বাড়ীতে, আর শিক্ষানবিশী হইয়া আম্বালায় থাকাকালে বহুবার তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি এবং রাত্রির আহার শেষে ছেইশ লাইন ক্যান্টে ফিরিয়া আসিয়াছি। তিনি স্কোয়াড্রন এঞ্জিনীয়ার অফিসার হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে আমাদের মধ্যে পাইয়া খুব আনন্দ হইল। আর ভারতীয় এক নম্বর স্কোয়াড্রন হইতে দুইজন এঞ্জিনীয়ার বৈমানিক, সার্জেন্ট রমজান আলি এবং সার্জেন্ট গুলাব রব্বানী, আসিয়া স্কোয়াড্রনের দুই ফ্লাইটের ভার দুইজনে লইলেন।

স্কোয়াড্রনের গঠন বিষয়ে এইবার কিছু বলা প্রয়োজন। সাধারণতঃ প্রত্যেক স্কোয়াড্রনে তিনটি করিয়া ফ্লাইট থাকে, এ, বি এবং হেড্‌কোয়ার্টার ফ্লাইট। হেডকোয়ার্টার ফ্লাইটের কাজ-কর্ম্ম, অর্থাৎ তত্ত্বাবধান স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার নিজেই করেন। হেড্ কোয়ার্টার ফ্লাইটে বিমানের সংখ্যা খুব কম সাধারণতঃ দুইটি বা তিনটি ট্রেইনার বিমান, অপারেশন্যাল বিমানের সংখ্যাও তদনুরূপ দুইটি বা তিনটি। স্কোয়াড্রনের অপারেশন্যালের কাজ অর্থাৎ বোমা ফেলা বা দুষমনের বিমান আকাশ যুদ্ধে ধ্বংস করা স্কোয়াড্রনের দুই ফ্লাইটের কাজ। প্রত্যেক ফ্লাইটে পুরা আটখানা করিয়া স্কোয়াড্রনের প্রায় কুড়িখানা হইতে ২৪খানা বিমান থাকে। হেড্ কোয়ার্টার ফ্লাইট অবশ্য স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের তত্ত্বাবধানে থাকে কিন্তু অন্য দুইটি এ ও বি ফ্লাইটে দুইজন ফ্লাইট কমাণ্ডার। ফাইটার বা এক এঞ্জিনবিশিষ্ট ছোট বম্বার স্কোয়াড্রনে ফ্লাইট কমাণ্ডারদের র‍্যাঙ্ক সাধারণতঃ ফ্লাইট লেফটেনান্ট; কিন্তু বড় বম্বার বা বড় বিমানে যাহাতে একাধিক এঞ্জিন রহিয়াছে, ফ্লাইট কমাণ্ডারদের স্কোয়াড্রন লীডার হইতে হয়। সেইজন্য তিনশত তিপ্পান্ন নম্বর স্কোয়াড্রনে স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী এ ফ্লাইটের কমাণ্ডার ছিলেন।

সাত নম্বর স্কোয়াড্রনে এ ফ্লাইটে কমাণ্ডার হইলেন ফ্লাইট লেফ্‌টেনান্ট পিন্টো ও বি ফ্লাইটে ফ্লাইট লেফ্‌টেনান্ট লাল। সার্জেন্ট রমজান আলি এ ফ্লাইটে ও

সার্জেন্ট ওলান রব্বানী বি ফ্লাইটে নিযুক্ত হইলেন। বিমানের বিদ্যুতের কাজের ভার লইয়া একজন ইংরেজ ওয়ারান্ট অফিসার আসিলেন।

নূতন কয়জনই সিনিয়র, অন্ততঃ আমার তুলনায়। কাজেই আমার কাজ ফুরাইয়া আসিল বলিয়া মনে করিয়া, কাজে শিথিল হইয়া আরাম করার জন্য মনস্থ করিলাম। ইংরাজীতে যাহাকে "ফরওয়ার্ড" (forward) বলে, নিজেকে সেইদিকে না ঠেলিয়া চুপচাপ গা-ঢাকা দিয়া পিছনেই রহিলাম। স্কোয়াড্রন যাহাতে প্রস্তুতির পথে শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারে। এবং সেই প্রস্তুতিতে কোন প্রকার খুঁত না থাকে। সেইজন্য স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী ওয়ারান্ট অফিসার মিত্রের সাথে আলোচনা করিয়া ব্যবস্থা পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের আলোচনা করার সময় আমি ছুটিতে ছিলাম। কাজেই নূতন ব্যবস্থার কথা কিছুই জানা ছিল না। দুইদিন যাইতে না যাইতেই ডাক পড়িল ও হুকুম মিলিল যে স্কোয়াড্রনের সমস্ত বড় কাজ এবং সমস্ত জটিল কাজ স্কোয়াড্রনের সার্ভিসিং সেকশনে হইবে এবং সার্ভিসিং সেক্‌শনের তদারকির ভার আমার উপর ন্যস্ত হইল। এ ছাড়া কোন ফ্লাইট যদি তাহাদের কাজ সম্পূর্ণ না করিতে পারে, তবে সে কাজও সার্ভিসিং সেকশনে পাঠান হইবে। সার্ভিসিং সেক্‌শন বিমান মেরামতের কাজ সমাধা করিয়া বিমান পরীক্ষা—মাটির উপরে এবং আকাশে—করার পর ফ্লাইটে পাঠাইয়া দিবে।

পরদিন পুনরায় দপ্তরে ডাক পড়িল। এবার স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার কর্পোরাল বলিয়া সম্বোধন না করিয়া সার্জেন্ট বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তিনি বলিলেন এই প্রমোশনের আদেশ এয়ার হেড্ কোয়ার্টার হইতে কয়েকদিন পূর্বেই আসিয়াছে। কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় কোন অনুযোগ যোগ করি কিনা দেখার জন্যই তিনি এ সংবাদ গোপন রাখিয়াছিলেন। এদিক হইতে কোন অনুযোগ না থাকাতে তিনি বিশেষ খুসী হইয়াছেন।

KULJIAN-INDIA
in the service of

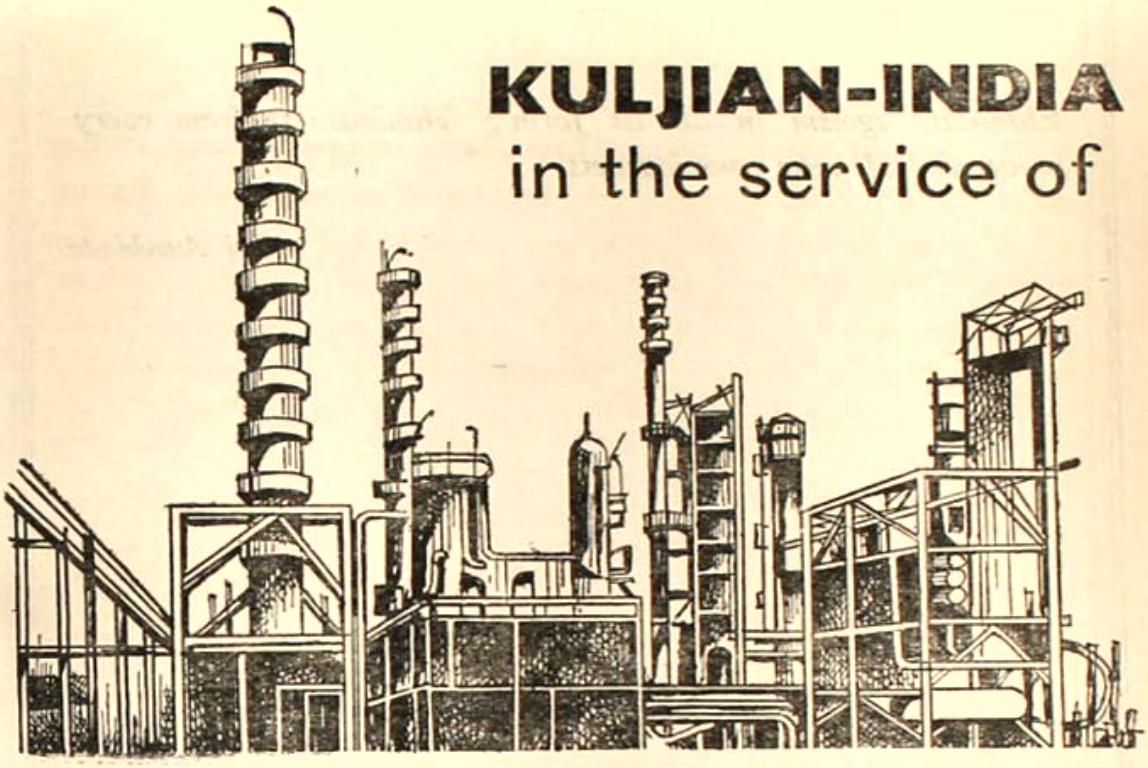

CHEMICAL
INDUSTRY

Kuljian's Chemical Engineering Department is equipped to take charge of complete engineering work for chemical manufacturing facilities. Kuljian can develop the selected process into a single-line flow diagram, prepare specifications for process equipment, handle the detail engineering, and undertake complete field engineering services. Project engineering is performed in conjunction with Kuljian's other engineering departments—mechanical, civil, electrical, architectural, and structural services. Equipment and material procurement, construction supervision, training of owner's personnel and start-up complete the picture.

Kuljian-India serves the industry—serves the nation

KULJIAN-INDIA

The **Kuljian** *Corporation (India) Private Ltd.*

CONSULTING ENGINEERS

24-B, PARK STREET, CALCUTTA-16.

Eliminate egoism in all its form; eliminate it from every movement of your consciousness.

—Sri Aurobindo

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

The value of our actions lies not so much in their apparent nature and outward result as in their help towards the growth of the Divine within us.

—Sri Aurobindo

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

॥ গান্ধী স্মারক নিধির বই ॥

বাহির হইল

আত্মকথা

মহাত্মাজীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

'The Story of My Experiments with Truth'-এর

নূতন বাংলা সংস্করণ

অনুবাদক : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

মূল্য : ১২·০০

কয়েকখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ

গান্ধী-রচনা-সংকলন

মূল্য : ৫·০০

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রণীত

মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি

মূল্য : ৩·০০

মোহনমালা

একখানি নিত্যব্যবহার্য গান্ধীবাণী-চয়নিকা

মূল্য : ৩·৫০

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

মহাত্মা গান্ধী

লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিমণ্ডিত একখানি অনুপম জীবনী

মূল্য : ৫·৫০ ৬·৫০ (কাপড়ে বাঁধাই)

সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকার জন্য পত্র লিখুন

প্রকাশন বিভাগ

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)

১২ডি শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

ফোন : ৩৪-৩৩৬১

God is infinite possibility. Therefore Truth is never at rest; therefore, also, Error is justified of her children.

—Sri Aurobindo

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

PHONE : 34-2665 GRAM : Boxboard

With Compliments of : —

INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,

57, Radhabazar Street,
CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA-33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

OFFICE PHONE:
22-4972.

Very often it so happens that the things a man does not really need are just the things that cause him most harm.

—The Mother

BENGAL IMMUNITY

COMPANY LIMITED

CALCUTTA-13

!! নূতন প্রকাশিত !!

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের

কবির্মনীষী (দুই খণ্ড)

বেদমন্ত্র

উপনিষদ-কাহিনী

রবীন্দ্রনাথ

অনির্বাণের

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

সমীরকান্ত গুপ্তের

মনের মন মুকুর

প্রতি ৩.৫০ টাকা

[দার্শনিক, কবি, চিত্রকর, মুক্তিযোদ্ধা, বৈজ্ঞানিক, কর্মবীর ও জীবন থেকে অন্যান্য কাহিনীমালা]

Just Out

In Search of Freedom

By Jogesh Chatterjee

Price Rs. 25/- Postage extra

P. C. Chatterjee

6, Mission Road

Calcutta—1

Telegrams: 'Vessel' Cal
Codes { Scott 10th. Ed., A. B. C. 5th. Ed., Bentley's

Telephones { Office : 23-1393 Dock Office: Residence: { 55-6464 55-3724 55- 503

SARAT CHATTERJEE & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS

3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Regular Services:

AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of:

LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO., LTD.
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম জীবন-কথা

[শ্রীনারায়ণপ্রসাদ লিখিত "Life in Sri Aurobindo Ashram এর অনুবাদ]

পশুপতি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনূদিত

দাম ছয় টাকা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই সাত টাকা

হাবড়া "বাতুনদিয়" হইতে প্রকাশিত এবং
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে (পণ্ডিচেরী) ও
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে (১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২) প্রাপ্তব্য।

Telegram : "Kusumika"

Phone : 23-7586
(3 lines)

With best compliments from

Messrs. Deepak Industries Limited

16, Hare Street,

CALCUTTA-1

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

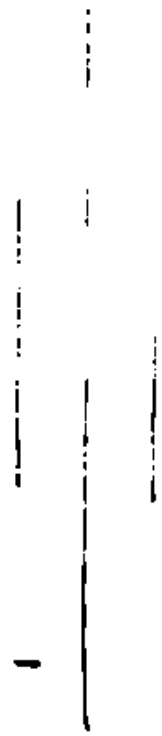

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির প্রকাশনা

যোগ সাধনার ভিত্তি		শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
যোগ সমন্বয় প্রসঙ্গ		অনির্বাণ	১৫·০০
স্মৃতির পাতা (১ম পর্যায়)		শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪·৫০
ঐ (২য়)		ঐ	৪·০০
কবিবিনোদী (১ম খণ্ড)		ঐ	৩·০৫
ঐ (২য়)			৪·৫০
রবীন্দ্রনাথ		ঐ	৩.৫০
শ্রীঅরবিন্দ-জীবন ও কর্ম		পশুপতি ভট্টাচার্য (অনুবাদক)	৫·০০
Talks with Sri Aurobindo		by Nirodbaran	৮·০০
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	রহস্যবাদ প্রসঙ্গে	অনিলবরণ রায়	২·০০
সাধনার জীবন		নলীনকান্ত গুপ্ত	২·০০

GSIF 1961

আশ্রম প্রকাশনা

বিবিধ রচনা	শ্রীঅরবিন্দ	১·০০	উত্তর রহস্য	শীনা	১·০০
ভারতের নবজন্ম		১·৫০	ছোটদের গল্প		১·৫০
কর্মযোগী		১·৫০	পুরাণো লেখা		১·৫০
জগন্নাথের রথ		১·০০	শিক্ষা		১·৫০
গীতার ভূমিকা		২.০০	মায়ের আলাপ		২·৫০
শ্রীঅরবিন্দের পত্র		১·০০	সর্বোত্তম আবিষ্কার		০·৩৭

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীঅরবিন্দ বুকস্ ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ

১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট

ক লি কা তা—১২

ফোন—৩৪-২৩৭৬

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

১৪ নভেম্বর, ১৯৬৭

বর্ষ—২৭ সংখ্যা—৪

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৭)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মাতৃবাণী		৩
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৫৩
সাবিত্রী		২৩
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	২৮
তামিল পদাবলী	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৩৭
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৭১
কঠিন ডানায় ওড়া	বীরবাহু	৮৯

বার্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	৬০.০০	বার্ষিক	২০০.০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫.০০		১২০.০০
প্রতি সিকি পৃষ্ঠা	২৫.০০		৮০.০০
ভিতরের মলাট	১০০.০০		৩২০.০০
বাহিরের মলাট	১২৫.০০		৪০০.০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম দেড় টাকা

Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Edited by : Nolini Kanta Gupta
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2
Printed in India

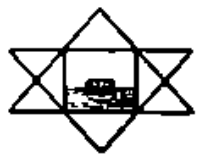

২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৭

এই যে মোহদর্শী শত্রুপক্ষ কণ্ঠ তা প্রত্যেকেরই প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে নিরন্তর—প্রশ্ন করে, তর্ক করে, অস্বীকার করে, আপন অভিজ্ঞতাটিকে পর্যাপ্ত, নিজের উপর, ভগবানের উপর সংশয় তুলে ধরে—একে চিনতে হবে, ভগবৎ-শত্রুর কণ্ঠ ব'লে, তার চেষ্টা অগ্রগতি রুদ্ধ করা—তার উপর কোন আস্থা স্থাপন করবে না।

—শ্রীঅরবিন্দ

মাতৃবাণী

ছোটদের শিক্ষা

পরীক্ষায় ছল-চাতুরী

প্রশ্ন : কি করা উচিত আমার? বাইরে যা করা হয় তাই করব? পরীক্ষার ঘরে তিনজন শিক্ষককে লাগিয়ে দেব পাহারা দেবার জন্যে? শিক্ষকেরা এখানে আশ্রমে এরকম জিনিষ পছন্দ করেন না।

কিম্বা পরীক্ষা একেবারে তুলে দিলে হয়? এ প্রস্তাবটি আমার কাছে সন্দেহের উদ্রেক করে। কারণ পরীক্ষায় যা করা হয়, বিশেষ লেখা বা পড়া দিলেও, তাই করা হবে।

যা হোক সমস্যাটা ত এই। এখন সমস্যার মীমাংসা করতে হ'লে জানা দরকার শিক্ষার্থীরা এ রকম করে কেন?

আমি জানতে চাই এই কুটিলতার কারণ কি? এর মীমাংসাই বা কি?

মায়ের উত্তর অতি সহজ—কারণ হ'ল এই যে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই পড়াশুনা করে তাদের অভিভাবকদের চাপের ফলে, তারা যে শিখতে চায়, জানতে চায়, এজন্য নয়। শিক্ষার মূল প্রেরণা যতদিন সংশোধন না হবে, যতদিন জ্ঞানের জন্য শিক্ষা না চাইবে ততদিন তারা ছলচাতুরী করবেই, পরিশ্রম লাঘব করার জন্য যত কম চেষ্টা করে ফললাভ হয় তার জন্য।

*

সঙ্কল্প

(প্রত্যেক ছাত্র প্রত্যেক দিন পাঠ করবে)

আমরা যে পড়াশুনা করি তা আমাদের পরিবারের জন্য নয়, পদাকাঙ্ক্ষার জন্য নয়, অর্থ উপার্জনের জন্য নয়, একখানা সম্মানপত্র লাভ করবার জন্য নয়।

আমরা পড়াশুনা করি শিক্ষার জন্য, জ্ঞানের জন্য, জগৎকে বুঝবার জন্য, আর এ-সকলে যে আনন্দ তার জন্য।

*

একমাত্র মীমাংসা হ'ল এই পরীক্ষা, সব পরীক্ষাই বাতিল করা। কাগজপত্র সব বাতিল করে রেখে দাও নিজের কাছে—যেন ওসব কিছুই হয়নি। আর তোমার ক্লাস করে যাও নিশ্চিন্তভাবে।

বছরের শেষে ছাত্রদের নম্বর দেবে তাদের পরীক্ষার লিখিত কাগজ দেখে নয়, দেখতে হবে তাদের স্বভাব, তাদের মনোযোগ, তাদের নিয়মানুগত্য, তাদের অবধারণ-তৎপরতা এবং বুদ্ধির প্রসারতা।

নিজের দিক থেকে তুমি এ জিনিষটি সাধনা হিসাবেই গ্রহণ করবে ; নির্ভর করবে বেশির ভাগ আন্তর সংযোগের উপর, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের উপর আর অপক্ষপাত দৃষ্টির উপর। শিক্ষার্থীদের দিক থেকে এতে প্রয়োজন হবে তারা যা শিখবে তা সত্যসত্যই বুঝে শিখবে, যা ভালরকম বোঝা হয়নি তা তোতাপাখীর মত মুখস্থ বলে যাওয়া নয়। এই উপায়ে শিক্ষণব্যবস্থায় একটা সত্যকার উন্নতি দেখা দেবে।

*

আমার মতে ছাত্রেরা বুদ্ধিমান, ইচ্ছুক এবং মনোযোগী কিনা তা জানবার জন্যে পরীক্ষা হল একটা অতীতের নিষ্ফল উপায়। নির্বোধ যন্ত্রবৎ যে কোন মন পরীক্ষায় ভাল উত্তর দিতে পারে যদি তার স্মরণশক্তি ভাল হয়—কিন্তু ভবিষ্যতের মানুষের পক্ষে এইসব নিশ্চয় প্রয়োজনীয় গুণাবলী নয়।

পুরাতন অভ্যাস সব আমি সহ্য করে গিয়েছি তাই আমি সম্মতি দিয়েছিলাম যে যারা পরীক্ষা চায় তা দিতে পারে। কিন্তু আমি আশা করি ভবিষ্যতে এরকম অনুকম্পার প্রয়োজন হবে না।

শিক্ষার্থী পড়াশুনায় ভাল কিনা তা জানতে হ'লে, পরীক্ষা যদি তুলে দেওয়া হয়, দরকার হবে শিক্ষকের পক্ষে আরও বেশি আন্তরসংযোগ, আরও বেশি আন্তরবৃত্তির জ্ঞান। কিন্তু আমাদের শিক্ষকেরা, আশা করা যায়, হবে যোগসাধক। সুতরাং তাদের পক্ষে এ জিনিষ কঠিন হওয়া উচিত নয়।

*

শিক্ষককে নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা করে দেখতে হয় যে সে কিছু শিখেছে কিনা, উন্নতি করেছে কিনা। তবে এই পরীক্ষা হওয়া দরকার ব্যক্তিগত এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপযুক্ত, সকলের পক্ষে একই কলের মত পরীক্ষা নয়। পরীক্ষা হবে অকৃত্রিম, অপ্রত্যাশিত, সেখানে ছল বা কপটতার কোন অবসরই থাকবে না, স্বভাবতঃই শিক্ষকের পক্ষে এ জিনিষ অনেক বেশি কঠিন, সেইজন্য ঠিক এইজন্যই অনেক বেশি জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক।

তোমার শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য আমি বেশ উপভোগ করেছি। তাতে প্রমাণ হয় প্রত্যেকের সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রয়েছে, সুষ্ঠু শিক্ষাদানের পক্ষে এ জিনিষ একান্ত প্রয়োজন। যাদের আন্তরিকতা নাই তারা সত্যসত্যই শিখতে চায় না, চায় ভাল নম্বর ও প্রশংসা শিক্ষকের কাছ থেকে। তারা আমাদের মন আকর্ষণ করে না।

*

তোমার বিশ্বাস এসেছে এই কথাটি থেকে যে তুমি এখনও ধরে রয়েছ সেই পুরাতন ধারণা যে জীবনের মধ্যে কোন জিনিষ উঁচু আর কোন জিনিষ নীচু। কথাটা ঠিক নয়। কোন জিনিষ বা কোন কাজ যে উঁচু বা নীচু তা নয়, কর্ম্মীর চেতনাই হতে পারে সত্য আর নয় মিথ্যা।

তুমি যদি তোমার চেতনাকে পরমাচেতনার সঙ্গে এক করে ধরতে পার এবং তাকে প্রকাশ করতে পার, তবে তুমি যা-কিছু চিন্তা কর, যা-কিছু অনুভব কর, যা-কিছু কর্ম্ম কর সবই হবে আলোময়, সত্যময়। শিক্ষার বিষয়ের যে পরিবর্ত্তন করা দরকার তা নয়, যে চেতনা নিয়ে তুমি শিক্ষাদান কর তাকেই আলোকিত করে তুলতে হবে।

*

সবই আপেক্ষিক পরাৎপর ব্যতিরেকে, একমাত্র পরাৎপরই নিরূপাধিক; তবে পরাৎপর রয়েছে প্রত্যেক সত্তারই হৃদ্দেশে, তাই প্রত্যেক সত্তাই আপনার মধ্যে বহন করে চলেছে আপনার পরাগতি।

*

সত্যের দৃষ্টিতে আমরা সকলেই ভগবান, তবে আমরা তা জানি না। আমাদের যে জিনিষটি ভগবান নয়, ঠিক তাকেই আমরা নাম দেই "আমরা"।

*

(ছোটদের প্রতি)

হও অকপট।
হও সত্যনিষ্ঠ।
হও একাগ্র।
তোমার আস্পৃহাকে কখনও ভুলো না।

*

তুমি দয়া চাও?—হও তবে দয়ালু।
তুমি সত্য চাও?—হও তবে সত্যময়।
তুমি নিজে যা, তা থেকে যা দেবে, তাই তুমি পাবে।
তোমার জগৎ হ'ল তোমারই প্রতিফলন।

*

প্রশ্ন ও উত্তর

(১)

আমায় জিজ্ঞাসা করা হয়—"রূপান্তরের কাজে কে তার ভাগটি সবচেয়ে একান্ত ধীরে করে চলে, মানুষ না ভগবান?"

আমার উত্তর—

"মানুষ দেখে তার প্রার্থনা ভগবানই অতি ধীরে পূর্ণ করে চলেন।
আর ভগবান দেখছেন তাঁর প্রভাব মানুষই গ্রহণ করে অতি ধীরে।
কিন্তু সত্যময় চেতনায় সবই চলেছে ঠিক যেমন চলা উচিত।

(২)

প্রশ্ন : মনকে স্থির রাখা যায় কি উপায়ে?

উত্তর প্রথম প্রয়োজন হল যত কম কথা বলা যায়।

দ্বিতীয় হল, চিন্তা করবে যে কাজটি সেই মুহূর্তে তুমি করে চলেছ, চিন্তা করবে না যা তোমায় করতে হবে কিংবা যা তুমি আগে করেছ।

তৃতীয়, যা হয়ে গিয়েছে তার জন্যে দুঃখ করবে না কিংবা যা হবে তা নিয়ে জল্পনা করবে না।

চতুর্থ, যতটা সম্ভব নৈরাশ্যময় চিন্তা করবে না, সর্বদা আশায় ভর করে চলবে।

(৩)

প্রশ্ন : ভগবান কাকে বলি?

উত্তর ভগবানকে জীবনে পেতে হয়, ভগবানের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

ভগবান হ'ল পূর্ণের পূর্ণ, যা-কিছু রয়েছে তার চিরন্তন উৎস। তার জ্ঞান আমাদের ঘর ক্রমে ক্রমে, যদিও তাঁর সঙ্গে আমরা একীভূত চিরন্তন কাল ধরে।

এ নাম মানুষে দিয়েছে যা-কিছু তাকে অতিক্রম করে রয়েছে, তাকে অধিকার করে রয়েছে, যা-কিছু সে জানতে পারে না অথচ যার বশীভূত হতে হয়।

প্রশ্ন : আমি জানতে চাই ভগবান কি?

উত্তর : ভগবানকে তোমার জানার দরকার নেই, তা হয়ে উঠতে হবে।

*

পণ্ডিচেরী আকাশবাণী-উদ্বোধন
অনুষ্ঠান উপলক্ষে
(২৩-৯-৬৭)

হে ভারত, জ্যোতির, অধ্যাত্মজ্ঞানের দেশ। জগতে তোমার সত্যকার ব্রতের চেতনায় সজাগ হও, পথ দেখাও সম্মিলনের দিকে, ঐক্যের দিকে।

শ্রীঅরবিন্দের "সাবিত্রী"

(১)

শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী হল ভাগবতী বাক্ বিশ্বজিজ্ঞাসার উত্তরে। বিশ্ব, বিশ্বসৃষ্টি একটা যেন বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্ন। জগৎটা কি, কেন, কোথা হতে, কি উদ্দেশ্যে—আমরা মানুষেরা আছি কেন, কোন সার্থকতার নিমুক্ত আমরা জীব সব? এই যে আদি সমস্যা তার মীমাংসা সাবিত্রীর মন্ত্রাবলী।

অশ্বপতি এই মানুষী আস্পৃহার অভীপ্সার প্রতীক এবং মানুষী-তনু সাবিত্রী তার উত্তর। আস্পৃহা অভীপ্সা অর্থ সত্যকে জানবার, লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা। অশ্বপতি হলেন তাই চেতনার জাগরণ, ক্রম-উন্মীলন।

অশ্বপতি সর্বপ্রথমে এই যে বাহ্য স্থূল ভৌতিক জগৎ তার পরিচিত নিত্যনৈমিত্তিক চেতনা সরিয়ে দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করলেন একটা সূক্ষ্ম-ভৌতিক লোকে। সেখানে দেখতে পেলেন, একটা সিঁড়ি যেন উঠে গিয়েছে ঊর্ধ্বে ধাপে ধাপে তা বেয়ে চললেন তিনি, যত উঠে চলেন চেতনা তত সূক্ষ্মতর ব্যাপকতর হয়ে ওঠে, জ্ঞানের মাত্রা বেড়ে চলে। এই সব লোকের কথা আমরা জানি প্রাণলোক—স্থূলপ্রাণ, সূক্ষ্মপ্রাণ, নিম্নতর প্রাণ, উচ্চতর প্রাণ, তারপর মনোময় লোক—নিম্নতর মন, উত্তর মন ইত্যাদি। প্রত্যেক লোকে চেতনার ধারা ভিন্ন, সামর্থ্য ভিন্ন আর শুধু যে সেখানে শক্তির বা ভাবের সাধারণ বা নিরাকার খেলা রয়েছে তা নয়, আছে শক্তির বিগ্রহ, ভাবের বিগ্রহ, ব্যক্তিরূপ সব। নিম্নতরলোকে আমরা যাদের নাম দিয়েছি জিন্, দানা, তারা রয়েছে, রয়েছে যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব; ঊর্ধ্বতর ক্ষেত্রে রয়েছে দেবতারা।

অশ্বপতি দেখতে চাইলেন এই যে সব অর্ধ-সৃষ্টি, অসম্পূর্ণ সৃষ্টি, এই যে ব্যর্থতার সাম্রাজ্য, এর মূল কোথায়, উৎস কোথায়? তিনি চলে গেলেন এদের পিছনে, উপস্থিত হলেন গিয়ে একটা ঘোর নির্জ্ঞানের অতলে যেখানে রয়েছে মিথ্যার পাপের অশুভের যত বীজ। সেখানে শঙ্কা বেদনা মালিন্য কলুষতা। অশ্বপতি দেখলেন

There Ego was lord upon his peacock seat
And falsehood sat by him, his mate and queen.

অহং সেখানে রাজা, ময়ূরসিংহাসনে আসীন;
মিথ্যা তার পার্শ্বে, তার সহচর, তার পাটরাণী।

দেখলেন এমন সত্তা সব, প্রলোভন, ভীতি সব, যারা ঊর্ধ্বগামী মানুষকে নীচে টেনে রাখে, নিয়ে যায় নিরয়ের দিকে, পরনা বিনষ্টির দিকে

In Night he plunged to know her dreadful heart,
In Hell he sought the root and cause of Hell....
In vague tremendous passages of Doom
He heard the goblin voice that guides to slay,...
In menacing tracts, in tortured solitudes
Companionless he roamed through desolate ways
Where the red Wolf waits by the fordless stream
And Death's black eagles scream to the precipice,
And met the hounds of bale who hunt men's hearts
Baying across the veldts of Destiny.

রাত্রির অন্তরে সে ডুব দিল,
তার ভীতিময় অন্তর্হৃদয় জানবার জন্যে,
নরকের মধ্যে গিয়ে সে খুঁজে চলল নরকের মূল ও হেতু
কান্নাক্লান্তের অস্ফুট বিরূপ পথে পথে
শুনল সে প্রেতকণ্ঠ ভুলিয়ে চলেছে জীবকে বলি দেবার জন্য
ভয়াবহ প্রান্তরে, কুটিল জটিল জনহীন রিক্ত প্রসারে
সঙ্গীহারা সে বিচরণ করে শূন্যপথে,
রক্তবর্ণ নেকড়ে সেখানে খেয়াহীন নদীর ধারে
থাকে ওৎ পেতে
মৃত্যুর কৃষ্ণকালো শকুন চিৎকার করে চলে যায়
খাড়া পাহাড়ের দিকে;
দেখে সে হিংস্র শ্বাপদের মানুষের হৃৎপিণ্ডের জন্যে
শিকারে ঘুরে বেড়ায়;
নির্মম নিয়তির তেপান্তর প্রতিধ্বনিত
তাদের কক্রকণ্ঠে।

এ রাজ্যের ভিতর দিয়ে পথিককে পথ বেয়ে উঠে যেতে হবে সাবধানে সতর্কে সাহসে সজাগ থেকে—

Here must the traveller of the upward way—
For daring Hell's kingdoms winds
the heavenly route—

Pause or pass slowly through that perilous space,
A prayer upon his lips and the great Name.

ঊর্দ্ধ্বমুখী পথের পথিক—
স্বর্গের পথ অতি দুঃসাহসে নরকের রাজ্য ভেদ ক'রে
ঘুরে ঘুরে চলে—
থামবে এখানে, ধীরে পার হবে এই বিপদের ভূমি,
ওষ্ঠে নিয়ে রক্ষামন্ত্র আর সেই মহানাম।

এই ঘোর আঁধারের, এই মিথ্যার প্রবঞ্চনার আতঙ্কের নরক পার হয়ে যেতে হবে, উপায়ান্তর নেই, স্বর্গের রাস্তা নরকেরই ভিতর দিয়ে প্রসারিত—

None can reach heaven who has not
passed through hell.

স্বর্গে কেউ পৌঁছিতে পারে না
নরকের ভিতর দিয়ে না গিয়ে।

কিন্তু একবার পার হয়ে গেলে মুক্ত পথিক শুনবে পরিশেষে—

A paean-song of the free Infinite
And the Name foundation of Eternity.

মুক্ত আনন্তের বৈজয়ন্তী,
সেই মহানাম শাশ্বতের পাদপীঠ।

অন্ধকারের জগৎ ছেড়ে অশ্বপতি উঠে দাঁড়ালেন আলোকের জগতে যেখানে প্রথমে হ'ল জ্ঞানী সিদ্ধপুরুষদের লোক। কিন্তু এ আলোকও অর্দ্ধালোক, অসম্পূর্ণ সঙ্কীর্ণ—আপন আপন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। প্রত্যেক লোকের অভিজ্ঞতা আহরণ করে চেতনাকে সমৃদ্ধতর পূর্ণতর করে অশ্বপতি চললেন ক্রমশঃ ঊর্দ্ধের বিশাল আলোকের আনন্দের অভিমুখে। সব লোকাবলী পার হয়ে মনকে ছাড়িয়ে আরও উত্তরধামে উঠে গেলেন, দেবতাদের অধিষ্ঠান পার হয়ে জগতের আদিমূলে পৌঁছলেন গিয়ে সচ্চিদানন্দময় স্থিতির মধ্যে। হয়ত বা তাকেও অতিক্রম করে গেলেন তিনি এক অজ্ঞেয়ের অনির্দ্দেশ্যের মধ্যে—

A silent Cause occult, impenetrable,—
Infinite, eternal, unthinkable, alone....
A stillness absolute, incommunicable.

নীরব মহাকারণ এক, প্রচ্ছন্ন অভেদ্য,
অসীম অনন্ত অচিন্ত্য একক...

নৈঃশব্দ্য এক নির্বিশেষ সর্বাতীত।

এই তবে শেষ? পৌঁছান গেল সিদ্ধির চরমে? সকল মীমাংসার শেষ মীমাংসা? নিঃশ্বাস ফেলে বলা চলে এখন "ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"?

না, তা ত নয়—অশ্বপতির সন্দেহ উঠল কেন, একটা অভাবের বোধ যেন এল কোথা হ'তে—

Only the everlasting No has neared....
But where is the Lover's everlasting Yes?

কাছে এসেছে শুধু সেই চিরন্তন 'না',
কিন্তু কোথায় রয়ে গেল প্রেমিকের চিরন্তন 'হাঁ'?

অশ্বপতির হৃদয় দুলে উঠল কেন, কে যেন বলছে অস্ফুটস্বরে—

The ego is dead; we are free from being and care,
We have done with birth and death and
work and fate.
O soul, it is too early to rejoice!
Thou hast reached the boundless silence of the Self,
Thou hast leapt into a glad divine abyss;
But where hast thou thrown self's mission and
self's power?
On what dead bank on the Eternal's road?

অহম্ মৃত, মুক্ত আমরা অস্তিত্ব হতে, ভাবনা হতে,
জন্ম আর মৃত্যু, কর্ম্ম আর নিয়তি আমরা শেষ করেছি।
হে জীব! কিন্তু উৎফুল্ল হবার সময় এখনও আসে নাই
আত্মার অসীম নীরবতায় তুমি পৌঁছে গিয়েছ,
তুমি ঝাঁপিয়ে পড়েছ এক আনন্দময় স্বর্গীয় অতলে;
কিন্তু কোথায় ফেলে দিয়ে এসেছ তোমার অন্তরাত্মার ব্রত,
তোমার অন্তরাত্মার শক্তি
শাশ্বতের পথে কোন এক উষর প্রান্তরে?

অশ্বপতির নূতন অনুভব হতে সুরু করল। জগতের সৃষ্টির শেষ; কিন্তু জগতের শেষে জগৎ-জননী, সৃষ্টির আদিতে আদি-জননী—

A Mother Might brooded upon the world.

বিশ্বের উপরে ধ্যানানত মাতৃশক্তি।

এ জগৎ আর পরাৎপরের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই মাতৃশক্তি, উভয়ের সংযোগ-সেতু। অশ্বপতির এখন ক্রমে বোধ হল যে এই জগতের একটা লক্ষ্য আছে এবং সেই লক্ষ্য সিদ্ধ করাই মানুষের কাজ ও জীবনের অর্থ। সৃষ্টি অসম্পূর্ণ, তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে, পৃথিবী অজ্ঞানের আবাস, তাকে জ্ঞানালোকিত করতে হবে; মানুষ দুঃখ-দৈন্য জরা-মৃত্যু-বশীভূত, তাকে মুক্ত হতে হবে। তিনি যে দেখেছিলেন ও পেয়েছিলেন বিশ্ব হতে জীবন হতে নিষ্কৃতি, তুরীয় আনন্দে স্থিতি, তা শেষ নয়, তা সিদ্ধির প্রতিষ্ঠা মাত্র।

কিন্তু এই যে পরিবর্তনের রূপান্তরের কাজ, তাই ত জগজ্জননীর কাজ। মানুষের নিজের পক্ষে নিজের চেষ্টায় ও সামর্থ্যে সে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। অশ্বপতি তাই মাতৃশক্তিকে আহ্বান ও আবাহন করলেন। কিন্তু আরও কিছু পরীক্ষা ছিল, তাঁর আত্মধার আরও পরিপূর্ণতা, তাঁর চেতনার ও সত্তার আরও প্রগাঢ়তা প্রসারতা প্রয়োজন। তাই তাঁর এই নব প্রার্থনার উত্তরে বুঝাবার চেষ্টা হ'ল যে বিশ্বের কাজ বিশ্বনিয়ন্তা নিজে করে চলেছেন, মানুষের চিন্তা বা দুশ্চিন্তা নাই কিছু। মানুষ যদি আপনাকে মিলিয়ে ধরতে পারে, এক হয়ে যেতে পারে এই বিশ্বকর্তা আর তাঁর বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে তাতেই মানুষের সম্পূর্ণ সার্থকতা। অশ্বপতিকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল বিশ্বের কাজে নিযুক্ত থাকবে, প্রকৃতির ব্রত উদ্‌যাপনে সহায় হবে, আপন বিশ্বভূত অন্তরাত্মার প্রেরণায় ও চেতনায় চলে ক্রমে বিশ্বসংসিদ্ধির লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে।

ভাগবত বাণী বলছে অশ্বপতিকে—

I ask thee not to merge thy heart of flame
In the Immobile's wide uncaring bliss...
Thy soul was born to share the laden Force;
Obey thy nature and fulfil thy fate:
Accept the difficulty and godlike toil,
For the slow-paced omniscient purpose live....
All things shall change in God's transfiguring hour.

আমি বলি না তোমার আগুনের হৃদয় তুমি ডুবিয়ে দাও
ব্রহ্মের বিশাল নিশ্চিন্তার প্রশান্তির মধ্যে...
জীব জন্মগ্রহণ করেছে জড়ের গুরুভার বহন করবার জন্যে
তোমার প্রকৃতি অনুসরণ করে চল, তোমার দৈবকে সার্থক কর
বাধা-বিঘ্ন স্বীকার কর, স্বীকার কর দেবযজ্ঞে কর্ম্মশ্রম,
জীবন-যাপন কর মন্থরগতি নিয়তির ধারায়...
সবই পরিবর্ত্তিত হবে ভগবানের রূপান্তরকারী কালক্রমে।

কিন্তু অশ্বপতি তা মানলেন না; তাঁর মানুষী আগ্রহ চায় পৃথিবীর প্রকৃতির গতিকে ত্বরান্বিত করে তুলতে, চায় মাতৃশক্তির কল্যাণে যাতে যুগ-যুগান্তর এ কাজ টেনে টেনে না চলে উদ্‌যাপিত হয় অনতি-বিলম্বে। মাতৃশক্তির আছে এই শক্তি, তাই তাঁর হৃদয়ের অভীপ্সা বলে উঠল

Heavy and long are the years our labour counts
And still the seals are firm upon man's soul.
And weary is the ancient Mother's heart...
Linger not long with thy transmuting hand
Pressed vainly on one golden bar of Time,...
Let a great word be spoken from the heights
And one great act unlock the doors of Fate.

সুদীর্ঘ ভারাক্রান্ত সব বৎসরের পর বৎসরকে গুনে চলেছে
আমাদের কায়ক্লেশ...
তবু মানুষের বুকের দুয়ার রয়েছে দৃঢ়বদ্ধ,
সনাতনী মায়ের হৃদয় শ্রান্ত-ক্লান্ত—
আর দেরী কর না, তোমার রূপান্তরকারী হাত আর ধরে রেখ না
কালের সোনালী অর্গল বৃথাই আকর্ষণ করেছ এতদিন...
ঊর্দ্ধ হতে স্ফুরিত হোক মহাবাক্য এক,
মহা কৃতি এক নিয়তির তোরণ উন্মুক্ত করে দিক...

জগৎ-জননীর আসন টলল, করুণার উৎস খুলে গেল, তিনি আশীর্ব্বাণী আশ্বাসবাণী দিলেন:

O strong forerunner, I have heard thy cry.
One shall descend and break the iron Law,...

A seed shall be sown in Death's tremendous hour,
A branch of heaven transplant to human soil;
Nature shall overleap her mortal step;
Fate shall be changed by an unchanging will.

হে বীর অগ্রণী, তোমার উদাত্ত কণ্ঠ আমি শুনেছি,...
নেমে আসবে একজন, সে ভেঙ্গে ফেলবে লৌহবিধি...
বীজ এক উপ্ত হবে মৃত্যুর সঙ্কট-মুহূর্ত্তে;
মানুষী মাটিতে রোপণ হবে নন্দনের তরুশাখা;
প্রকৃতি তার মর্ত্তপদক্ষেপ উল্লঙ্ঘন করে যাবে;
নিয়তি পরিবর্ত্তিত হবে অপরিবর্ত্তনীয় সংকল্পের বশে।

জগৎ-জননী অখণ্ডপতির কন্যা হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন, মাটির মানুষ হয়ে যিনি মাটির রূপান্তর ঘটাবেন।

(২)

জগৎ-জননী পরাশক্তি নেমে এলেন ধরাধামে মানুষী কন্যারূপে, তাঁর ব্রত পার্থিব সৃষ্টিকে আপন স্বরূপে পরিবর্ত্তিত করা। পৃথিবী এখন মূর্ত্ত অচেতনা—তার মধ্যে চূর্ণরেণু হয়ে পরম-চেতনা পুরুষোত্তম আপনাকে ছড়িয়ে হারিয়ে ফেলেছেন। এই মৃত্যু-কবলিত পরাসত্তাকে পুনর্জীবিত করে ধরতে হবে। মিথ্যার মধ্যে সত্য লয় পেয়েছে; সত্যকে সত্যবানকে মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। মৃত্যুকে জয় করা অর্থ অচেতনাকে নিশ্চেতনাকে জয় করা, চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করা তার স্বরূপে—পৃথিবীতে নবজীবন আরম্ভ এই অমর নবচেতনা দিয়ে।

সাবিত্রীর এই ব্রত উদ্‌যাপনে রয়েছে দুটি পর্ব্ব—প্রথম, আপন প্রস্তুতি, দ্বিতীয় কার্য্যসিদ্ধি। সাবিত্রী পেয়েছিলেন একটি বৎসরের সংসার-জীবন। এই একটি বৎসর ধরে তিনি আপনাকে গড়ে তুলছিলেন। মৃত্যু সম্মুখে, কি করণীয় তাঁর? তাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হল: এই ত তোমার কাজ, মৃত্যুকে জয় করে অমর জীবন স্থাপন কর পৃথিবীতে।

Arise, O soul, and vanquish Time and Death.
ওঠো জীব, জয় কর কাল, জয় কর মৃত্যু।

মানুষী ভাবের প্রতীক সাবিত্রী এখন। মানুষকে মানুষীভাব কাটিয়ে উঠে যেতে হবে উত্তর-চেতনায়। মানুষী ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বলে উঠলেন :

আমি চাই সত্যবানকে, সত্যবানের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে থাকতে এ-লোকে হোক না হয় অন্যলোকে, অপর কাজে আমার কি প্রয়োজন?

My strength is taken from me and given to Death,
Why should I lift my hands to the shut heavens....
Why should I strive with earth's unyielding Laws
Or stave off Death's inevitable hour?
This surely is best to practise with my fate
And follow close behind my lover's steps
And pass through night from twilight to the sun....

আমার শক্তি আমার কাছ থেকে হরণ করে
নেওয়া হয়েছে, দেওয়া হয়েছে মৃত্যুকে,
আমি হাত তুলে ভিক্ষা চাইব কেন অবরুদ্ধ স্বর্গের দিকে...
কেন পৃথিবীর অটল বিধির সঙ্গে যুদ্ধ করব,
মৃত্যুর অনিবার্য্য মুহূর্তকে সরিয়ে দেব কেন?
বরং নিয়তির সঙ্গে সন্ধি করাই শ্রেয়।
আমার প্রিয়ের পদাঙ্কানুসরণে চলে যাব,
রাত্রি পার হয়ে যাব, গোধূলি থেকে
উঠে যাব সূর্য্যের আলোকে।

কিন্তু উপর হতে নেমে আসছে উর্দ্ধের বাণী, শুনলে সাবিত্রী

And what shall thy soul say when it wakes
and knows
The work was left undone for which it came?

কিন্তু তোমার অন্তরাত্মা বলবে কি, যখন সে জেগে উঠে দেখবে
কাজটি অসমাপ্ত রয়ে গেছে যার জন্যে
সে এসেছিল এখানে?

"সাবিত্রী খুঁজে-পেতে নাও তোমার অন্তরাত্মাকে তোমার স্বরূপকে। শোন তার বাণী—তুমি কে, কি জন্যে এখানে, সে-রহস্য বুঝে নাও।"

একদিন অশ্বপতির যে সঙ্কটমুহূর্ত্ত এসেছিল, সত্তার চেতনার যে আবর্ত্তন বা পরাবর্ত্তন ঘটেছিল, সাবিত্রীরও জীবনে তার হ'ল পুনরাবৃত্তি। সাবিত্রীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হ'ল ক্রমে সাবিত্রীর কাছে—তাঁর দিব্যস্বরূপ, তার অবতরণ হেতু। ফলতঃ সাবিত্রীর চেতনায় প্রকটিত বা আবির্ভূত হ'ল তার ভাগবতী তনু বা অঙ্গ সব যার কল্যাণ-স্পর্শে এই মাটির জটিল ক্লেদাক্ত সংস্থান পরিবর্ত্তিত হবে, এখানকার সব কুটিল আক্তির পূর্ণ সমাধান হবে।

আপন ভাগবতী সত্তায় সচেতন হয়ে ওঠা, তাতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া তার মানুষী-রূপে—এই হল মৃত্যুর সম্মুখীন হবার তাঁর প্রস্তুতি। মৃত্যুকে জয়—পূর্ণজয়—করতে পারে এক মানুষী ভগবতী [redacted] ভাবে প্রস্তুত হয়ে তবে সাবিত্রীর কর্ম্মপর্ব্ব সুরু। দ্বিতীয় পর্ব্ব হ'ল তাই মৃত্যুজয়-কাহিনী। মৃত্যুদেবতার পায়ে পায়ে চলে সাবিত্রী ক্রমে উদ্‌ঘাটিত করলেন মৃত্যুর রহস্য, মৃত্যুরও স্বরূপ।

প্রথমে মৃত্যুর ঘোর রূপ, তার সর্ব্ব-বিনাশী অসৎ-সত্তা। সেখানে মৃত্যু তার রুদ্রকণ্ঠে ঘোষণা করছে সাবিত্রীকে ডেকে—

This is my silent dark immensity,
This is the home of everlasting Night,
This is the secrecy of Nothingness
Entombing the vanity of life's desires....
Hopest thou still always to last and love ?

এই হল আমার নিঃশব্দ নিরালোক অনন্ত,
এই হল চিরন্তন রজনীর আপন ধাম,
এই হল নাস্তির গুপ্ত গহন...
তার গর্ভে সমাহিত হয়েছে জীবনের মিথ্যা বাসনার স্তূপ।...
তুমি আশা কর এখনও বর্ত্তে থাকবে
তোমার ভালবাসা নিয়ে ?

ফলতঃ মৃত্যু কেবল দেহের নাশ নয়; মৃত্যু হল আসনে নেতি, অসৎ। সৎ, অস্তি, আছে, যে-মুহূর্ত্তে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করলে, জানালে আপনাকে, সেই মুহূর্ত্তে এসে উপস্থিত তার বিপরীত—অসৎ, নাস্তি, নাই। তুমি বলছ 'হাঁ', তবে এই দেখ 'না'; এই যে নেতি-শক্তি তা সৃষ্টির প্রকাশে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে অণুতে অণুতে

আপনাকে মড়িয়ে রেখেছে, সৃষ্টি চলেছে যে লক্ষ্যে যে উদ্দেশ্যে যে সার্থকতার দিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বাধা হয়ে ব্যর্থতা হয়ে। কিন্তু সাবিত্রী দেখলেন এ বাধা পরিণামে হ'ল সহায় ভাগবত-কর্মকে পূর্ণ করবার জন্যে।* মৃত্যুও আনন্দেরই শক্তি, যদিও বাহ্যত সে নিরানন্দ ও করুণ বিষণ্ণতা। মৃত্যুর শেষ আহ্বান সাবিত্রীকে নিয়ে যেতে তার পরম প্রশান্ত নির্বাণে—এ হল মৃত্যুর অন্তিম আশা, মহাজ্ঞানের আকূতি—

O human claimant to immortality,
Reveal thy power, lay bare thy spirit's force,
Then will I give back to thee Satyavan.
Or if the Mighty Mother is with thee
Show me her face that I may worship her;
Let deathless eyes look into the eyes of Death.

হে মর্ত্যমানুষ, অমৃতত্বের দাবী কর তুমি!
ব্যক্ত কর তবে শক্তি তোমার, তোমার অন্তরাত্মার
সামর্থ্য খুলে ধর,
তবে আমি তোমার সত্যবানকে তোমায় ফিরিয়ে দেব।
আর যদি বিশ্বজননী সত্যসত্যই তোমার সঙ্গে রয়ে থাকেন,
তবে দেখাও আমায় তাঁর মুখখানি,
পূজা করব আমি তাঁকে;
মৃত্যুহীন নয়ন তবে দৃষ্টি রাখে যেন মৃত্যুর নয়নে।

মৃত্যুর প্রার্থনা পূর্ণ হ'ল—সাবিত্রী সম্মুখে, কিন্তু এ ত সাবিত্রী নয়, কার কণ্ঠ এ?

I hail thee, almighty and victorious Death,
Thou grandiose Darkness of the Infinite....
I have given thee thy aweful shape of dread
And thy sharp sword of terror and grief and pain
To force the soul of man to struggle for light.

* আমরা স্মরণ করতে পারি কবি গ্যেটের কথা—ভগবান শয়তানকে (মেফিস্টোফেলিস) বলছেন তোমাকে আমি মানুষের সঙ্গী করে দিলাম—যখনই মানুষ ঘুমিয়ে ঝিমিয়ে পড়বে তাকে অঙ্কুশাঘাতে জাগিয়ে তুলবে, তাড়িয়ে নেবে...

স্বাগত করি তোমায়, হে মৃত্যু সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজয়ী,
অনন্তের বিপুল ঘোর ছায়া তুমি...
তোমাকে আমি দিয়েছি তোমার বিকট ভীষণ মূর্ত্তি ;
দিয়েছি তোমাকে তোমার ভীতির শোকের বেদনায়
শাণিত তরবারী
মানুষ যাতে বাধা হয় আলোর জন্যে যুদ্ধে নেমে যেতে।

তারপর ঘটল এক অদ্ভুত অপরূপ ঘটনা। চারিদিকে আলো জ্বলে উঠল, লেলিহান বহ্নি যেন আর তার মধ্যে মৃত্যুর মলিন ছায়া পুড়ে, ছাই নয়, আলো হয়ে গেল—

His body was eaten by light, his spirit devoured.
দেহ তার আলোর গ্রাস করেছে
আত্মসাৎ করে ফেলেছে।

মৃত্যুরও মৃত্যু ঘটল এইভাবে—মৃত্যু নয় হ'ল তার নবরূপায়ন, ফিরে গেল তার ভাগবতী মুক্তিরূপে

A secret splendour rose revealed to sight
Where once the vast embodied Void had stood.
Night the dim mask had grown a wonderful face.
দৃষ্টির সম্মুখে ব্যক্ত হ'ল গুপ্ত মহিমা এক,
সেখানে বিপুল মূর্ত্ত শূন্য দাঁড়িয়েছিল :
ছায়াচ্ছন্ন রাত্রির মুখোসটি হয়ে উঠল পরমসুন্দর
মুখ একখানি।

সেই আলোর রাজ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখন সাবিত্রী এবং নবজীবন-প্রাপ্ত সত্যবান।

(৩)

সাবিত্রী এখন উত্তীর্ণ হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় জ্যোতির আনন্দের লোকে। ভগবানের বাণী বলল সাবিত্রীকে আবার—

"এই যে এসেছ তোমরা অমরলোকে ছায়াহীন আলোর জগতে পরম সার্থকতার মধ্যে, তোমাদের দুজনের সম্মিলিত জীবন এখানে কাটাতে পার যতদিন না তোমাদের আবার প্রয়োজন হয় পৃথিবীর উপর।"

কিন্তু সাবিত্রী দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন—

I climb not to thy everlasting Day,
Even as I have shunned thy eternal Night....
Earth is the chosen place of mightiest souls;
Earth is the heoric spirit's battlefield....
Thy servitudes on earth are greater, king,
Than all the glorious liberties of heaven.

—তোমার চিরন্তন দিবসের মধ্যে আমি উঠে যেতে চাই না,
চিরন্তন রাত্রিও যেমনি আমি পরিহার করে এসেছি...
পৃথিবী হ'ল পরাক্রমী জীবাত্মার আপন নিবাস,
পৃথিবী হল বীর হৃদয়ের রণক্ষেত্র...
হে রাজন্, পৃথিবীর উপর তোমার দাসত্ব
স্বর্গের যাবতীয় বহিনানয় স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা গরীয়ান।

একদিন অশ্বপতির সম্মুখে যে সমস্যা দাঁড়িয়েছিল আজ সাবিত্রীরও সম্মুখে আবার সেই সমস্যা—তাঁর নিজেরও পূর্বে অপরিণত অর্থাৎ নামুষী অবস্থায় এসেছিল যে-পুলোতন তারই নবরূপায়ণ—অশ্বপতিকে ছেড়ে আসতে হয়েছিল অক্ষয় আলোক, এ পৃথিবীর আলোক লাভ করবার জন্যে, সাবিত্রীও বরণ করলেন এই পৃথিবীরই আলোক।

উপনিষদের ঋষি একদিন বলেছিলেন—যারা কেবল অবিদ্যার পূজা করে, তারা অন্ধকারে ডুবে যায়, আর যারা কেবল বিদ্যার উপাসক তারা প্রবেশ করে আরও গাঢ়তর অন্ধকারে। এই যে চিরন্তন আলোর জগৎ, সাবিত্রী যাকে বলছেন 'everlasting day' 'চিরন্তন-দিবস' তাকেই উপনিষদের ঋষি দেখেছেন সোনার আবরণ, হিরন্ময় পাত্ররূপে সূর্য্যের মুখে। পূর্ণ অখণ্ড সত্যকে লাভ করতে হ'লে, পরে এই হিরন্ময় আবরণকেও সরিয়ে দিতে হবে অন্ধকারেরই মত।

উত্তরজ্যোতি আঁধার-বিবর্জিত বটে কিন্তু তা অপরিবর্ত্তনীয় একান্ত শ্বেত-শুভ্র। কিন্তু পৃথিবীর আকাশে বাতাসে প্রকটিত হবে যে উত্তর জ্যোতি তা সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু। পৃথিবীকে মাটিকে বলা হয়েছে সর্ব্ব-গুণান্বিত। যে পৃথিবী আপাত দৃষ্টিতে আঁধারদুষ্ট তার সিদ্ধরূপ হ'ল পূর্ণজ্যোতির বর্ণালী। তাই সাবিত্রী পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে বলছেন, যেন সান্ত্বনা দিয়ে সত্যবানকে—

Heaven's touch fulfils but cancels not our earth....
Still am I she who came to thee mid the murmur

Of sunlit leaves upon this forest verge...
All that I was before, I am to thee still.

স্বর্গের স্পর্শ আমাদের এই পৃথিবীকে
পরিপূরণ করে, পরিহার করে না...
আমি ত' এখনও সেই নারী তোমার কাছে একদিন
এসেছিল যে বনের ধারে,
রৌদ্রদীপ্ত পত্রপল্লবের মর্মর মাঝে...
আমি যা কিছু ছিলাম, তোমার কাছে, এখনও আমি সেই
সবই রয়েছি।

সত্যবানেরও অভিভূত হৃদয়ে প্রতিধ্বনিস্বরূপ জাগল যেন বিশ্বজগতের এই মর্মবাণী :

If this is she of whom the world has heard,
Wonder no more at any happy change.

এ যদি হয় সেই নারী যার কথা সারা জগৎ
শুনে এসেছে—
তবে সবরকম শুভপরিবর্তনই যে ঘটতে পারে
তা আর বিস্ময়ের কি !

সাবিত্রী

(অনুবাদ)

একাদশ পর্ব্ব—প্রথম সর্গ

(৪)

[সাবিত্রী এসেছে, চলেছে পরিপূর্ণতার লোকে, আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা—পূর্ণ সত্য, পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ একত্ব—যাবতীয় ঐশ্বর্য্য পুঞ্জীভূত সেই প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু এ হ'ল ঐশ্বর্য্য—এখন ঐশ্বর্য্য পার হয়ে সাবিত্রী উপস্থিত ঈশ্বরের সম্মুখে; সকল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি যিনি পরমপুরুষের সম্মুখে। সৃষ্টির অধিকর্ত্তা যে স্রষ্টা তাঁর স্বরূপ কি, স্বভাব কি তার বিবরণ দেখব আমরা এবার।

ত্রিমূর্ত্তি তিনি—নাম হ'ল বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, প্রাজ্ঞ। বিরাট হ'লেন স্থূলে মূর্ত্ত ব্যক্ত রূপ, হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্মের যাবতীয় সম্ভাবনার ধারা, আর প্রাজ্ঞ সৃষ্টির মূলতত্ত্ব বা আদি ভাবসমষ্টি—বীজ, অঙ্কুর, যাহা অবয়ব এই তিনরূপ নিয়ে ভগবানের পূর্ণ স্বরূপ।]

ঔজ্জ্বল্যের আনন্দের সাগরে যেন ডুবে গেল সে;
বাক্‌হারা এই যত অপরূপ লোকাবলির গোলক-বাঁধায়
ফিরে তাকাল সে, দেখল তাদের সকলের জীবন্ত গ্রন্থি আর উৎস,
তাদের মোহিনী শক্তির হেতু, তাদের হর্ষের গন্ধোত্রী;
চিনল তাকে, এ সেই পুরুষ আমাদের জীবনকে প্রলুব্ধ করে আনে,
বাঁধে তার করাল নির্ম্মম জাল-পাশে;
বিশ্ব হ'ল তার কারাগৃহের ব্যাধশ্রেণী,
আপন বিপুল শূন্য সব প্রসারে
ব্যর্থ পরিক্রমায় নিযুক্ত করেছে সে শ্রমক্লান্ত নক্ষত্রকুল,
মৃত্যুকে স্থাপন করেছে মানবী যাত্রার শেষ পরিণামে,
দুঃখ ও বেদনা হয়েছে মানবী প্রয়াসের পুরস্কার।
একদিন তার অন্তরাত্মা যাকে দেখেছিল
মৃত্যুরূপে রাত্রিরূপে,
সে হয়েছে এখন সকল মাধুর্য্যের সম্মেলন
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে;

সকল সূর্য্যের সৌন্দর্য্য আবৃত করে রেখেছিল সে
তার হৃদয়ের কাছ থেকে ;
অতিকায় কলেবর তার রূপান্তরিত এখন,
ঘোর কালিমা তার, তার করুণ করালী শক্তি
চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করেছে,
উদ্‌ঘাটিত করেছে তবু
তার সমুচ্চ ঘোর কর্ম্মবিধির রহস্য।
দৃষ্টির সম্মুখে তার ব্যক্ত হ'ল গুপ্ত এক মহিমা,
যেখানে ছিল সমাসীন বিপুল প্রমূর্ত্ত শূন্য ;
রজনীর ছায়াময় মুখোস তার হয়ে উঠেছে
পরমসুন্দর মুখমণ্ডল।
কুহেলিময় অসীমতা নিহত এখন,
কালো ছায়া তার কোন ভীতিকর অজ্ঞেয় হতে
নেমে এসেছিল, ধরেছিল এক সংহারী তমোদেবতার আকার।
ভ্রান্তি অপগত, দুঃখের হাতে অস্ত্র তুলে দেয় যে ;
অজ্ঞান-গহ্বর আলোকিত এখন, রিক্ত অতল যার
দিয়েছিল শূন্যতার কণ্ঠে ভীতিকর আরাব।
নিদ্রাশেষে সদ্যজাগরিত অর্দ্ধনিমীলিত নয়নসম্মুখে
কৃষ্ণপ্রচ্ছদমণ্ডিত গ্রন্থের উন্মুক্ত পৃষ্ঠা হতে
স্ফুটতর উঠে আসে যেন প্রোজ্জ্বল লেখাগুলি,
বিচ্ছুরিত করে দেয় অন্তর্নিহিত চিন্তার হিরণ্ময়-দ্যুতি,
তেমনি সাবিত্রীর দৃষ্টিতে দৃষ্টি রেখে দাঁড়াল অপরূপ রূপ এক।
তার মাধুর্য্যে সার্থক জীবনের তীব্রতম বেদনা যত,
প্রকৃতির সকল কষ্ট-প্রয়াস অতি সামান্য মূল্য তার জন্য,
বিশ্বের নিখিল বেদনা স্বাগত, এই যদি শেষ ফল ;
এ যেন নভচর ফুলের হৃদময় গর্ভকোষ,
সুরতরঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে
অথবা লঘুতার পল্লবশোভিত কমল এক
রূপগ্রহণ করেছে নিখিলের নিহরিত হৃৎপিণ্ড হতে।
আস্তি নাই কোথাও নক্ষত্ররাজির দৃষ্টিতলে,
প্রকৃতির মুখোস প'রে পিছনে পাপ আর আশ্রয় গ্রহণ করেনি,

ঘৃণার ছায়াচ্ছন্ন ছল কোথাও নাই আর,
নাই নিষ্ঠুর ভ্রূকুটি প্রেমের বিকৃত মুখমণ্ডলে।
ঘৃণা তা হ'ল উৎকট প্রেমদ্বন্দ্বের নিবিড় আশ্লেষ,
নির্মম এক লিপ্সা, এখানে একান্ত অধিকার-লোভে
মধুময় আদিদেবতার স্থান গ্রহণ করেছে।
ভুলে গেছে সে তাকে জন্ম দিয়েছে যে প্রেমের প্রবেগ,
সে চায় নিজেকে নিজের মধ্যে ধরে রেখে তবে মিলিত হতে,
সে চায় গ্রাস করতে আপন অনন্য সত্তার মধ্যে,
চায় জঠরগত করতে সে জীবকে যাকে সে আপনার করেছে ;
যেখানেই মিলনের অনিচ্ছা সেখানেই উদ্যত দণ্ড সে,
যেখানেই প্রত্যাখ্যান যত জগতের, সেখানেই প্রজ্বলিত
ক্রোধবহ্নি তার,
গ্রহণের জন্য ব্যাকুল কিন্তু জানে না দান করতে।
মৃত্যুর কৃষ্ণ আবরণ এখন তবে প্রকৃতির মুখ হতে
অপসৃত হল,
তার উপর আলো ছড়িয়ে, নেমে এল যেন
দেবতার প্রচ্ছন্ন প্রেম।
বিশ্বের শ্রী, বিশ্বের মহিমা, বিশ্বের দেবত্ব
সব যেন এখানে সংগৃহীত একই কলেবরে ;
একই আনন যুগল নয়নের, তারই ভিতর দিয়ে
চেয়ে দেখে বিশ্বপূজা আঁখি যত।
একই দেব তার বিপুল কলেবরে ধারণ করে বিশ্বের দেবতাকুল।
অন্তরে তার বিরাজিত সাগরোপম চিন্ময় পুরুষ।
অপরাজেয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী তার আনন্দ :
মুক্তির, তুরীয় তৃপ্তির প্লাবন
তুলে দেয় অমর রূপরেখার তরঙ্গ-ভঙ্গ।
তাকেই আশ্রয় করে রাজমুকুটধারী সেই দেব চতুর্মুখ
ধারণ করে যে মহানামের অনাদ্য রহস্য,
বিশ্ব লিখে চলে তার গহন-ব্যঞ্জনা
একটিমাত্র শব্দে ভরে দিয়ে অফুরন্ত অর্থ।
তাকে আশ্রয় করে সৃষ্ট জগতের নির্মাতা স্থপতি,

যুগপৎ যিনি আপন রচনার শিল্প ও শিল্পী,
নিখিল দৃশ্যের দ্রষ্টা আর স্রষ্টা আর আত্মা,
নাম যাঁর বিরাট, সূর্য্যে সূর্য্যে জ্বলে যাঁর শিবির-আগুন,
নক্ষত্র-আকীর্ণ যোগ রাজপাট তাঁর ;
জড়সত্তা তাঁর আত্মপ্রকাশের বাণী,
বস্তুসব বর্ণ-মালা, শক্তিধারা বাক্য তাঁর,
ঘটনাবলী তাঁর জীবনের বহুল বিচিত্র ইতিহাস,
জলধি মৃত্তিকা তাঁর কাদম্বিনীর পৃষ্ঠাবলী,
জড়ক্ষেত্র তাঁর অবলম্বন, তাঁর আধ্যাত্মিক লক্ষণ।
চোখের পাতার নিমেষে তিনি খেলিয়ে তোলেন চিন্তার ঢেউ
রক্তের স্রোতে বহিয়ে দেন আত্মার ধারা,
অণুতে, মাটিতে সুপ্ত তাঁরই মূক ইচ্ছাশক্তি,
ইন্দ্রিয়বিহীন সংকল্পবিহীন তবু কর্ম্মপর সে ইচ্ছাশক্তি ;
রয়েছে বুদ্ধি, তার প্রয়োজন নাই চিন্তার পরিকল্পনার ;
সৃষ্টি নিজেকে সৃষ্টি করে চলে অপ্রতিহত ভাবে—
সৃষ্টির দেহ ভগবানেরই দেহ।
এই পুরুষের হৃদয়ে বিরাজে দেব বিরাট, রাজার রাজা,
তারই মধ্যে আপনার রূপ প্রতিবিম্বিত করেছে হিরণ্ময় কুবের
জন্ম যার সূর্য্যশীর্ষ বৃহতের হিন্দোলায়
নাম তার হিরণ্যগর্ভ, চিন্তার স্বপ্নের স্রষ্টা,
অদৃশ্যের দ্রষ্টা শ্রোতা সে সেই ধ্বনির
মানুষী শ্রবণে কখনও যা পৌঁছে নাই ;
অচিন্ত্য বাস্তবরাজির আবিষ্কর্ত্তা,
অজ্ঞাতপূর্ব্ব সত্যের সত্যে সত্যনিষ্ঠ সে,
অন্তরের যাত্রাপথে নেতা সে,
দ্রষ্টা সে, নিষিদ্ধলোকে প্রবেশ হয়েছে তার,
যাদুকর সে, হাতে তার চিন্তার সর্ব্বশক্তিমান মায়াযষ্টি,
গড়ে তোলে গোপন অদৃষ্ট জগৎ সব ;
কণ্ঠে তার হিরণ্ময় বাণী, নয়নে দীপক-দৃষ্টি,
দিব্যদর্শন তার, তারই ভবিতব্য-বাণী ;
রূপকার সে অরূপে দিয়েছে রূপ,

অদৃশ্য পথ কেটে কেটে যাত্রী সে চলেছে এগিয়ে,
অগ্নিকে সে বহন করে সংগোপনে,
বাক্যাতীতের কণ্ঠ সে
জ্যোতির নেপথ্য শিকারী,
দেবদূত সে রহস্য-আনন্দের বাহক
বিজয়ী অন্তরাত্মার যত রাজ্যের।
তৃতীয় আর এক সত্তা পশ্চাতে দাঁড়িয়ে
নিভৃত কারণ এদের,
পরাচেতনার পুত্র সে
ঘিরে রেখেছে আপনারে আলোকের মাঝে ;
সর্ব্বজ্ঞানময় তারি সৃষ্টি নিখিলের স্রষ্টা,
বিশ্বনিঃসৃত তারি প্রশান্তি হতে
ক্রমবর্দ্ধমান মহীরুহ যেন।
আমাদের বীজ সে, সেই আমাদের অন্তঃসার,
প্রতিষ্ঠা আমাদের, আমাদের মূর্দ্ধা।
সব আলো তার নিমীলিত নয়নের বিলসন।
সর্ব্বজ্ঞানী সত্তা এক তার হৃদয়ে নিহিত রহস্য,
সর্ব্বচেতন রশ্মি বদ্ধ রয়েছে নয়ন-পল্লবের অন্তরালে
জ্ঞান সে, চিন্তায় যা ধরা যায় না,
বাক্‌হীন নীরবতা তার বয়ে আনে অমর বাক্য ;
পরমাণু মাঝে জ্বলন্ত-তারকা বুকে সুপ্ত সে,
সুপ্ত সে মানুষে আর দেবতায়, প্রাণী আর পাথরে ;
রয়েছে সে, তাই কর্ম্ম করে অচেতনা,
রয়েছে সে, তাই জগৎ ভুলে যায় মৃত্যুকে ;
ভগবান বৃত্ত যদি, কেন্দ্র সে তার ;
পরিধি সে, প্রকৃতির গতি তারে অনুসরে ;
সৃষ্টি তার সর্ব্বশক্তিমত্তা নিখিলের অন্তরে
জাগ্রত যখন পুরুষ চিরন্তন সে, সর্ব্বেশ্বর সে।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ*

সুধা বসু

(৯)

কর্মযোগের সাধনায় কর্মে আত্মসমর্পণের প্রসঙ্গে প্রথমেই একত্বের অনুভবের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সেই একত্বের বোধ যাতে তিনি বা এক চৈতন্য যে জগৎ ছেয়ে ও তাকে ছাপিয়ে আছেন সেই বোধে যুক্ত থেকে সবার সঙ্গে এক হওয়া, এই হল দিব্যকর্মযোগের প্রথম লক্ষণ। আর তাতে স্থিত থেকে সমত্ব রাখা হল একত্বে প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এই সর্বব্যাপী একত্বের বোধে সমত্ব রেখে নিষ্কাম কর্ম করার মূল কথা হল, আসক্তি ত্যাগ করা—"যোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।" সেটা যত সহজে হয় না। আসক্তি না থাকলে যেন কর্মের প্রেরণাই থাকে না, এমনও মনে হতে পারে। অনেক সময় সবার সঙ্গে যুক্ত থেকে কর্ম করার ফলে সে-কর্মের যে-প্রভাব আমাদের প্রত্যেকের উপরে পড়ে, তাতে বিক্ষোভ উপস্থিত হতে পারে। তার মধ্যে সমত্ব রেখে জয়-পরাজয় সুখ-দুঃখ সব-কিছুতে অবিচলিত থেকে কর্ম চালিয়ে গেলেও নিজের বিক্ষোভ থেকে নিজের কাছ থেকে যেন মুক্তি পাওয়া যায় না। তাতে নিজেকে শান্ত রেখে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু চঞ্চল হলে, অস্থির হলে চলবে না। তাই বলা হয়েছে কর্ম করবে কিন্তু ফলের কথা ভাববে না। এ থেকেই আসক্তির কথা আসে। অনেক সময় বাধ্য হয়ে বা চাপে পড়ে কর্মফলের আশা ত্যাগ করলে সেটা যোগের পর্যায়ে পড়ে না। "অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে—অযোগী ফলে আসক্ত হয়ে বাসনার ক্রিয়ার দ্বারা বদ্ধ হয়।" কাজেই কর্মফলে সচেতন থাকতে হবে, অন্ধের মত চললে হবে না। উদ্দেশ্য বা কর্মফল আমার কাছে বেশ স্পষ্ট তবুও সেটা আমার ছক অনুযায়ী না হলে বিচলিত হওয়া কিছুতেই চলবে না। এই দিক যদি জীবনে সিদ্ধ করতে চাই, তাহলে তাঁরই হাতে ফলাফলের দায়িত্ব দিয়ে সচেতন আনন্দে কর্ম করতে থাকলে যজ্ঞবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। গীতায় শ্রীভগবান যেমন বলেছেন "যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ"। যজ্ঞবুদ্ধিতে কর্ম না করলে লোক কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয়। এই নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের বিস্তৃত আলোচনা আছে। যজ্ঞের মূল কথাই হল

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

ত্যাগ। যেমন বলা হয়েছে সমস্ত জীবনই যোগ—All life is yoga, ঠিক তেমন ভাবেই বলতে হয় সমস্ত জীবনই যজ্ঞ All life is sacrifice। এখন আমাদের বুঝতে হবে এই যজ্ঞ বা ত্যাগ কি? কাকে উদ্দেশ্য করে ত্যাগ করব, কিভাবে করব এবং যজ্ঞফলই বা কি, এ সবই ভাল করে জেনে নিতে হবে।

যজ্ঞ একটি সুপ্রাচীন অনুষ্ঠান। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে যজ্ঞের বিবর্তন নানা আকারে সব কর্মেই অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। সহজভাবে হিন্দুধর্মে আজও এই ধর্মানুষ্ঠানের প্রবলতা লক্ষ্য করা যায়। অন্য ধর্মে ক্ষীণ হতে হতে এ সব ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান প্রায় লুপ্ত বললেই হয়। Catholicদের ধর্মে কিছুটা অনুষ্ঠান আছে যাতে যজ্ঞভাবনার প্রভাব দেখা যায়। ভারতবর্ষে যজ্ঞের অনুষ্ঠান যে কি প্রবল হয়ে জটিল আকার ধারণ করেছিল, তা বোধকরি সর্বজনবিদিত। গীতায় তাকেই বলা হয়েছে "ক্রিয়াবিশেষবহুল"। যজ্ঞানুষ্ঠানের মূল কথাই হল দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ, মীমাংসকের এই মত। গীতা বলেন, দ্রব্যযজ্ঞে দেবার বস্তু সাধারণত খাদ্যাদি উপচার। কিন্তু যজমানকে যে বলতে হয় "ইদং তব ন মম", এই ভাবই হল যজ্ঞমূল। দেবতাকে নিবেদন করে আত্মাহুতিই হল প্রকৃত কর্ম, আর সব বিকর্ম। বেদের ভাষায় এই কর্মই সুকৃত, কিনা সমর্থ ও সার্থক কর্ম। তখন যজ্ঞ ও কর্ম সনার্থক। এ থেকে পরে ভাল ও মন্দ দু'দিকই এসেছে। যজ্ঞের অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোন কর্মই যেন কর্মযোগে গণ্য হয় না, এমন ধারণাও এসে পড়ে এবং অনুষ্ঠানগুলি হতে থাকে ক্রিয়াবিশেষবহুল। পূজা-অর্চনাই যদি একমাত্র দেবকর্ম হয় তাহলে জীবনে ভাগাভাগি এসে যায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন জীবনের সমস্ত কর্মই যজ্ঞ বা দেবকর্ম হতে পারে। জীবনের দেবতার উদ্দেশ্যে প্রতিটি ক্রিয়া ও কর্মানুষ্ঠান—এই হল ভাবমূল। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় একথা বলেছেন এবং তারও পূর্বে উপনিষদে, ঘোর আঙ্গিরসের মুখে শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশ শুনেই অপিপাস হয়ে গেলেন, এই আখ্যান আমরা শুনেছি। সমস্তজীবনই তাহলে সোমযাগ এবং পুরুষই যজ্ঞ। তাঁর জীবনের পরে পরে অমৃত আনন্দের উচ্ছলন। গীতার অনাসক্ত যোগের মূল ভাব এই আপিপাস হওয়া। আবার জীবনের সব কর্মই যদি দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে আবার বলতে দ্বিতীয় আর কিছু থাকে না। এই ভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করা ও কর্মযোগে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন।

কিন্তু এই শাশ্বত যজ্ঞবিধিই যে জগৎসৃষ্টির মূলে, শ্রীঅরবিন্দ তা ধরিয়ে দিয়েছেন। গীতা থেকেও এই প্রাচীন ভাব ধরে যজ্ঞসহিত প্রজাসৃষ্টির ব্যাখ্যা শ্রীঅরবিন্দ বিশদভাবে করে দিয়েছেন। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে দেবতার আত্মাহুতি বা পুরুষযজ্ঞের কথা পেয়েছি। দেবতার আহুতির নাম হল বিসৃষ্টি। তত্ত্বতে পরমপিতা স্বেচ্ছায়

জীবভাবের মূলে পাশবন্ধন স্বীকার করেছেন, সেটাই পুরুষযজ্ঞ। আবার এই যজ্ঞদ্বারাই পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত সদাশিব হতে পারবেন। মানুষের দিক থেকে যজ্ঞপথে উজানে যাবার নাম হল উৎসর্গ বা অতিসৃষ্টি। দেবতা সৃষ্টিতে নেমে এলেন বিচিত্রভাবে, তাই সেটা হল বিসৃষ্টি। আর মানুষও সেই বিধি অনুসরণ করে নিজেকে ঢেলে দেয়, উৎসর্গ করে। তাঁকে দিতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়তে হবে। দেবতাই মানুষের আধারে পূর্ণভাবে বিকশিত হবেন বা যজ্ঞদ্বারা যজমান হিরণ্যশরীর লাভ করে দেবতা হবে, তাই মানুষের যজ্ঞ হবে অতিসৃষ্টি। মানুষের এই সম্পূর্ণরূপে নিজেকে উৎসর্গ করাই হল যজ্ঞ বা ত্যাগ। এই যজ্ঞকর্ম শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে অভিসন্ধিশূন্য হবে। কোনও মতলব বা ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকলে চলবে না।

প্রাচীনেরা এই যজ্ঞানুষ্ঠানকে তিন রকমে ভাগ করে দেখিয়েছেন, নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য। কাম্য অর্থাৎ কোন কামনায় যজ্ঞ করলে অবশ্য নানা প্রকার আছে। কাম্য কর্ম প্রাচীন কালেও নিন্দিত ছিল। আবার বৃহত্তর মানবসমাজ থেকে তাকে বাদ দেওয়াও সম্ভব নয়। কৃষ্ণযজুর্বেদ ও শুক্লযজুর্বেদ যথাক্রমে কাম্যকর্ম ও নিষ্কামকর্মের নির্দেশ দেন। নিত্যকর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে করতে চিত্তশুদ্ধির ফলে যজমান নিষ্কাম কর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেন। তাই নিত্যযজ্ঞ এক অবশ্য কর্ম। প্রাচীনকালে অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান এক নিত্য কর্তব্য কর্ম ছিল। অগ্নিদেবতাকে রক্ষা করে, তাতে প্রতিদিন আহুতি দিয়ে বলা হত "ইদং তব ন মম।" আহুতিটি হবে নিষ্ক্রয় (ransom), আত্মাহুতির প্রতিনিধিস্বরূপ। গীতাতেও এইরকম দ্রব্যযজ্ঞ তপোযজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ এ তিনটি যে ওতপ্রোত তা দেখানো হয়েছে। আবার ভক্তের লক্ষণ দেখিয়েও গীতা বলেছেন আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী, এই চার রকম সাধক আছে। এর মধ্যে আর্ত ও অর্থার্থী দেবতাকে দেয় কিন্তু প্রতিদানে কিছু চায়। এ ভাবেও চিত্ত পরমতার দিকে এগিয়ে যায় ও ক্রমশ চিত্ত শুদ্ধ হয়, এই লাভ। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে যজ্ঞ করাই শ্রেয়। নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান ঠিকমত হলে ভক্তও জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর পদবীতে আরূঢ় হয়ে অহৈতুকী ভক্তির অধিকারী হন। শেষ পর্যন্ত যজ্ঞের অর্থই হল আত্মদান—কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন (self-surrender)। সম্পূর্ণ করে নিজেকে দিতে পারলে তবেই সেই শূন্য স্থান পূর্ণ হয় দেবতার দানে। চিত্ত ভরে ওঠে প্রসাদে।

শ্রীঅরবিন্দ এই আত্মনিবেদন ও পরম প্রাপ্তির প্রসাদ যে অন্যোন্য সম্বন্ধযুক্ত, সেটি ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। গীতাতেও তার আভাস আছে। দেবতাকে ঠিক ঠিক দেওয়া হলে তাঁর প্রসাদ নেমে আসেই, এ-বিধি শাশ্বত ও সুনিশ্চিত। প্রেমাশ্রিত কর্মে আত্মনিগ্রহ (self-immolation) বড় কথা নয়। যদিও প্রকৃতিতে বিকৃতি থাকলে

কিছুটা প্রয়োজনবত নিগ্রহ করতেও হয়। কিন্তু ভগবান নেমে আসেন এখানে, মানুষের মধ্যে। মানুষ প্রেমের অধিকারে এই ক্ষুদ্র অহং-এর বেদিতেই অনন্তের সিংহাসন গড়ে তুলতে পারে। জ্ঞানে ও ভক্তিতে রসোজ্জ্বল যে-কর্ম, তাতে আত্মনিবেদন করলে নিগ্রহ কোথায়? কোন প্রত্যাশা তাঁর কাছে নিয়ে যাসিনি, কিন্তু তাঁর দান দুহাত ভরে গ্রহণ করব, শ্রদ্ধাবনত হৃদয়টি মেলে দিয়ে তাঁকে নিয়ে জীবন ভরে তুলব। দেবতাই যে এই আধারে দিব্যসংকল্প মূর্ত করে চলেছেন, প্রেমময় কর্মের ভিতর দিয়ে। তাই তো চরম দেওয়া বা ত্যাগ আর পরম পাওয়া একই কথা। তাঁকে পাওয়ার কথায় ভালবাসার কথা আসে। ভক্তিসিদ্ধান্তে বৈষ্ণবদের রতি সম্বন্ধে সাধারণী সমঞ্জসা ও সমর্থা এই তিন নামে ভক্তের অধিকার-ভেদ দেখানো হয়েছে। সাধারণী বলে, আমি তোমাকে আমার জন্য ভালবাসি, তুমি চাও কিনা জানি না, বুঝিও না। সমঞ্জসা রতি দিতে চায় ঠিকই, আবার তাঁর ভালবাসা পাওয়ার বোধটিও তার ঠিক থাকে। তাই বিশুদ্ধ এক লীলারসের সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে তার গড়ে ওঠে। আর সমর্থা রতিতে সব দেওয়ার অর্থ হল রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় "বেশি কেটে জলে যাওয়া।" সকলে এর অধিকার পায় না এটাও যেমন ঠিক, আবার এমন সময়ও আসে যখন তা না করে উপায় থাকে না। কিন্তু নচিকেতা ও সাবিত্রীতে আমরা যেমন দেখেছি, ফিরে আসার পথটিও যেন ঠিক থাকে। সেজন্য সমঞ্জসা রতির ভাবই জীবনে সমতা রক্ষার ও যোগকর্মের সহায়ক বেশী, এই ভাবের ওপর শ্রীঅরবিন্দ জোর দিয়েছেন। ধ্রুব জানি, তিনি ডেকেছেন বলেই আমার এই আকুলতা ও তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা। তাঁর প্রেমের কাছে উজাড় করে দিতে চাই আমাকে ও আমার বলতে যা-কিছু আছে। তাতে তাঁকে পাবই আর আবার সব পাওয়াও যে তাতে। এই দেওয়া ও পাওয়া যে শাশ্বত বিধান, এ বোধ স্পষ্ট থাকে। এই যে ভালবাসা ও আত্মত্যাগ, এটাই যজ্ঞ। এতে বৃহতের ধারণা, ঈশ্বরবোধ এসব সহজেই আসে। যদি মনে করতে পারি সমস্তই তিনি, তখন আত্মীয়স্বজন, প্রিয় পরিজন সমস্তের মধ্যেই তাঁর প্রকাশ ও বিকাশ দেখতে পাব। তখন সবই তিনি—এই বোধে তাদের সেবা করলে সেই সেবাকর্ম যজ্ঞকর্ম হবে, ত্যাগে মধুর হবে। সন্তানের মধ্যে গৌরী ও গোপালবোধ এবং স্ত্রীকে মহাশক্তিরূপিণী দেখতে পারলে, সংসার প্রতিপালনের প্রতিটি কর্মই ত্যাগের ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে দিব্য হয়ে উঠতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ এই শাশ্বত দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কটি সহজ জীবনের ছকে দেখিয়ে আবার তা থেকে যজ্ঞভাবনা নিয়ে উজানে যাওয়ার পথটিও দেখিয়েছেন। মানুষের সমাজে ও সংসারে এই দেওয়া-নেওয়ার ধারা প্রথমদিকে একেবারে জৈব নিম্নপ্রাণমনের স্তরে থাকে। সেখানে পারস্পরিক সম্পর্কে প্রয়োজন সিদ্ধির ভাবটাই প্রধান। দ্বিতীয়

স্তরে অর্থাৎ ভালবাসার বোধ জাগলে, মনে আদর্শবোধ জাগে। এটা উচ্চস্তরের প্রাণ ও মনের ক্রিয়া। ধর্মসংসার কল্পনা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস তখনই দেখা দেয়। হরগৌরীর লীলাবিলাস ভাবনা ধর্মসংসারের মূলে, কিন্তু সেখানেও ভগবানের প্রকৃত রূপটি সহজে ধরা পড়ে না। আরোপের ভাব নিয়েই আরম্ভ করতে হয়। সেজন্য এর চেয়েও উত্তম বা শ্রেষ্ঠ ভাব হল তাঁকে পেয়ে, 'বেদান্তজ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসার করা।' তখন সব থাকলেও তিনি, আবার সব ছাড়লেও তিনি। ত্যাগের ঐশ্বর্যরূপে সংসারে ভোগ করা তখনই সম্ভব। গার্হস্থ্য জীবনে যজ্ঞের এই পরম ভাব প্রকটিত দেখতে পাই যাজ্ঞবল্ক্যের বেলায়। তিনি মৈত্রেয়ীকে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে বুঝিয়েছিলেন যে, স্বামী স্ত্রী পুত্র বিত্ত ইত্যাদির সম্পর্ক জীবনে যা জুড়ে রয়েছে তা সবই প্রিয় আত্মার জন্য। তাই ভালবাসার জন্য সব দেওয়া যায় ও যা-কিছু করা যায়, সে সবই উৎসর্গ। সংসারে এই ঘন প্রেমের যজ্ঞ। পরে যাজ্ঞবল্ক্যের বাণী আরও গভীর সুরে ধ্বনিত হল। তিনি আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করলেন, বলেছিলেন "তুমি ও আমি লবণকের এক বিন্দু দানার মত এবং তাই (স্ত্রী) দিয়েই আমার আকাশ পরিপূর্ণ।" অদ্বৈতজ্ঞান আমরা এইভাবে বুঝবার চেষ্টা করতে পারি। গার্হস্থ্য জীবনকেও এই সকলভাবে পূর্ণ করতে পারি।

তাহলে দেখতে পাই যজ্ঞে দেওয়ার মধ্যে নিগ্রহের কথা ওঠে না। যজ্ঞ, দান ও তপঃ গীতায় বলা হয়েছে, এ তিনটি একই সঙ্গে আসে। এই তপস্যাই হল যোগের সংযম। জোর করে চাপিয়ে দিলে সেটা হয় পীড়ন। কিন্তু শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে ভালবাসার সঙ্গে দেওয়া মানুষের কর্ম, পশুর নয়। উপবাস সংযম ইত্যাদি অনেক সময় নিগ্রহের আকার ধারণ করলেও মূলে এটি আত্মশুদ্ধি বা সংযমের তপস্যা। মানুষের আধারে সাধারণত অনেক অশুদ্ধি থাকে। রজোগুণ ও তমোগুণ বিক্ষেপ ও আবরণ দিয়ে সত্ত্বগুণকে (বুদ্ধি) বিভ্রান্ত করে। কিন্তু একাগ্র ও সংযত হয়ে প্রকৃতিতে গুণসাম্য ঘটাতে পারলে প্রচণ্ড তাপ বা শক্তি সঞ্চারিত হয়। নিঃসঙ্গ হয়ে এই আত্মসংযমের তপস্যাই যোগীর আত্মকর্ম, বিক্ষিপ্ত চিত্ত-বৃত্তিসমূহ একাগ্র ও সংযত হয়ে প্রচণ্ড তপঃশক্তিতে পরিণত হয়, সে-শক্তি অপরাজিতা। সেজন্য এই আত্মকর্মই হল শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্ম।

নিগ্রহ ও সংযমে যেন আমরা গোলমাল করে ভুল না করি। একাগ্রতা না থাকলে মানুষের জীবনে কোন কর্মই সিদ্ধ হয় না। Repression বা আত্মপীড়নের ফলে, অবচেতনের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় যথেচ্ছাচার ও অনিয়ন্ত্রিত সম্ভোগের ইউরোপীয় মতবাদ, আধুনিক যুগে আমাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করেছে। সেটা ধ্বংসের পথ, জাতির অবক্ষয়ের সূচনা। বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিসমূহ একাগ্র করলে আত্মসংযমের প্রচণ্ড শক্তি

উৎসারিত হয়। এই হল যোগের পথ। সেজন্য তপ যোগের উপায়, সেটা নিগ্রহ নয়। আতস কাঁচের ওপর সূর্যকিরণ সংহত হয়ে যেমন প্রচণ্ড তেজে আলোক সঞ্চার করে, ঠিক তেমনি শ্রদ্ধা সহকারে একাগ্রভাবে সংযমের শক্তিতে সিদ্ধ হলে যজ্ঞে আত্মাহুতিও তখন সম্ভব হয়। যোগীকে এই একাগ্রতাই নির্জনে অভ্যাস করতে হয়।

এর পরে আসে দানের কথা। সর্বভূতে যা আছে, তাই আবার তাঁকে দিতে হয়। এটা লৌকিক বুদ্ধিতে করলে হয় দান, যার তাঁরই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হলে হয় যজ্ঞ। সবার মধ্যেই তুমি আছ, তোমাকেই দিচ্ছি। আবার আমার জন্যও যে আমি গ্রহণ করি, তাও তোমারই জন্য। তাই তোমারই জন্য আমার আত্মপ্রসাধন, তোমারই জন্য আমার আত্মসংযম। প্রাচীন কালে গৃহস্থদের পঞ্চাগ্নি বা পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য ছিল। এগুলি আত্মশুদ্ধির উপায় তাই কোন না কোন ভাবে করতেই হবে। লৌকিক ভাবের স্তরে দানই যজ্ঞরূপে আরম্ভ হয়, কিন্তু নিয়ে চলে লোকোত্তর ভাবে। সকাম কর্ম থেকে নিষ্কাম কর্ম বা কর্তব্য কর্মের এই যে নির্দেশ, কর্মযোগে যজ্ঞভাবনায় এটি সম্পাদিত করতে একত্ব ও সমত্ব রেখে চলতে হবে।

কিন্তু কর্মের গতি তো গহন, কি করে জানা যাবে কর্তব্য কর্ম কি? জীবনের সাধনে পরম্পরাক্রমে যা আসে তা করে যেতে হয়, তাতে সাধারণ কর্তব্য কর্ম জানা যায়। কর্মে অবিচলিত থাকা আর আঘাতে স্থির ও অটল থাকা, এসব লক্ষণ নিয়ে কর্ম করতে শুরু করলে, কর্ম ঠিকমত করে যেতে দ্বিধা ও সংশয় আসতে পারে। কতকগুলি কর্মকে কর্মযোগের শাস্ত্রবিহিত কর্ম বলেও নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু তাতেও সংশয় উপস্থিত হলে পরে শাস্ত্র ও মহাজনের নির্দেশ নিতে হয়। তাকে বলে কর্মবিচিকিৎসা। এ সবই ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে কর্ম করা। কিন্তু এতো বাহ্য। আসলে মনে মুখে এক হয়ে সব কিছুতে তাঁকে দেখে তাঁরই কর্ম করার কথাই যে শুনেছি, সেই তিনি কে? তিনি আমার ইষ্ট, আমার প্রভু আমার দেবতা। সেই দেবতাকে নাম রূপ দিয়ে স্বীকার করে তাঁর পূজাই আমার সংসারের কর্তব্য কর্ম। তিনি সাক্ষী অন্তর্যামী গৃহদেবতারূপে যেমন আমার অন্তরে-বাহিরে, তেমনই আবার সবাকার অন্তরে-বাহিরে সর্বব্যাপী চৈতন্য তো তিনিই। তাই কালী কৃষ্ণ যে নামরূপই তাঁকে দিই, সে সবই তাঁর ভাবরূপ। আবার ভাবকে ছাপিয়েও তিনি ভাবাতীত নিরঞ্জন, এটা তো কোন সময় ভুললে চলবে না। এটা ভক্তিতে পাওয়ার কথা। বৈদিক যুগেও প্রতি গৃহে অগ্নি জ্বেলে রাখার ব্যবস্থা ছিল। সেই অগ্নি সাক্ষী রেখে প্রতিদিনকার কর্তব্য কর্ম নির্বাহ করার ব্যবস্থা ছিল। আমরা অনেক সময় মনে করি নাম ও রূপের আশ্রয় না পেলে অনন্তকে বুঝি ধারণাই করা যায় না।

সেভাবে মানুষের মধ্যে ভক্তি প্রথম স্ফুরিত হয় বটে, তা থেকে আমার বন্ধনও এসে পড়ে যদি না নামরূপের পিছনে সেই বৃহৎকে অনন্তকে ধারণ করতে পারি। গীতাতে যেমন দেখি, ভগবান গোড়াতেই অর্জুনের ক্লৈব্যকে আঘাত করলেন অজ সনাতন অবিনাশী সেই এক আত্মাকে দেখিয়ে, যে কে কাকে মারে? শ্রীঅরবিন্দ সেই রকমভাবে এখানে সেই বড় কথাই তুলে ধরিয়ে দিয়েছেন যে সবই শাশ্বত আত্মা। ওইভাবে আঘাত পেয়ে এক সর্বব্যাপী শূন্যতাকে না পেলে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা যায় না। প্রাচীনেরা নামরূপের সাধনে বিগ্রহবত্তা দেখিয়েছেন, কিন্তু কখনও শুধু তাতেই বাঁধা পড়েননি। ভক্তিশাস্ত্রের সার যে ভাগবত, তিনিও প্রথমেই "সত্যং পরং ধীমহি" বলে সেই বিরাট স্বরূপের আশ্রয়ে লীলাবিগ্রহকে সর্বদাই ধরিয়ে দিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ যজ্ঞেশ্বরকে সেখানেই বসিয়েছেন, তিনিই জীবনযজ্ঞের অধিপতি। তাঁকে যেন নামরূপ দিয়ে খণ্ডিত করে কখনও না দেখি। সেই বিরাট যে ক্ষুদ্র হয়ে সীমিত হয়ে আমার কাছে ধরা দিতে পারেন, এ তাঁরই মহিমা। ভক্তির উচ্ছ্বাসের আতিশয্য এই মহিমা-বোধকে কখনও যেন খর্ব না করে। প্রাচীনেরা আকাশ ভাবনা দিয়ে তাঁকে ভাবনায় ধারণা করতে শিখিয়েছেন। "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"—সর্বব্যাপী নির্লিপ্ত সেই আকাশ অধিষ্ঠানরূপে সদা বর্তমান। নামরূপকে ধরেও তিনি, আবার নাম রূপ সব তাতে গলে গেলেও তিনি। যখন বহির্ধা আকাশকে দেখে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়ে অসীম হয়ে যায়, তখন সেই বহিরাকাশবোধকে দেখতে পাই আমার অন্তরে। অন্তরের সেই আকাশকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে। সেই হার্দাকাশে ব্রহ্মই ইষ্টরূপে উপস্থাপিত। আমার ইষ্টই ব্রহ্ম। সেই কেন্দ্র হতে শক্তির অনন্ত উল্লাস। সে-শক্তি ব্রহ্ম। বিষ্ণুরূপে শিবরূপে শক্তিরূপে সেই ব্রহ্ম। এই ইষ্টব্রহ্মের যুক্তভাবনা এখন যেন আমরা ভুলে গেছি, এমনও অনেক সময় দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীনেরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারেরা যেমন ঈশ্বরকে ব্রহ্মে উপস্থাপিত করেছেন, তেমনি পরে শক্তিসাধনার যুগেও আমরা সেভাবে এক করেই বুঝতে পেরেছিলাম—'কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি'। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ সৎ চিৎ আনন্দ। তাঁর শক্তি ও আনন্দের লক্ষণটি এইসঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করলেই উদ্দীপনা আসে। অসীম অনন্ত চৈতন্য সত্তা আকাশবৎ, তার কূল পাওয়া যায় না। তাতেই দেখি আমার সমুদ্রবৎ যে-জগৎ উল্লসিত, তারও থৈ পাওয়া যায় না। বৃহৎ সর্বব্যাপী চৈতন্যের প্রপঞ্চোল্লাসই শক্তি; ওষধি বনস্পতিতে, ঘটে-ঘটে সবার মধ্যে, সবার পিছনে সব ছাপিয়ে, সেই একদেব। তিনিই তো আমার ইষ্ট, আমার যজ্ঞেশ্বর। এই বৃহত্তের পরিবেশে হৃদয়-বেদীতে তাঁকে বসাতে হবে, তবেই না অন্তর্যামী যজ্ঞেশ্বরকে চিনতে পারব। আমার যজ্ঞের উৎসর্গ তখনই সার্থক হবে।

এভাবে পাওয়া যায় সকলের শেষে, তাই প্রথমে নিজেকে বাদ দিয়ে নিজের বাহিরেই

তাঁকে একভাবে পেয়ে সাধনা শুরু করতে হয়। সেটা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ও ক্ষুদ্রতার মধ্যে বৃহৎকে ছুড়ে নিয়ে, শেষের লক্ষ্যকেই নুনে তাবনায় আনতে হবে। এও গীতার কর্মকৌশল। রামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন "জ্ঞানীর হেথা হেথা, অজ্ঞানীর হোথা হোথা"। এটা ভক্তিরও অনুকূল। তারই মধ্যে আমি বা যা-কিছু সমীর, সে সবই। এইভাবে বৃহতের অনুভব—সেই ব্রহ্মরূপ অনন্ত সমুদ্রে লীন হয়ে বিচরণ করার মত। ব্রহ্মসমুদ্রে আমরা সকলেই ডুবে আছি। ইষ্টভাবনাতে এভাবে জাগ্রত হতে পারলে পরাক দৃষ্টিতেও তাঁকেই দেখা যায় ও আত্মতুষ্টি হয়। এত বড় করে না ভাবতে পারলে ধর্মকর্ম প্রাণহীন অনুষ্ঠান কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মকে বিভূতি বা শ্রী রূপে জীবনে কতটুকু দেখতে পাওয়া যায়? কালী কেমন? না 'ষড়দর্শনে না পায় দরশন'। তিনি যে ইচ্ছাময়ী এই আকাশ-বাতাস সব তিনিই হয়ে আছেন, তিনিই প্রাণ, ব্রহ্মের প্রাণসমুদ্র—সে তো তিনিই। অহরহ এ ধরণের ইষ্ট ভাবনা থেকে সাযুজ্যবোধ আসে। এই সাযুজ্যবোধে উপাসক ইষ্টের সঙ্গে একাকার হন।

যাদের আবার আত্মভাব প্রবল থাকে, সাযুজ্যে তাদের আত্মচৈতন্যের এক বিস্ফারণ ঘটে। বেদান্তের ভাষায় সেটি হল অহংগ্রহের উপাসনা। এ বিচারের পথ। বহির্জগতের যা-কিছু সেসব আমার চৈতন্যে রূপান্তরিত না হলে যেমন কিছু বুঝিনা, তেমন আমারই আত্মচৈতন্য বিরাট, স্থির ও পূর্ণ—"আপূর্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠম্" সব ভাবরূপ তার মধ্যে পড়ে একাকার হয়ে যায়, এই দেখতে পাই। কোন তরঙ্গ আর শেষ পর্যন্ত ওঠে না। এভাবে অহংগ্রন্থিটি একেবারে খুলে গেলে, উপনিষদের ভাবে ভূমার উপাসনায় আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ হয়।

এই দুরকম ভাবে ছাপিয়ে গিয়ে তাঁকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া, তার অধিকারী খুবই কম। শ্রীঅরবিন্দ যেমন দেখিয়েছেন—সর্বব্যাপী চৈতন্যে নিজেকে বৃহৎ করে যেন ছড়িয়ে দিয়ে নিঃশেষ করে দিলাম। আত্মজ্যোতির বিস্ফারণে জ্বলছি, তা থেকে সত্তা মাত্র রইল মহানির্বাণরূপে। রিক্ততার এক মহাশূন্য, সব জ্যোতি মিলিয়ে যায় এক অপরূপ কালোর আলোয়। সেই আভা থেকেই সব কিছু বিভা। এ সর্বনাশা ডাক যেখানে নিয়ে যায়, সেখান থেকে ফিরে না আসার এক তীব্র আকর্ষণ আছে এবং তা থেকেই জীবন প্রত্যাখ্যানের দর্শন এসে জীবনকেও অধিকার করে। মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ এই জীবন প্রত্যাখ্যানের দর্শন। কিন্তু বুদ্ধের এই পরিনির্বাণকেও পেতে হবে, তবেই শ্রীঅরবিন্দের যোগের ভিত্তি বোঝা যাবে, একথা বলা হয়েছে। নির্বাণের পর এক মহাশূন্য, কোনও বিকল্পের অধীন তা নয়। পরম রিক্ততা ও নিবিড় নীরবতা, আর সেখানেই রয়েছে মূল শক্তির উৎস। সেই মহামরণকে যদি জীবনে

অনুস্যূত দেখতে শিখি, তবেই পূর্ণযোগের অধিকার পাওয়া যাবে। এই পরম শূন্যতা ও বৈরাগ্য নিয়ে সংসারে থাকাটা যে অসম্ভব বা খুব কঠিন, তা যেন মনে না করি। রবীন্দ্রনাথের জীবনে আমরা দেখেছি, তিনি মৃত্যুকে যেন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁকে মৃত্যুর ধ্যান পেয়ে বসেছিল। এও বৌদ্ধভাবনার অনুকূল ধ্যান। এই নিয়ে তিনি সংসারে থেকে গেছেন, কর্ম করে গেছেন। তাঁর কাছ থেকে সে-শিক্ষাটুকু আমরা নিতে পারি। তিনি বলেছেন তাঁর মধ্যে আছে এক বাউল, যে কখনও বাঁধা পড়ে না। সকলের মধ্যেই সেই বাউল ঘরে-ঘরে এক মহানরণরভসে ঘুরে বেড়ায়, তাকে চিনে নিতে হবে। অনাসক্ত ভালবাসা, শোক ও মোহের অধীন না হওয়া, এইভাবে নির্বাণকে নামিয়ে এনে জীবনে চলতে পারলে, সংসার পর্যন্ত উজ্জ্বল ও মধুর হয়ে ওঠে।

প্রথমে দেখলাম, অহংগ্রহের উপাসনা ও তা থেকে নিজেকে আহত করা। তখন ভূতভাবন কর্ম হল "বসুধৈব কুটুম্বকং লোকহিতং চরন্তঃ"। সমস্ত জীবনটাই এক মহাযজ্ঞ। যখন তাঁকে সর্বত্র দেখি, ওষধিতে বনস্পতিতে তখন আর এক দিক থেকে বলি "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্"। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কল্পতরু হয়ে এ সব দৃষ্টান্ত দেখিয়েও গেছেন। তিনি সবার মধ্যে ছোঁওয়া দিয়ে বলেছেন "তোদের চৈতন্য হোক্"। এ যেন এক আশ্চর্যভাবে ফুল ফোটানোর পালা। সবার ভিতরে তিনি, এভাবে দেখতে শিখলে যজ্ঞভাবনা এসে যায়। আমার আচরণ যেন অপরের মধ্যে তোমাকে না আবৃত করে। সবার মধ্যে যে তুমি, তুমি জাগো। তোমাকে অর্ঘ্য দিই আমার সব কিছু ফুলের মত বিকশিত করে দিয়ে। এইভাবে যদি কর্তব্য কর্মে ও স্বভাবে নিজেকে সব সময় বাজিয়ে দেখে নিই, তাহলে কর্মের সঙ্গে জীবনের গতিতে সংঘর্ষ বাধে না। কর্মের গতির অদলবদল হতে পারে যদি আমার নিয়ত কর্ম তাই হয়। এইভাবে জীবন ও যজ্ঞ এক করে নিতে পারি।

(ক্রমশ)

তামিল পদাবলী

শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত

আমাদের বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজন বা পদকর্তাদের পদাবলী, দাক্ষিণাত্যে তামিলদেশে তেমনি আলবারদের (আল্=ব্যক্তি, সৌজন্যার্থে বার=গভীর জ্ঞান) 'প্রবন্ধম্' বা পদাবলীর সমার্থক স্তবমালা—'নালায়ীর প্রবন্ধম্' এই স্তবসংগ্রহের শিরোনামা। এই ১১০২ স্তবকের (stanza) বিপুল সমাহারে ১২জন আলবারের নাম উল্লেখযোগ্য—পেই আলবার, ভূতত্তালবার, পোইকাই আলবার, তিরুমলিসৈ আলবার, নম্মালবার, মধুরাকবি, কুলশেখর আলবার, পেরিয়ালবার, অণ্ডাল, তোণ্ডরডিপ্পোডি, তিরুপ্পন আলবার ও তিরুমঙ্গাই।

'নালায়ীর প্রবন্ধম্'

বৈষ্ণবধর্মে এই সাধক-সম্প্রদায়ে একটি লক্ষণীয় অঙ্গ হল তার মধ্যে গুরুপরম্পরার ধারাটি। নম্মালবার তাঁদের আদি—তাঁরই সাক্ষাৎ শিষ্য হলেন মধুরাকবি, একাধারে সাধক ও কবি। এঁরা উভয়ে তাঁদের রীতিতে দিয়েছেন একটা ক্লাসিকাল বা কৌলীন্য-ব্রতী রূপ—অন্তঃস্থৈর্যে ও শিল্পভঙ্গিমায়। অবশ্য মূল ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখে পরেও চলেছেন নালায়ীয়নের সূত্রকার নাথমুনি এবং অপরাপর আচার্যরা—পুণ্ডরীকাক্ষ, রামমিশ্র, যমুনাচার্য (অন্য নাম আলবণ্ডার অর্থাৎ তর্কশক্তির দ্বারা 'লোকজয়ী')। যমুনাচার্যের রচনা সংস্কৃতে, তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতের ব্যাখ্যা সুপরিচিত, তারই পূর্ণপরিণত রূপ ফুটে উঠেছে অনুগামী রামানুজের হাতে। রামানুজ আলবারদের নানসপ্রতিভার দিকটি সুশৃঙ্খল করে ধরলেন, তার একটা নিয়মবদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করলেন।

গুরু-পরম্পরা

ডাঃ ফার্কুহার এই ধর্মভাবের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে প্রাচীন ভাগবত পুরাণের (৯০০ খৃঃ) দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কালানুক্রম দেখলে অণ্ডালদের আবির্ভাব আরো প্রায় অর্ধ শতাব্দীর বেশি প্রাচীনত্ব দাবি করে। ভাগবত পুরাণ আলবার কাব্যের কাছে কতখানি ঋণী তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। কৃষ্ণভক্তির মূল বিষয়ে মিল যেমন আছে, পুরাণে কৃষ্ণের যৌবনলীলা ও গোপী-সাহচর্যের প্রতি পক্ষপাতিত্বের দিক থেকে অমিলও তেমনি আছে। আলবার হয়ত শুদ্ধা ভক্তির দিকে—দাস্যভাবের দিকে—ঝুঁকেছেন বেশি, ভাগবত পুরাণের কবি অন্যপক্ষে ইষ্টকে শুধু

ভাগবত পুরাণ ও আলবারগীতি

নর্মসঙ্গী নয়, নর্মসহচর পর্যন্ত করে ধরেছেন। তাতে রস যেমন বিচিত্র উচ্ছল ভক্তের কাছে শঙ্কার হেতুও সমপরিমাণ—গীতায় অর্জুন যে মার্জনা চেয়েছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু এই মার্জনাভিক্ষার জন্যই কি অর্জুনের তার দিশারীর সঙ্গে সম্বন্ধটির রহস্য আরো মধুর হয়ে ওঠেনি?

ভয় বিস্ময়াদি ভাবের মতো ভক্তিও মানুষের এক আদিম বা আদি প্রবৃত্তি, তার সহজ সহজাত বৃত্তিও নিশ্চয়। তার সূত্র খুঁজতে কোথায় যাব? আলোচ্য বিষয়ের গবেষকরা অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন ঋগ্বেদের দিকে। বরুণের প্রতি যে ভক্তির স্তব উদ্গীত হয়েছে ঋষিকণ্ঠে—যে-প্রসন্নতা কামনা করা হয়েছে উপাস্য দেবতার কাছে—তা তো বৈষ্ণব ভাবেরই ভ্রূণাবস্থা—ভক্তিভাবের প্রথম বাঙ্ময় শিল্পরূপ। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে (আঃ ৮০০-৫০০ খৃঃ) বিষ্ণু আরো চিত্তাকর্ষক, আরো জনপ্রিয় রূপ ধারণ করেছেন—যেমন অন্য বিদেশী (গ্রীক, মিশরীয়) পুরাকথায় সূর্য-দেবতা। গীতায় ভক্তি এসে একটা দৃঢ় ভিত্তি পেল—পেল তার আধুনিক প্রায় রক্তমাংসের শরীর। বিষ্ণুভক্তদের মতো গীতার প্রেরণা ধরে এখানে আবার আর এক শ্রেণী তাদের অন্তরাকৃতির উদ্দিষ্ট দেবতা পেল শিবের মধ্যে। বস্তুত সারা ভারতবর্ষে এই বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের ধারা পাশাপাশি চলেছে—সকল বিরোধিতা ও বৈপরীত্য সত্ত্বেও—শঙ্করাচার্য ও রামানুজের ব্রহ্ম নিরূপণ ও হৃদয়েশ্বর চিত্রণের পার্থক্য সত্ত্বেও—যুগল ধারার মতো। মুক্তি পরমাসিদ্ধি ব্রহ্মোপলব্ধি জ্ঞানে না প্রেমে তা নিয়ে নানা বিশ্লেষণ গড়ে উঠেছে কিন্তু সাধারণ মানুষের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল' এই উভয় কূলের কবিরই আকুল আহ্বান। আলবারদের (শৈব সাধকদের 'দেবারম্' ও 'তিরুবাচকম্') আবেদন এই সাধারণ্যে।

ভক্তির বিকাশ-ধারা

এই ভক্তসাধারণ্যের মধ্য থেকে আবার দুই শ্রেণী দেখা দিয়েছে—উত্তরাঞ্চলের 'বড়গলৈ', যারা প্রাধান্য দিয়েছে ভক্তের টানের সামর্থ্যের উপর; দক্ষিণাঞ্চলের 'তেঙ্গলৈ', যারা মুখ্য স্থান দিয়েছে ইষ্টের কৃপা ও করুণার উপর—আলবারদের গীতিকাব্য এইভাবে সমৃদ্ধ। দক্ষিণের বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই দুই ভাগে এখনও বিভক্ত।

বড়গলৈ ও তেঙ্গলৈ

আলবার-কাব্য ও বৈষ্ণবধর্ম বা ভক্তিভাব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তবে এর আবির্ভাবকে আকস্মিক বা আপতিক ঘটনা না বলে করে একটা ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিণাম হিসাবে দেখা চলে। ঋগ্বেদে বহুদেবতার উপাসনা যেন ফল্গুও—মুখ্য-গৌণ প্রধান-অপ্রধান শ্রেণীবিন্যাস সত্ত্বেও। ঋগ্বেদের দেবতা প্রসন্ন হলে পর্যাপ্ত ধন

ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিণাম

দান করেন, শ্রী সমৃদ্ধি আনেন, যশস্বালোক জ্বালেন, তবু তিনি মানুষের সঙ্গে একটা পার্থক্য রেখে চলেছেন।

বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম এই দেবদেবীর প্রতিবাদ—মূর্ত অবয়বী ভগবানের বিরুদ্ধে অস্বীকৃতি। ধর্ম এখানে আবেগ-উচ্ছ্বাসবর্জিত নীতিসূত্র, ethical teaching.

কিন্তু বুদ্ধের আবির্ভাব থেকেই বীর-পূজার (hero worship) সম্ভাবনা দেখা গেল—একটা tragic irony-র মতো। গীতায় যখন ধ্বনিত হল, 'সাধুদের পরিত্রাণে ও দুষ্কৃতের বিনাশে যুগে যুগে আমি এসেছি' তখন ভক্ত ও ভগবান পাশাপাশি এসে দাঁড়ালেন। রামের সঙ্গে কৃষ্ণ আগেই বিষ্ণুর আংশিক অবতার হয়ে ছিলেন—গীতায় তিনি হয়ে উঠলেন পূর্ণাঙ্গ অবতার, পূর্ণ প্রকাশ। তবু গীতায় বিবৃত হয়েছে দু'টি সত্যই—personal absolute ও impersonal absolute. উদারপন্থী তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুরা দুটিকে পরস্পর-বিরোধী হিসাবে না নিয়ে সম্পূরক সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী। আলবার-ধর্ম বিগ্রহবরণের পথে চলে এসেছে। তাকে এখানে সম্মুখীন হতে হয়েছে অদ্বৈতবাদের কঠিন বাধার।

শঙ্কর প্রচার করলেন এক আছে, দ্বিতীয়টি মিথ্যা—নাস্তি এক ব্রহ্মই সৎ বা অস্তি, দ্বিতীয় জগৎ-প্রপঞ্চ নেই—তা আছে অজ্ঞানের মধ্যে, অজ্ঞানই বিস্তার করেছে এই মায়াজাল, এই দৃশ্য বিশ্ববন্ধনকের প্রহেলিকা—এই জ্ঞেয়জ্ঞান যখন সরে যাবে মায়ার ঘোরও তখন কেটে যাবে। যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ জীবের জন্মমৃত্যুর পাশ ও কর্মবন্ধন—কর্মের অমোঘ বিধান আমার ব্যক্তিনিরপেক্ষ—তার শাসন থেকে বিধিরও নিস্তার নেই। নিষ্কৃতি বা মুক্তি বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে এই নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মলাভে। ভক্তির প্রশ্নই এখানে নেই। কারণ, উদ্দিষ্ট পরমপুরুষ যেমন নির্গুণ অজ্ঞেয় অগম্য নিশ্চল, তেমনি নির্ব্যক্তিক এই কর্মফলের বিধান। বলা বাহুল্য এই ধরণের শুষ্ক তত্ত্বে ও তর্কে মানুষ তৃপ্ত হয়নি—তার অন্তর রসের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, এক রহস্যময়ের বাঁশীর সুর শোনবার জন্য চিত্ত তার উন্মুখ। আলবার তাকে দিল সুধারসের সন্ধান। রামানুজ শঙ্করের শূন্য-মার্গের বিপক্ষে তত্ত্ববিস্তারে বললেন—ঈশ্বর যদি অস্তি, জগৎও ঈশ্বরের প্রকাশ বলে সমধিক অস্তি, ঈশ্বর নিত্য তাই জগৎও নিত্য, যাবতীয় জগৎবস্তুর নিত্য সত্য উপাদান হল চিৎ-অচিৎ—জীবাত্মা আর জড়। তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেমন নেই তেমনি ব্রহ্মের অদ্বৈততার সঙ্গেও কোন বিবাদ বা সংঘর্ষ নেই। ঈশ্বরের সাহচর্যেই তাদের অস্তিত্ব সার্থক, বিশেষ গৌরবে গৌরবান্বিত।

আলবার সাহিত্য-সংগ্রহ বা 'নালায়ীর প্রবন্ধম্' তামিল সমাজজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বৈষ্ণব মন্দিরে বেদপাঠের সঙ্গে তার স্থান, সামাজিক

সমাজ-জীবনে স্থান

আচার-অনুষ্ঠানে তার অংশবিশেষের আবৃত্তি অনিবার্য ও সুপ্রচলিত রীতি। বস্তুত ধর্মানুষ্ঠানে অব্রাহ্মণের বেদপাঠে নিষেধ আছে, কিন্তু এই 'প্রবন্ধে' প্রবেশাধিকার অবারিত—এই বৃহত্তর ব্যাপ্তি এবং সহজ গম্যতার জন্যই এর নাম 'সরল বেদ' বলে প্রচলিত হয়েছে।

তাৎপর্য

রাধা (নাপ্পিনৈ)-কৃষ্ণের আকর্ষণ দুর্বার—দুই অলোক প্রতিভার অবল প্রেমের যুগল মূর্তি এখানে। এই রাধাতেই আবার প্রতিফলিত বিশ্ব চরাচরের আকূতি, প্রতি ভক্তের ভগবন্মুখী আস্পৃহা, অন্তরের সার্থকতা। এমন স্থূল ও সূক্ষ্মের অর্থ ও ব্যঞ্জনা মিশে, ব্যক্তির মাধুর্য ও তত্ত্বের তাৎপর্য ভ'রে পদাবলী-কাব্য রসের সাগর হয়েছে। অরসিকও এখানে এসে মুগ্ধবিস্ময়ে বাণীবৈভবের সুধা পান করে।

তিরুপ্পাবৈ

অণ্ডাল

[বাগানে মৃত্তিকা খনন করতে করতে পেরিয়া আলবার খনিত্রের মুখে কুড়িয়ে পেলেন একটি ফুটফুটে শিশু—তার নাম রাখা হল অণ্ডাল। বালিকা একদিন পিতা আলবারের অনুপস্থিতিতে গৃহদেবতা কৃষ্ণের জন্য রাখা ফুল দিয়ে নিজেকে সাজাল। দেখে দুঃখে ম্রিয়মাণ হলেন ভক্ত। রাত্রে স্বপ্নে দেখা দিলেন কৃষ্ণ, আদেশ দিলেন—অণ্ডালের ব্যবহৃত ফুলই তিনি গ্রহণ করবেন রোজ। প্রত্যহ সেই রীতিতেই হৃষ্ট আলবার সমাধা করলেন তাঁর ইষ্টের পূজা। কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী অণ্ডাল গোপীভাবে তন্ময়—তাঁর গান 'তিরুপ্পাবৈ' ও 'নাচিচয়র তিরুমলি' মুখে মুখে বৈষ্ণবকুলে ছড়িয়ে পড়ল। বিবাহযোগ্যা অণ্ডাল অভিসাররাত্রে সখীজন পরিবৃত হয়ে গেলেন শ্রীরঙ্গমে, সকলের দৃষ্টির সামনে মিলিয়ে মিশে গেলেন মন্দিরস্থ রঙ্গনাথের মূর্তিতে।]

১

আমরা এলাম পৌষের এই পৌর্ণমাসীতে।
সমৃদ্ধ আইয়াপাড়ির* কলোচ্ছল কিশোরীরা,
মণিমুক্তায় সেজে যারা চাও
এমন জলক্রীড়ায় নামতে যে সকলে বাহবা দেবে,
চলে এসো।
নন্দগোপের কুমার এই স্বয়ং নারায়ণ,
যিনি করে ধরেছেন সুতীক্ষ্ণ বর্শা,
কঠোর কর্তব্যে ব্রতী তিনি;
যশোদার সুনয়ন এই সিংহশাবক,
মেঘবরণ এই কিশোর
চোখ যাঁর গোলাপের মতো
আর মুখখানি চন্দ্রিমার,
তিনি, তিনিই আমাদের দেবেন নামগান করবার অনুমতি।

* গোকুল

মারহাশিত্ তিঙ্গল্ মদি নিৱৈন্দ নন্নালাল্;
নীরাডপ্ পোদুমীর্ পোদুমিনো নেরিজাইরীর্।
শীর্ মলহর্ আইয়াপাডীচ্ সেলভচ্ চিরুমীরহাল্:
কূরভেল্ কোদুন্তোশিলন্ নন্দগোপন্ কুমরন্
এরার্ন্ত কন্নি যশোদাই ইনন্ সিঙ্গম্,
কারমেনিচ সেন্‌কন্ কদির্ মদিয়ম্পোল্ মুহত্তম্
নারায়ন্নে নমক্কে পর্যে তরুবান্,
পরোর্ পুহজ পদিন্দেল্ ও এম্বাভাই।

২

শোনো বিশ্ববাসী,
শোনো আমাদের তপস্যার রীতিনীতি।
ক্ষীরসমুদ্রে ফণীর* পিঠে শয়ান পরমের
চরণ-বন্দনা করব আমরা।
ঘি আর খাব না,
দুধও খাব না।
ভোরে উঠে স্নান সেরে নেব,
কাজল লাগাব না চোখে,
প্রসাধন দেব ছেড়ে,
মাথায় চুলে আর ফুল গুঁজব না।
মহাজনরা যা করে না
আমরাও তা করব না।
কুকথা মুখে আনব না কখনো।
যতদূর সম্ভব উদার হব, বদান্য হব।
এসব, এসবই হৃদয় দিয়ে করব,
করব শান্তিময় জীবনের উদ্দেশ্যে।

* আদিশেষ

তৈয়ত্তু ভাজতীয়হান্। নামুম্ নম্ পাবৈক্কু,
সেইয়ুম্ কিরিসৈহল্ কেলীরো ; পার্কড়ুল
পৈয়ত্তুইন্ন পরমন্ আদিপাদি,
সেইয়ুন্মোম্ ; পামুন্মোম ; নাড়কালে নীরদি,
নৈত্তেজুদোম্ ; মলরিত্তু নাম্ নুদিরোম্ ;
সৈয়াদন সৈত্তম্ ; তিক্কুকুরলৈ সেন্নরোদম্ ;
ঐয়মুম্ পিচৈচয়ুম্ আন্দনৈয়ুম কৈকত্তি,
উয়াইয়ুমারেন্নি উহন্দেলো রেম্পাভাই।

৩

নিজের দেহ শূন্যে প্রলম্বিত করে*
যিনি মাপ নিয়েছিলেন ত্রিলোকের
সেই বরিষ্ঠের নামগান করতে করতে
আমাদের ব্রতোপলক্ষে যদি অবগাহন করি
তাহলে বৃষ্টির পুণ্যধারা
দেশজুড়ে মাসে তিনবার পড়বে,
নধর ও সোনালী উঁচু ধান্যশীষের ফাঁকে ফাঁকে
ঢেউ তুলে মাছেরা খেলে বেড়াবে,
বিচিত্রপৃষ্ঠ ভোমরা ঘুরে ঘুরে মনোরম শালুক ফুলের
মধু পান করবে,
অকৃপণ গোপাল পর্যাপ্ত আহারান্তে গোয়ালে ফিরলে
তাদের সরস বাঁট ছুঁতে না-ছুঁতে
দুধে দুধে ভরে দেবে পাত্রের পর পাত্র,
সর্বত্র বিরাজ করবে অটুট সমৃদ্ধি।

* বামনাবতার

ওংগি উলহলন্দ উত্তবন্ পেরপাডি,
নাঙ্গল্ নাল্ পাবৈক্কুচ শাত্রি নীরাদিনাল্,
তিঙ্গিল্মুম্মারি মাডেল্লান্ তিঙ্গল্ মুম্মারি পেয়দু,
ওংগু পেরুল্ সেল্ নেল্ উডুকয়ল উহলপ
পুল্ কুবলৈ পোদিল্ পোরি তণ্ডু কল্ পদুপ্পং
তেঙ্গদে পুক্কিরুন্দু শীর্ত্ত মুলৈ পত্রি
তাঙ্গক্ কুডম্ নিরৈক্কুম্ বলুল্ পেরুম্পত্তক্কল
নীঙ্গাদ সেলভম্ নিরৈন্দ এলো এম্মাতাই।

৪

পর্জন্যদেব, তোমার মহিমার তুলনা হয়
একমাত্র সমুদ্রেরই সঙ্গে।
লুকিয়ো না কিছু, বঞ্চিত করোনা কিছু থেকে।
সাগরের মধ্যে ঢুকে যাও
এবং সেখানে গিয়ে শুষে নাও সব জল,
গর্জন করে উঠে যাও আকাশে,
বিশ্বের মূল* বিশ্বপতির মতো কাজলকায়া ধারণ করো,
সুঠাম ও শোভন-অঙ্গ পদ্মনাভের দাঁত থেকে
নামে যেমন চক্র,
যেমন নামে শারঙ্গ† থেকে শরবৃষ্টি
তেমনি শঙ্খনিনাদ তুলে নেবে এস ধরণীবক্ষে
যাতে সমৃদ্ধ হয় ধরিত্রী
আর আমরা সোল্লাসে জানোৎসবে মেতে যেতে পারি ;
অচিরে চালো তোমার ধারা
যেমন নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তাঁরও‡ শরবৃষ্টি।

* নারায়ণ
† বিষ্ণুর ধনুক
‡ রাবণের প্রতি রামের

আশি মঈককন্না ওন্নুম নী কৈকরতেল ;
আশিয়ুল পুক্কু মুহন্দু কোদরর্ত্তেরি,
উশি মুদল্তন্ উরুম্পোল্ মৈকরুম্বু
পাশিয়ব তোলুডৈ পর্পনাভন্ কৈয়িল্
আশিপোল মিননী মলম্পুরিপোল নিন্নডিম্মু,
তাশাদে সারংগম্ উডৈত্ত শরমৈপোল্,
ভাশা উলহিনিল্ পৈডিদাই নাঙ্গলুম
মারম্বশি নীরাদ মহিশিন্দেলো রেম্পাডাই।

৫

যদি আকণ্ঠ পবিত্রতা নিয়ে
কাছে গিয়ে দাঁড়াই এই রহস্যময়ের,
মথুরার এই বীর ও বিমোহন নাগরিকের,
গভীর ও স্বচ্ছতোয়া যমুনাতীরবাসীর,
গোপবংশের এই পুণ্যজ্যোতির,
মাতৃগর্ভধনাকারী এই দামোদরের,*
যদি মনোরম ফুলের অঞ্জলি তাঁর পায়ে দিয়ে
তাঁকে পূজা করি,
তাঁর নামগান করি ও তাঁকেই শুধু স্মরণ করি,
তাহলে ভূত ভবিষ্যতের যত পাপ সব মিলিয়ে যাবে
আগুনের শিখায় এক টুকরো তুলোর মতো।
তাঁরই নামগান করো তাহলে!

* শৈশবে উদরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার জন্য নাম

মায়নৈ নমু ভয়দূরৈ নৈদনৈ,
তুইয়া পেরুনীর্ যমুনৈ তুরৈয়নৈ,
আইয়ার কুলত্তিনিল্ তোন্রুম অনি ভিলক্কৈ,
তায়ৈ কুড়ল্ ভিলঙ্গ্ সৈয় দামোদরনৈ,
তুইয়োমৈ ভন্দু নাম্ তুলর্ তুতিত্ তোজুদু.
ভৈনল্ পাডি মনত্তিনাল্ সিন্তিক্ক,
পোইয় পিজৈয়ুম্ পুগ ভল্লান্ নিন্রনভুম্
তিইনিল্ তুছাঙ্গম সেপ্পেল্ ওরেম্বাভাই

৬

পাখিরা গান শুরু করেছে।
পাখির রাজার যে প্রভু
তাঁর প্রাসাদ থেকে শতশঙ্খের কর্ণভেদী ডাক আসছে
তা শুনতে পাও না?
বেচারা তুমি
ওঠো।
যিনি রাক্ষসীর* স্তন থেকে বিষ টেনে খেয়েছিলেন,
যিনি শকটের মায়াচক্র‡ এক পদাঘাতে শতখণ্ড করেছিলেন,
যিনি ক্ষীরসাগরে সাপের ফণার ওপর ধ্যানস্থ হয়েছিলেন,
যাবতীয় জিনিসের যিনি উৎস,
যোগী ঋষিরা ধীরে উঠে তাঁর ওপর মনঃসংযোগে
করেন হরিনাম গান।
এই গম্ভীর ধ্বনি আমাদের মর্মে প্রবেশ করছে,
আনন্দে ভরে দিচ্ছে আমাদের।

* পূতনা
‡ কংস-প্রেরিত চক্ররূপী শকটাসুর

পুল্লুম্ সিলম্বিন্ কান্ : পুল্লুরৈ য়ান্ কোয়িলিন্
ভেল্লৈ ভিলি সংগিন্ পেররভ্ কেট্টিলৈও?
পিল্লৈ এল্লোরিয়ৈ পৈ মুলৈ নঙ্গুল্,
কল্লাচ্ সহডম্ কলক্কনিয় কালোচ্চি,
ভেল্লত্তরভিন কুরিলমর্দ্দল ভিট্টিটনৈ
উল্লুট্টুক্কুল্ মুনিবর্গলুম্ যোগীযরুম্
মেল্ল এল্লুম্ অরিত্তুন্র পেররবর্
উল্লম্ পুহুন্দু কুলিন্দেলো ওরেম্বাডাই।

৭

বোকা মেয়ে।
শুনতে পাও না
চারদিক থেকে ডাকাডাকি করছে আনৈচাত্তন্‌রা ?*
শুনতে পাও না
ভাও দিয়ে অচিহ্নদের বাহুলক্ষালনের দোলায়
দুগ্ধমন্থনের শব্দ,
যখন গলায় তাদের দুলতে থাকে সোনার মটরমালা ?
নারীকুলের রাণী তুমি।
আমরা যখন নারায়ণের অবতার কেশবের নামকীর্তন করি
তখন তা শুনেও তুমি শুয়ে থাকতে চাও ?
অপরূপ তুমি,
খুলে দাও তোমার দরজা।

* চাতক

কীন্‌ কীলেন্‌রেন্দুন্‌ আনৈচচাত্তন্‌ কানন্‌দু
পেসিন পোচচরভন্‌ কেট্টিলৈয়ো ? পৈপ্পেন্‌নে
কান্নন্‌ পিন্নপ্পুন্‌ কন্‌হলপ্পক্‌ কৈপেন্‌ত্তু
বাস নন্নকুষল্‌ ঐচিচয়ন্‌ মত্তিনাল্‌
ওসৈ পাডুত্তু তৈইরন্নভন্‌ কেট্টিলৈয়ো ?
নন্নকপ্‌ পেন্‌ নিল্লৈ ! নারায়ণন্‌ মূর্তি
কেসবনৈপ্‌ পাডভুন্‌ নীক্‌কেট্টে কিডন্তিয়ো ?
তেস মুদৈয়াই তিরভেন্‌ ওরেমপাভাই।

৮

পূবের আকাশ কর্মা হয়ে উঠছে,
গানিকক্ষণ ছাড়া পাবার সুযোগে
মোষেরা ঘাস খাবার জন্য
এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে।
যে মেয়েরা স্নানে চলেছিল
আমরা তাদের ফিরিয়ে এনেছি
আমাদের সঙ্গে তোমায় ঘরে তোমাকে ডাকতে—
ওগো প্রিয় সখী, ওঠো।
আমরা যদি তম্বুরা পেয়ে যাই
তাঁর নামগান করে ও তাঁকে পূজা করে,
যিনি বুধ চিরে ঘোড়াকে* মেরেছিলেন
এবং প্রাণ নিয়েছিলেন দুই মল্লবীরের,‡
তাহলে তিনি আমাদের অভিযোগ শুনবেন,
কৃপা করবেন,
তাঁর করুণা বর্ষণ করবেন আমাদের ওপর।

* কংস-অনুচর অশ্বরূপী দানব কেশী
‡ মুষ্টি ও চানুর

কিণ্ডানর্ ভেল্লৈনুমৈ সিরুমিডু
মৈতান্ পয়ন্দন কান্। নিক্কুন্ন পিল্লৈকলুম
পোতান পোহিন্দারৈ পোহবর্ কাণ্ডু উন্নৈক্
কুডুমান্ তন্দু নিনরোর্। কোদু কলবুডৈয়া
পাডাই এণ্ডন্দিরাই। পাডিপ্ পরৈ কোণ্ডু
মাডাইপ্ পিলন্দানৈ, মল্লরৈ মাট্টিয়
দেবাদি দেবনৈচ্ সেন্রুন্নাম্ সেভিত্তাল
যতাতেনক্ক রাইপ্পু তরুমেলো ওরেম্পাডাই।

৯

তুমি আমাদের পিতৃব্যের নন্দিনী
এখনো রয়েছ ঘুমিয়ে রত্নখচিত অমূল্য প্রাসাদে—
সেখানে চারদিকে জ্বলছে দীপ,
সর্বত্র সেখানে সুরভিত ধূপের সুবাসে।
এবার খোলো তোমার বিচিত্র-খচিত দুয়ার।
খুড়ি, ওকে একটু জাগিয়ে দেবে তুমি?
তোমার মেয়ে কালা না বোবা?
নিদারুণ ঘুমে মেতিয়ে পড়ে
ও তলিয়ে গেছে কি?
নয়তো যাদু করা হয়েছে,
দলচ্যুত করা হয়েছে ওকে?
শাশ্বতের যে অনন্ত নাম গাইছি
তার কয়েকটি এই—
নারায়ণ, মাধব, বৈকুণ্ঠপতি।

তুমনি মদত্তু সুত্তুম ভিলক্কেরিয়া
ধূপম্ কমল তুয়িলনৈ মেল্ কন্ ভলম্
মাদম্ মহনে। মনিক্কদবম্ তান্ তিরভাই।
নাঙ্গীর। অবলৈ এলিপ্পিরো। উন্নহল্ তান্
উনৈয়ো? অনরিন্ চেভিডো? অনন্তলো?
এমপ্ পেরুম্ তুয়িল্ মন্দীরিপ্পান্টালো!
নারাইযন্, মাধবন্, বৈকুন্ঠন্ এন্রেন্রু
নামম্ পালত্তুম্ নভিন্রেল ওরেম্পাভাই।

১০

তুমি আমাদের উপাস্য,
তুমি তপস্যাবলে এখানেই স্বর্গসুখ ভোগ করছ।
যারা দরজা খুলছে না
তারা কি শুনতেও পাবে না একটু আমাদের?
সর্বগুণাকর নারায়ণ,
তোমার চূড়ায় সুগন্ধি তুলসীপাতার মালা,
আমাদের ভক্তির জন্য দেবেনা তমুরা?
তুমিই এখন দারুণ আলস্যে ডুবে রয়েছ।
তোমারই যারা পরাজিত কুম্ভকর্ণ
যমের মুখগহ্বরে গিয়ে
এখন তোমাকেই কি দিয়ে গেল তার আলস্যভার?
রত্ন আমাদের তুমি,
আবার সতেজ হও,
খোলো এসে তোমার দুয়ার।

নোয়্রুচ্ সুভর্গম্ পুহকিন্র অম্মনে।
নায়্রনুম্ তায়ারো ভাসল তিরভাদায়্?
নায়্রৎ তুপাইমুদি নারায়ণন্ নমবাল্
পোয়্রাপ্ পরৈ তরুম্ পুন্নিয়মেল্ পাওোরুনাল্
কুয়্রাত্তিন ভাই তিণ্ড কুম্ভকরণনুম্
তোয়্রুম্ উনক্কে পেরুনতুয়িল্তান্ তন্নানো?
আয়্র অনন্দল্ উডৈআই। অরুম্ কলনে।
তেয়্রবাই বন্দু তিরতেল্ ওরেমপাডাই।

১১

স্বর্ণলতা তুমি,
নিষ্কলঙ্ক সেই রাখালদের মেয়ে
যারা বাছুর সহ দুগ্ধবতী গোরুর পাল নিয়ে
মাঠে চরাতে যায়,
যারা আবার যুদ্ধে শত্রু নাশ করে।
তোমার নিমোদরদেশ
বল্লকবাসী বিধাতিনু সাপের ফণার মতো।
অরণ্যবিহারী ময়ূরের মতো দেখতে তুমি।
বের হয়ে এসো।
তোমার যত সখী যত সাথী
সবাই উপস্থিত দরজার সামনে,
তারা সেই জলদবরণের নামগান করছে,
আর তুমি আদুরে বালা কি নিশ্চল ঘুমিয়ে থাকবে,
সাহস করে' আমাদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত না বলে?
এর কী অর্থ?

কর্তুক করবৈকৃ কনংগল্ পল করন্দু
সেত্রার্ তিরলশিয়ছ্ চেন্রু চেক্কছ্ চেইয়ুম্
কুত্র মোনরিল্লাদ কোবলর্ তাম্ পোর্কুকোডেইয়ে।
পুত্রর তল্হল্ পুনমইলে। পোদারাই।
মুত্রত্তুৎ তোণিমারেল্লাক্কুম বন্দুম্ নিন্
মুর্তন পুহন্দু মুহিল বন্নন্ পোর্ পাডচ
সিত্রাদে, পেসাদে, সেল্ভ প্পেণ্ডাট্টি নী
এট্ টুরক্কুম পোরুলেল্ ওরেম্পাডাই।

১২

তুমি ধনী ও মহৎ রাখালের বোন
যার বাড়ী
মোষেরা তাদের কচি বাছুরদের কথা ভেবে
বাঁট থেকে অনিবার দুধ ক্ষরণ করে'
ভাসিয়ে কর্দমাক্ত করে দেয়।
তোমার সদর দুয়ারে এসে
আমরা গাইছি তোমার প্রিয়ের নামগান,
যিনি ক্রোধে লঙ্কার রাজাকে বিনাশ করেছিলেন ;
এখন আমাদের মাথায় ঝরছে কুয়াসা,
তুমিও কিন্তু মুখ খুলতে সাহস পাও না।
ওঠো তবে এবার।
প্রতি গৃহে যখন সব লোক জেগে উঠেছে
তখন তুমি আর কেন এমন ঘুমিয়ে ?

কনৈৎ তিলঃ কট্টৈরবৈ কন্‌রুক্‌কিরঙ্গি
নিন্মৈত্তু মুলৈভশিয়ে নিন্‌রু পাল্‌সোর
মনৈত্তিলুম্‌ সেরাক্‌কুর্‌ নল্‌সেলবন্‌ তন্নাই।
পনিত্তলৈ ভীশা নিন্‌ তাসর্‌ কট্টে পত্রিচ্‌
সিনত্তিনাল ডেন্নিলঙ্কৈক্‌ কোমনৈচ্‌ চেট্ট
মনত্তুক কিনিয়নৈপ্‌ পাড্‌ভুম নী ভাই তিরভাই।
ইনিত্তান্‌ এত্তদিরাই ইদেন্‌ পেরুম্‌রক্‌কম্‌
মনৈত্তিলুত্তাক্কম্‌ অরিদেল্‌ ওরেবপাভাই।

১৩

নির্দয় পাখির* চঞ্চু ভেদ করে
যিনি রাক্ষস নিধন করেছিলেন
তাঁর প্রশস্তি গেয়ে
সব কিশোরীরা এসে জড়ো হয়েছে পুণ্যস্নানে।
শুকতারা উদয় হয়েছে,
অস্ত গেছে বৃহস্পতি।
পাখিরা ধরেছে গান।
তোমার চোখ তো পদ্মের চেয়েও সুন্দর
নিখুঁত ভাস্কর্য-প্রতিমার মতো দেখায় তোমার মূর্তি।
এমন শুভদিনে তোমার কি ইচ্ছা
বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে
সরলভাবে পরিষ্কার জলে নাফাঁপি না করে
বিছানায় বসে ঘুমিয়ে কাটানো?

* বকাসুর

পুল্লিভাই কীন্ডনৈপ্ পল্লা অরক্কনৈ
কিল্লিক্ কলৈন্দানৈ পাডিপ্পোই,
পিল্লৈহল্ এল্লরুম্ পাভৈক্ কলম্ পুক্কার
তেল্লি এণ্ডপ্ ভিরাশম্ উরঙ্গিইরু।
পুল্লম্ সিলম্বিন কান্ পোদরিক্ কনিনাই।
কল্লক কুলিরক্ কুডৈপ্ নীরাডাদে,
পল্লিক্কিডত্তিয়ো? পাডাই নী। নম্বালাল
কল্লম্ তভিন্দপ্ কলন্দেল্ ওরেমপাডাই।

১৪

তোমাদের প্রাসাদের পিছনে
বাগানের সরোবরে
লাল শালুকটি ফুটল
আর সাদা শালুকটি চোখ বুঁজল।
শুভ্রদর্শন ও গৈরিকধারী ব্রতচারীরা
শাঁখ বাজাতে মন্দিরে ঢুকছে।
ওগো মেয়ে
কে তোমায় শক্তি যোগাল
প্রখর এসে আমাদের জাগিয়ে দিতে?
তোমার লাজনম্রতার বালাই নেই,
অথচ কথায় তোমার ফুল ফোটে।
উঠে তাঁর নামগান করো
যিনি আপন প্রশস্ত করে ধরেছেন শঙ্খ ও চক্র,
যাঁর চোখদুটি পদ্মকলি বলে ভুল হয়।

উঙ্গল্ পুশক্কডৈৎ তোট্টিত্তু ভাভিয়ুল্
সেঙ্গাত্তনীর ভাইনেদিত্তপ্পু থায়্পল্ভাই কুবিন কান্
সেঙ্গল্ পোড়্ডিক্কুরৈ তেন্পল্ তত্তত্তর,
তঙ্গল তিরুক্কোয়িল্ সঙ্গিডু ভন্ পোতপ্পার।
এঙ্গলৈ মুন্নেত্তপুভান্ ভাই পেন্নম
নাঙ্গাই। এত্তপ্পিরাই। নান্মাদাই। নাডুডৈরাই!
সঙ্গোডু সক্করম্ এন্দুম্ তডক্কৈয়ন্
পঙ্গয়ক্কন্নানৈপ্ পাডেল্ ওরেমপাতাই।

১৫

—তরুণী টিয়া, এখনো ঘুমিয়ে আছো ?
—লক্ষ্মী মেয়েরা, অত নিম্নস্বরে ডেকো না,
আমি এই এলাম বলে।
—তুমি অসাধারণা, তোমার ভাষাতেই তা প্রকাশ।
তা ছাড়া আমরা তো দেখেছিই
তোমার কথার কি তেজ।
তোমরাই অসাধারণা।
তবে তোমাদের যদি ইচ্ছা
তবে আমিই না হয় তা বলাব।
—তাহলে এসে পড় তাড়াতাড়ি,
কোন জিনিস তোমাকে এখানে এরকম টেনে নিয়েছে ?
—সবাই এসে গিয়েছে ?
—হ্যাঁ, নিজে এসে শুনে দেখ।
শীঘ্র এসে করীদমন সেই বীরের নামগান করো,
যে-রহস্যময়
সকল অরিকে বিনাশ করবার ক্ষমতা রাখেন।

এল্লে ইলন্‌কিলিয়ে ! ইন্নুন্ উরঙ্গুদিয়ো ?
সিল্লেন্নরশৈয়েন্নিন্, নঙ্গইমীর ! পোদন্‌ক্কিন্রেন
ভল্লৈ উন্ কট্টুরইহল। পণ্ডে উন্ ভাইয়াম্বিদুন্।
ভল্লীরহল নিঙ্গলে। নানেদান্ আইদুহ।
ওল্লৈ নি পোদাই, উনক্কেন কেরুদৈয়াই ?
এল্লাক্কুম্ পোশ্শায়ো ? পোশ্শায় পোশ্শোন্নিকোল্।
ভল্লানৈক্ কোন্‌রানৈ, মাত্রারৈ মাত্রশিক্ক
ভল্লনৈ, মায়নৈপ্ পাডেল্ ওরেম্‌পাভাই।

১৬

আমাদের রাজা নন্দগোপের প্রাসাদরক্ষী তুমি।
নিশানমালায় শোভিত যে-দ্বারে তুমি রক্ষী
তার চূড়ায় উড়ছে রাজপতাকা।
ওই ঘন্টাযুক্ত তোরণের অর্গল খুলে দাও।
আমরা কিশোরী গোপী,
গতকালই রহস্যবরাটি কথা দিয়েছেন
সুধাকর তমুরাটি আমাদের দেবেন।
আমরা এসেছি পবিত্রতায় পূর্ণ হয়ে
তাঁরই নামগানে তাঁকে জাগাবো বলে।
প্রভু, তোমার সুমুখে যেন প্রত্যাখ্যানের কথা না সয়ে।
খুলে দাও এই দরজা
যার এত অর্গল সুবিন্যস্ত বাঁধা।

নাইয়কনাই নিন্ন নন্দগোপনুডৈয়
কোয়িল কাপ্পাণে। কোডিতোনরুন্ তোরণ
তান্নিল কাপ্পাণে। মণিকৃকদভ্ অনতিট্টভাই।
আইয়ন্ সিরুনিরয়োমুক্কু অয়ৈপরৈ
মায়ন্ মণিবন্নন্ নেন্নুতে তাইনেয়্ন্দন্,
তুইয়োমাই তন্দোন্, তুইলেপণ্ পাড়ুবাণ্;
তাইয়ান মুন্ন মুন্নন্ নাত্রাদে অন্ন। নী
নৈয় নিলৈকদভ্ নিক্কেল্ ওরেয়্পাডাই।

১৭

দেব নন্দগোপ,
তুমি যে অন্য বস্তু জল দান করো,
ওঠো জাগো।
দেবী যশোদা,
নারীকুলরত্ন তুমি তনুখানি ধরেছ কোমল লতার মতো,
আমাদের কুলদীপিকা, জাগো।
দেবাধিপতি,
তুমি যে অতিকায় হয়ে ত্রিলোক পরিমাপ করেছিলে,
তুমি আর ঘুমিও না, ওঠো।
কুমার বালদেব,*
সোনার বলয় তোমার পায়ে,
আর ঘুমিও না তোমার গুণধর ভাইটির মতো।

* বলরাম

অম্বরমে, তন্নিরে সোরে অরুলসেইয়ুম্
এম্‌পেরুমান্ নন্দগোপালা! এণ্ডুন্‌দিরাই।
কোম্বানারকেল্লাম কোত্তলে। কুল ভিল্লুকে!
এম্‌পেরুমট্টি! যশোদা ইয়ম্মতোকরাই
অম্বরম্ উডুরুৎ তেঙ্গে উলহলন্দ
উম্বর্ কোমানে! উরুক্কাদু এণ্ডুন্‌দিরাই।
সেম্পোন্ কমলদিহ্ সেলভা। পলদেবা!
উম্বিয়ুম্ নীয়ুম্ উয়ঙ্গেল ওরেম্পাভাই।

১৮

খাত ভরতি যাঁর হাতির পাল,
অমন যাঁর বৃষস্কন্ধ
সেই নন্দগোপনের তুমি পুত্রবধূ।
সুরভিত কেশ তোমার মল্লিনূ,
এবার দুয়ার খোলো।
নূরগীর ঝাঁক ছড়িয়ে পড়েছে,
তারা সুর ধরেছে।
শতকণ্ঠে দলবদ্ধ কুয়িলরাও* ডাকছে মাধবীকুঞ্জে।
তুমি ওই আঙুলে গুটি খেলায় রত।
এসো এবার সানন্দে কাঁকন বাজিয়ে,
রক্তপদ্মের মতো নিজের হাতে খুলে দাও দ্বার,
তোমার প্রিয়তমের নামগানের জন্য।

* কোকিলরা

উন্দু মদকলিত্রণ ওডাদ তোল্‌ভলিয়ন্,
নন্দগোপালন্ মরুমহলে। নল্লিনৈ।
কন্দম্ কমওম্ কুণলি কডৈ তিরভাই
ভন্দেওম্ কোনি অশতন কান্; মাধবীপ্
পন্দল্‌মেল্ পল্‌কান্ কুয়িলিনাঙ্গল্ কুডিনকান,
পন্দার্ তিরলি! উন্ মৈম্বুনন্ পোরপাডচ্
সেন্দামরৈক্‌কৈরাল সিরার ভৈলেরোলিপ্‌প
তন্দু তিরভাই, মহিন্‌ন্দেল্ ওরেন্‌পাভাই।

১৯

খোলো তোমার মুখ,
তুমি ঝাড়বাতির আলোয় আলোকিত
গজদন্তের পদযুক্ত পালঙ্কে
পেঁজা তুলোর তোশকের ওপর শুয়ে রয়েছ,
তোমার বিশাল বক্ষের ওপর নপ্পিনুর বক্ষ,
আর অলকদামে কুটন্ত ফুলের গুচ্ছ।
তোমার টানা চোখ গভীর কালো,
কাল বয়ে যায়
তবু তুমি তোমার পতিতকে জাগাতে সাহস পাওনা!
তার কাছ থেকে বিচ্ছেদ তুমি সইতে পার না,
হোক না তা এক নিমেষের জন্য।
এ তোমার পক্ষে শোভা পায় না আদৌ।

কুর্ত্ত তিনক্কেয়িন্ক্ কোট্টুক্কান কট্টিলবেন্
নেত্তেন্ত্র পন্দ্র শয়নত্তিন মেলেরিক্
কোত্তলর পুত্তুশল নপ্পিনৈ কোঙ্গৈমেল
তৈত্তুক্কিড়ন্দ বলর্ মার্বা। তাইতিরত্তাই
বৈত্তড়ক্কনিয়ৈ। নী উন্ মনলনৈ
এত্তনৈ পোদুম তুয়িলেশ ওত্তাই কান্,
এত্তনৈ এলুম্ পিরিতাত্র হিল্লাইয়াল্
তত্তুতন্ অন্দ্র তহতেন্ ওরেপ্পাতাই।

২০

বীরচূড়ামণি তুমি এসে
বত্রিশজন দেবতার ত্রাস দূর করেছিলে।
তুমি ন্যায়নিষ্ঠ ও দুঃসাহসী।
জাগো।
অনিন্দ্য তুমি
শত্রুর হৃদয়ে আনো ভয়ের থরহরি কম্প।
জাগো।
নপ্‌পিন্ন, দেবী আমাদের তুমি,
তন্বী তোমার দেহ,
ওষ্ঠাধর লাল টুকটুকে,
স্তনযুগল কনক কটোরি।
তুমি লক্ষ্মী।
জাগো।
আমাদের দাও চামর, দর্পণ,
তোমার দয়িতকেও,
আর দাও এবার আমাদের পুণ্যস্থানে যেতে।

নুপত্তু নুভর্ অবরর্‌কু মুর্ণ সেন্‌নু
কপ্‌পন্ তভিরকুন্ কলিয়ে। তুয়িলেশাই।
সেপ্‌পন্ উডইয়াই। তিরলুডৈয়াই। সেত্রর্‌কু
ভেপ্‌পন্ কোড়্‌ক্‌কুন্ বিলা। তুয়িলেশাই।
সেপ্‌পন্ন মেন্‌নুনৈচ্ সেভাই সিনুমরুন্দুল
নপ্‌পিন্নৈ নঙ্গাই। তিরুমে। তুয়িলেশাই।
উক্‌কমুন্ তট্টোলিমুন তন্দুন্ মনালনৈ
ইপ্‌পোদে এম্মৈ নীরট্টেল ওরেন্‌পাডাই।

২১

তুমি তাঁর ছেলে
যাঁর বহু হৃষ্টপুষ্ট ও শান্তশীল গোরু—
তারা নির্দিষ্ট ভাঁড় সব ভরে উপচে না পড়া পর্যন্ত
দুধ ঢেলেই চলে।
জাগো তুমি।
প্রবল তুমি।
মহৎ তুমি।
সারা জগতের প্রত্যক্ষ দীপশিখা তুমি!
জাগো।
তোমার প্রশস্তি গেয়ে
তোমাকে প্রচার করে
আমরা এসেছি যেন তোমার শত্রু,
তবে শক্তিহারা হয়ে তোমারই দ্বারে,
নিরুপায় বলে তোমারই পায়ে লুটিয়ে পড়তে।

এত্র কলঙ্গল্ এদিরপোজি মীদলিপ্প
মাত্রাদে পাল্ সোরিযুন্ তল্লুপ্ পেরুন্ পেরুক্কল্
আত্রপ্ পডৈত্তান্ মহনে। অরিতুরাই!
উত্রম্ উডৈআই! পেরিয়াই! উলহিনিন্
তোত্রমাই নিন্ন শুডরে! তুরিলেশাই!
মত্রার্ উনক্কু তলিতোলৈপুন ভাসর্ক্কন্
আত্রাদু তপ্পুন্ আদিপনিয়ু নাপোলে,
পোত্রি যাম্ তন্দোম্ পুহশ্লেল্ ওরেম্পাতাই।

২২

রাজা আমরা এই সুন্দরী বিপুলা পৃথ্বীর,
সব অহঙ্কার জলাঞ্জলি দিয়ে
এসেছি তোমার কাছে,
তোমাকে ঘিরে বসেছি
তোমার সিংহাসনের পায়ের তলায়।
ঘুনচির গায়ে একটু কাচলের মতো
দয়া করে ধীরে ধীরে খুলবে তোমার
মধুর ওই কমলোপম নয়নযুগল ?
পূর্বোদিত চন্দ্রসূর্যের মতো ওই দুটি অনুপম চোখে
যদি আমাদের দিকে তাকাও
তবে আমাদের সব পাপস্খালন হয়ে যাবে।

অঙ্গন্ মান্শানৎ তরসন্ অবিনান
ভঙ্গনাই ভন্দু নিন্ পল্লিক্ কট্টিয়কিন্
সন্নন্ ইরুপ্পারপোল্ ভন্দু তলৈপ্পেয়ুদোন্।
কিঙ্কিনি ভাইচেচুদ আমরৈপ্ পুপ্পোলে
সেঙ্গন্ সিরুচিচিরিযে এন্নেল তিশিয়াতো ?
তিরুনুন্ আদিত্যানুন্ এন্তন্দারপোল
অঙ্গন্ ইরুনুন্ কোত্তেজন্ মেল্ নোক্কুডিয়েন্
এঙ্গন্ মেল্ শাপন্ ইশিপ্পেন্ ওরেন্পাভাই।

২৩

বর্ষাকালে যে সিংহ পাহাড়ের গুহায় ঘুমিয়ে কাটায়
সে যেমন পরে জেগে ওঠে,
জলন্ত চোখ মেলে,
সুবাস কেশর দোলায়,
গা ঝাড়া দেয়,
ওৎ পেতে বসে আবার উঠে দাঁড়ায়,
গর্জন করে তার গহ্বরের বাইরে আসে,
নীল পুভাই-বরণ তুমি তেমনি এসো
তোমার নিভৃত নিলয় ছেড়ে,
এসে বসো তোমারই জন্য স্থাপিত এই রাজসিংহাসনে,
আমাদের এই তীর্থাগমনের উদ্দেশ্যটি বুঝে
তোমার করুণা বর্ষণ করো আমাদের ওপর।

মারি মলৈমুশিন্‌ঞিল মন্নিক্‌ কিডন্দুরঙ্গুম্‌
সীরিয় সিঙ্গম্‌ অরিত্তুত্তিভিশিন্তু
তেরি মরিয়ু পোদ এপ্পাড়ুম্‌ পোন্দুদরি
মুরি নিনিন্দু মুশঙ্গিপ্পুরপত্তুপ্‌
পোদরুমাপোলে, নী পুভৈপ্পূ ভন্না। উন্‌
কোয়িল নিন্নিন্দনে পোন্‌ড্‌লিক্‌ কোপ্পুডৈয়
সীরিয় সিংহাসনিত্তুন্‌ড়ু ইয়ামবন্দ
কারিয়ম্‌ আরাম্বলেল ওরেম্বাভাই।

২৪

তুমি ত্রিলোকের বাপ নিয়েছ,
তোমার চরণ বন্দনা করি!
তুমি দক্ষিণে লঙ্কা ধ্বংস করেছ,
তোমার বীরত্ব বন্দনা করি।
তুমি এক পদাঘাতে চক্র চূর্ণ করেছ,
তোমার খ্যাতি কীর্তন করি।
তুমি একটা বাছুরকে* গদার মতো ছুঁড়ে দিয়েছিলে,
তোমার চরণ বন্দনা করি।
তুমি ছত্ররূপে তুলে ধরেছিলে গোটা একটা পর্বত,
তোমার মহিমা গান করি।
তোমার হাতের যে পুল অরিকে দমন ও নিধন করে,
তাকে ধন্য ধন্য করি।
তোমার কীর্তিকথা একের পর এক গেয়ে
অবশেষে পৌঁছালাম এই তোমার কাছে তমুরা নিতে।
তোমার ঔদার্য ঢেলে দাও আমাদের ওপর।

* বৎসাসুর

অন্‌রিভ্ তুলহন্ অলপ্পাই। অদিপোত্রি,
সেন্রুন্ন তেন্নিলঙ্কৈ সেত্রাই তিরল্ পোত্রি,
পোনরচ্ সহডন্ উদৈত্তাই। পুহল্ পোত্রি,
কন্‌রু কুনিল্ল এরিন্দাই। কশল্ পোত্রি,
কুনরু কুডইয়াই এডুত্তাই। গুণম্ পোত্রি,
তেন্‌রু পদৈ কেডুক্কুম্ নিন্‌কোদিল্ ভেল পোত্রি,
এনরেন্‌রুন্ সেভকমে এত্তিপ্ পরৈ কোলভান্
ইন্‌রুইয়ান্ বন্দোম্ ইয়ঙ্গেল ওরেম্পাভাই।

২৫

এক রমণীর পুত্র হয়ে জন্মে
সেই রাত্রেই অন্য এক নারীর সন্তান হলে,
পালিত হলে গোপনে।
কংস তা সহ্য করতে না পেরে
বের হল তোমাকে বধ করতে,
কিন্তু তুমিই গেলে তার মতলবের সামনে দাঁড়িয়ে দিতে,
তুমি যেন তার উদরে জ্বলন্ত অঙ্গার।
দেবচূড়ামণি বিষ্ণু।
তোমার কাছে মিনতি করছি।
যদি তম্বুরাটি দাও
তাহলে গান গেয়ে বেড়াব,
আর লক্ষ্মী যে তোমার ঐশ্বর্যের এত প্রশংসা করেন
এবং তোমার যত মহৎ কীর্তি—
সকল দুঃখের অবসানে তার অংশ ভোগ করব।

ওরুত্তি মহনাইপ্ পিরপ্পু ওরিরভিল্
ওরুত্তি মহনাই ওলিপ্পু ভলর
তরিক্কিলানাহিৎ তান্ তিরু নিনৈপ্প
করুত্তৈপ্ পিশৈপিভুক্ কঞ্জন্ তৈরত্রিল্
নেরুপেন্ন নিন্ন নেডুমালে! উন্নৈ
অরুত্তিত্তু ভন্দোন্ পত্তৈ তরুদি আহিল্
তিরুত্তক সেল্‌ভমুন্ আন্ পাডি
তরুত্তুমুন তিরুপ্পু মহিপ্পেল ওরেমপাভাই।

২৬

নীলকান্তমণির মতো তোমার রং, বিষ্ণু।
যদি জানতে চাও তাহলে বলি
পৌষোৎসবের জন্য কী কী দরকার।
চাই শঙ্খ
যা দেখতে হবে দুধের মতো
তেমন সাদা যেমন তোমার পাঞ্চজন্য,
যার আরাবে সারা মেদিনী কাঁপবে;
বিরাট বিরাট তম্বুরা
যাদের আওয়াজ পৌঁছাবে দূরদূরান্তরে;
দীর্ঘায়ুকারী গায়কের দল;
মনমাতানো প্রদীপমালা;
পতাকার সমুদ্র আর চাঁদোয়ার ভিড়।
বটের পাতায় শায়িত তুমি,
অনুগ্রহ করে এসব দাও আমাদের।

মালে। মণিভণ্ণা। মারহণি নীরাডুতান্
নেলৈয়ার্ সেই তনহন্ তেণ্ডুতণ কোট্টিয়েল্:
জালত্তৈ এল্লাম্ নডঙ্গ মুরন্তণ
পালন্ত তন্তুল্ পাঞ্চ সন্নিয়মে
পোলতণ সঙ্গনঙ্গল্ পোয়প্পা ডুভৈয়ণতে
সালপ্পেরুম্ পৈয়রে, পল্লাণ্ডিসৈপ্পারে
কোন তিলক্কে, কোডিয়ে, কোডিয়ে, তিদাণবে
আলিন ইলৈয়াই। অরুলেলো এম্বাভাই।

২৭

গোবিন্দ, সকল অরিকে দমন করে তোমার বীর্য
তোমার স্তুতি গেয়ে
তোমার কাছ থেকে তমুরা পেয়ে
এই আমাদের লাভ :
বুক ফুলিয়ে গটমটিয়ে বেড়াব আমরা
এমন নানা অলংকারে সেজে—
বালা, বাজুবন্ধ, ফুলকুণ্ডল, মল, আরো কত কি :
তারপর রসে টইটুম্বুর হয়ে
দল বেঁধে বসব পায়েস খেতে,
তাতে ঢালব এত ঘি যে কনুই বেয়ে
তা গড়িয়ে পড়বে।
সকলে ধন্য ধন্য করবে আমাদের।

কডারৈ ভেল্লুম্ সিক্ গোবিন্দা। উন্নৈপ্পণিপ্
পাডিপ্ পরৈ কোণ্ডুরাম্ পেরু সম্মপম্,
নাডু পুহত্তম্ পরিসিনাল্ নণ্ণহ,
সূডাহমে তোলতলৈয়ে তোডে সেভিপ্ পুতে
পাডহমে এন্নৈয়ে পল্কলপুম্ নামপিভোম্ :
আডৈ ইয়ুডুপ্পোম্, অদপ্পিণ্ণে পারচোরু
মুড নেই পেইডু মুপ্পৈ তপিভারক্
কডি উরুপ্পু কুলীর্পদেলো রেম্বাডাই।

২৮

দুগ্ধবতী গাভীদের অনুসরণ করে
আমরা যাব বনে,
সেখানে জমিয়ে বসাব আনন্দের হাট।
রাখাল হয়ে জন্মেছ ব'লে
আহ্লাদে আমরা আটখানা,
মনে তোমার বিদ্বেষ বলে তো কিছু নেই।
গোবিন্দ, নিখাদ তুমি,
তোমার সঙ্গে আমাদের বন্ধন
কখনো যেন না ছিঁড়ে যায়।
আমরা, অবোধ তরুণী আমরা,
যে-প্রেম তুমি আমাদের অন্তরে ঢেলেছ
তাতে মাতাল হয়ে
কত না তুচ্ছ নামে যে তোমায় ডেকেছি।
আমাদের ওপর অপ্রসন্ন হয়োনা, প্রাণেশ,
তরুরা দান কর আমাদের।

করবৈহল্ পিন্ সেন্রু কানম্ সের্ণদুণপোর্
অরিভোণ্ক্রনিল্লাদ ঐকুলম্ উণ্ণরনৈপ্
পিরভি পেরুন্দনৈ পুণিয়ন্ যামুদৈয়োম্।
কুরৈভোনরু নিল্লাদ গোবিন্দা। উন্নরন্নো
ডুরভেল নমক্কিন্ধোশিক্কা উশিরাদু,
অরিয়ন পিন্নৈহলোর্ অন্বিনাল্ উন্নরৈল্লৈচ
সিরুপের্ অশৈত্তনভুম্ সেরি অরুলাদে,
ইরৈত্তা। নিত্তরাই পয়ৈয়েন ওরেম্বাবাই।

গোবিন্দ, শোনো, কী উদ্দেশ্যে এই সাত সকালে এসে
কমলোপম তোমার ওই চরণযুগল
বন্দনা করছি আমরা।
ধেনুচারণ জীবিকা যাদের
তাদের মধ্যে জন্ম নিয়ে
আমাদের দাসীরূপে গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ
তোমার পক্ষে অসম্ভব।
এখন আমরা এলাম,
তম্বুরাটি না নিয়ে ছাড়ছি না।
আমরা চাই শুধু তোমার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা,
আবহমানকাল ও আগামী সকল আবির্ভাবে
তোমারই সেবায় জীবন-ধারণ।
আর সব বাসনা মুছে যাও আমাদের অন্তর থেকে।

পিত্রম্ পিরুকাল তন্দুন্নৈচ্ সেভিয়ুন্
পোত্রমরৈয়াদিয়ে পোত্রম পুরুল কেলাই;
পেত্রামেইপ্পুন্নুম্ কুলত্তিল পিরপ্পু নি
কুত্রেভল এন্দৈক্ কোল্লমন্ পোহাদু;
ইত্রৈপ্ পরৈ কোল্বতান্ অন্ত্র কান গোবিন্দা।
এত্রৈক্কুম্ এশেম্ পিরবিক্কুম্ উন্নুডু
উত্রোমে ইয়াভোম্, উনক্কেনাম্ আৎসেইভোম্
মত্রেনম্ কামঙ্গল মাত্রেল্ ওরেম্বাভাই।

৩০

চারটি স্কন্ধ যাঁর চারটি পর্বতের মতো,
পদ্মপলাশলোচন যিনি,
যিনি মধুরানন,
সকলের ওপর বর্ষিত হোক তাঁর করুণা,
সকলে আনন্দমগ্ন হোক,
সকলে যারা এমনভাবে নির্ভুল পাঠ করবে
সঙ্গম-সাহিত্যের অন্য মূল্যবান কৃতির মতো
এই তিরিশটি তাবিল স্তোত্রের মালা,
রমণীয় পুদুভাই নগরীর পট্টচক্রিয়ানের কন্যা
সুন্দর শালুক ফুলের মালা গলায়
অণ্ডালের এই রচনা,
এই তিরিশটি স্তোত্র
যা বর্ণনা করেছে
মণিমুক্তায় সেজে কী ভাবে চন্দ্রমুখী কিশোরীরা
মাধবের কাছে এসেছে,
যিনি মন্থন করেছিলেন তরীবেলাবৃত সমুদ্র,—
পেয়েছে কেশবের পূজা ক'রে
তাঁর কাছ থেকে তমুরা।

তঙ্গক্ কডল্ কডৈন্দ মাদতনৈক্ কেশতনৈৎ
তিঙ্গল্ তিরুমুহত্তুচ্ চেইশাইয়ার সেইনরিরৈণ
অঙ্গপ্ পরৈকোও আত্রৈ অনি পুদুভৈপ্
পইঙ্গ কমলৎ তন্তেরিয়ন্ পত্তরূপিরান্ কোদৈ সোন্ন
সঙ্গৎ তনিন্ মালৈ মুপ্পদুম তপ্পামে
ইঙ্গিপ্ পরিস্সুরৈপ্পার ইরিরন্দু মাল্ভরৈৎ তোল্
সেঙ্গন্ তিরু মুহত্তুচ্ সেরলতৎ তিরুমালান্
এন্দুম তিরুভরুল্ পেত্রিন্পুরুড রেম্বাভাই।

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

মার্চ ১৮, ১৯৫৩

প্রশ্ন ১৯২৯-এর কথাবার্তা থেকে—"আমরা শুধু আমাদের সত্তার সামান্য একটু তুচ্ছ অংশের কথাই জানতে পারি।" কি কি অংশ তুচ্ছ?

উত্তর : প্রায় সবই।

এমন জিনিস কমই আছে যা তুচ্ছ নয়; তোমার যত রকমের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, যত কিছু চিন্তা, সংবেদন, ক্রিয়াস্পন্দন, সবই অতি তুচ্ছ। কেবল কোন সময়ে যখন উচ্চ চেতনার কিছু ঝিলিক আসে চৈত্যের ভিতর দিয়ে, একটা সংস্পর্শ ঘটে আন্তরিক সত্তার সঙ্গে, আর কোথাও একটা উন্মীলন ঘটে যায় (যা থাকে মাত্র এক মুহূর্তের জন্য), কেবল সেই মুহূর্তটিতে আর তা তুচ্ছ নয়। তা ছাড়া আর যা কিছু সবই ঘটছে একই জিনিসের লক্ষ লক্ষ বার নকশো করার মতো পুনরাবৃত্তি। তোমার যত দেখাশোনা, যত কিছু করা, প্রতিক্রিয়া করা, চিন্তা করা, বোধ করা সবস্তই মামুলী। তুমি ভাবো যে তুমি বুঝি অসাধারণ, বিশেষত যখন কোনো অসাধারণ রকমের বোধ বা অনুভব আসে—তখন ভাবো যে তুমি উপরে উঠে গেছ, কোনো অমানুষিকের নাগাল পাচ্ছ; কিন্তু সে তোমার ভুল ধারণা, তাও খুব সাধারণ, নিতান্ত সাধারণ ছাড়া আর কিছু নয়। ওর চেয়ে আরো গভীরে যাওয়া চাই, নিজের গভীরে এমন কিছুর সন্ধান পাওয়া চাই যা তুচ্ছ নয়।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে পূর্বজন্মে আমরা একত্রে মিলেছিলাম; কিন্তু যদি আমরা যোগ না করে থাকি, তবুও কি আমরা একত্রে এসে মিলতে পারি?

উত্তর : তা নাও হতে পারে।

কিসের প্রসঙ্গে ও কথা বলেছিলাম তা আবার মনে পড়ছে; একটি মেয়ে তখন এখানে এসেছিল, সে জানতে চেয়েছিল যে কেমন করে সে এখানেই এসে হাজির হলো...যা বলেছিলাম তা সাধারণভাবে ঠিকই; লোক পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকে পরস্পর থেকে কতই তফাতে তফাতে। ঘটনাচক্রে এখানে তারা

একত্রে মিলিত হয়, তার মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই হয় যে আগেও তারা কোনো জন্মে একত্রে মিলেছিল (একই জন্মে নয়), তাদের চৈত্যসত্তা ভিতরে ভিতরে বোধ করছে যে তারা এক পরিবারভুক্ত, এবং তারা একত্রে মিলে কাজ করবে ও পরস্পরের সহযোগিতা করবে। এই কারণেই যদিও তারা তফাতে তফাতে জন্মেছে, তথাপি কোনো কিছুর টানে একত্রে মিলে গেছে; এর পিছনে রয়েছে চৈত্য, চৈত্যের চেতনা। সেই চৈত্যসচেতনা যদি এমন হয় যাতে তা জীবনের ঘটনাসংস্থানকে প্রভাবিত করে, অর্থাৎ যদি তা বাহ্যশক্তি বা বাহ্য জীবনস্রোতের দ্বারা বাধা না পায়, তাহলে তারা এইভাবে মিলে যাবেই।

বাস্তবের দিক থেকে একথা খুবই সত্য এমন সব সত্তারা আছে যারা এক একটা বৃহৎ গোষ্ঠিভুক্ত, তারা এখানে এসে একই লক্ষ্যে কাজ করবার জন্য অনেক সংখ্যায় যেন দল বেঁধে চলে আসে। চৈত্য জগতে যেন এক এক সময়ে তারই জন্য একটা সাড়া জাগে; ঘুমন্ত ছেলেদের মতো তাদের জাগিয়ে তুলে বলা হয় "যাও যাও, সময় হয়েছে, ঝট্‌পট্ সব নেমে পড়ো।" তখন তারা একত্রেই নেমে আসে। তবে এক জায়গাতে নয়, প্রায়ই ছড়িয়ে পড়ে। অথচ ভিতরে ভিতরে তাদের মধ্যে একটা কিছু যোগ থেকে যায়, তাতেই কোনো কিছু অঘটনাতে তাদের টেনে এনে একত্রে মিলিয়ে দেয়। কিন্তু সেটা সত্তার গভীরের ব্যাপার, বাইরের কিছু নয়; তাই লোকে একত্রে মিলিত হলেও এ বন্ধন তারা টের পায় না। কেবল পরস্পরকে ততটুকুই চিনতে পারে যতটুকু চৈত্যচেতনা তাদের জাগে এবং তারই নির্দেশে তারা চলে; নতুবা অনেক কিছুই তার প্রতিরোধ করে, পর্দা আড়াল করে দেয়, বিভ্রম ঘটিয়ে দেয়, বিস্তর বাধা আসে যাতে গভীরতায় পৌঁছনো যায় না, মূল কাজে সহযোগিতা করতে দেয় না। নানা প্রাকৃতিক শক্তিতে তোমাদের ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত করে দেয়।

এর মীমাংসার একমাত্র সদুপায় হলো আপন চৈত্যসত্তাকে জানতে পারা এবং একবার জানা হলে তাকেই আঁকড়ে থাকা, যতরকম বাধাই আসুক, কেবল তারই নির্দেশে পদে পদে অগ্রসর হওয়া। এই হবে একমাত্র উপায়।

এ সকল কথা সে সময়ে আমি লিখিনি, কিন্তু সেই মেয়েটিকে মুখে বলেছিলাম। তার প্রশ্ন ছিল: "এখানে আমি হাজির হলাম কেমন ক'রে?" আমি তাকে বললাম, বাহ্য চেতনার কোনো কারণে নয়, আভ্যন্তর কোনো জিনিস তাকে এখানে টেনে এনেছে। কিন্তু তার সে জাগরণের টান তেমন প্রবল ছিলনা, তাই অন্যান্য বাহ্য টান থেকে জীবনযাত্রার অতি সাধারণ কারণে সে আবার সাধারণ জীবনে ফিরে গেল।

বাইরের দিক থেকে দেখলে একটা অদ্ভুত কারণকে উপলক্ষ ক'রে সে এখানে এসে পড়েছিল। অন্যান্য আরো পাঁচজনের মতো তার বয়সটা ছিল তরুণ, বাগ্‌দত্তা হয়েও

তার বিয়ে হয়নি। প্রত্যাশিত পুরুষটি বিবাহ ভেঙে দিয়েছিল। দুঃখকষ্টে থেকে ও প্রচুর কান্নাকাটি করাতে তার মুখশ্রী নষ্ট হয়ে গেল, মুখের চামড়াতে অনেক ভাঁজ পড়ে গেল। দুঃখ কালক্রমে দূর হলো বটে কিন্তু মুখের সৌন্দর্য আর ফিরলনা। খুবই চিন্তিত হয়ে সে তখন গেল কোনো বিশেষজ্ঞ প্রসাধকের কাছে। সে বললে, প্যারাফিন ইন্‌জেকশন দিলেই মুখের ভাঁজ মিলিয়ে যাবে। "আর কখনো ভাঁজ পড়বেনা।" ইন্‌জেকশন করা হলো, কিন্তু তার ফলে মুখের স্থানে স্থানে চিবির মতো হয়ে ফুলে রইল। তখন ইংলণ্ডের জনৈক হাতুড়ে তাকে বললে "তুমি ভারতে চলে যাও, সেখানকার বড়ো বড়ো যোগীরা সব ঠিক ক'রে দেবে।" তাই শুনেই সে এসেছে। সে এখানে এসে প্রথমেই আমাকে বললে "এই দেখুন আমার মুখের কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে, আপনি আমার মুখের সৌন্দর্য ফিরিয়ে দিতে পারবেন?" আমি বললাম, না। তখন সে আমাদের যোগ সম্বন্ধেই অনেক প্রশ্ন করতে লাগল, এবং উত্তর শুনে চমৎকৃত হলো। তার পরে বললে: "আমি এসেছিলাম এই বিকৃতি সারিয়ে নিতে, কিন্তু আপনার কাছে এ সব কথা শুনে খুব আশ্চর্য বোধ করছি। তবে প্রকৃতপক্ষে এখানে কেন আমি এসে পড়লাম? নিশ্চয় তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ঠিক ঐটাই নয়।" তখন তাকে বুঝিয়ে বলি যে তোমার বাহ্য সত্তা ছাড়াও আর এক চৈত্যসত্তা আছে, সেই তোমাকে টেনে এনেছে, বাহ্য উদ্দেশ্যটা তারই আসল উদ্দেশ্যের অনুসরণ মাত্র।

কিন্তু মেয়েটি ছিল অদ্ভুত চরিত্রের। গোড়ার দিকে তার সব কিছুই ভালো লাগল, সকলের প্রতি একটা সৌজন্য ও শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করত: সকল ব্যক্তির সে ভালো দিকটাই দেখত, এমন কি একটা রাস্তার লোকের পর্যন্ত। কিন্তু এখানে থাকতে থাকতে তার চেতনা খুলে গেল, সে মানুষের সবগুলোই দেখতে শুরু করলে। একদিন আমাকে বললে: "আগে যখন চেতনা ছিলনা তখন সকলকেই ভাবতাম সুন্দর, সকলেই খুব ভালো! এখন এমন চেতনা আপনি আমাকে দিলেন কেন?" আমি বললাম "এর চেয়ে আরো এগিয়ে যেতে হবে, মাঝ পথেই এমন থেমে যেওনা।"

যোগের পথে একবার চলতে শুরু করলে শেষ পর্যন্তই চলে যাওয়া দরকার।

*

মার্চ ২৫, ১৯৫৩

প্রশ্ন পূর্বোক্ত কথাবার্তা থেকে—আপনি বলেছেন "খুব চৌকিয়ার থাকবে, যেন ভগবানের আচ্ছাদনের আড়াল নিয়ে নিজেরই কামনাগুলো মেটাতে না চাও?"

উত্তর : অনেকেই নিজের নিজের সুবিধামত এক একটা থিওরি গড়ে নেয়, অথবা বলে, "সবই হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছায়;" আবার কেউ বলে, "ভগবান আছেন সর্বত্র সব কিছুর মধ্যে, সব কিছু তিনিই করাচ্ছেন।" কেউ-বা বলে, "আমার ইচ্ছা মানে ভগবানেরই ইচ্ছা, আমার ইচ্ছাকে তিনিই জাগাচ্ছেন।" এমনি নানা জনে নানা থিওরি আওড়ায়, বলা বাহুল্য তাদের অহংটাও খুব জাগ্রত। তারা আপন ইচ্ছামত যা খুশি তাই করে আর বলে, "আমার ভিতর থেকে ভগবানই এটা করছেন।" তাদের মাথা থেকে যা বেরোয় তাই হয় "ভগবানের ইচ্ছা"। অর্থাৎ সে তাদের ব্যক্তিগত প্রেরণা নয়, "সবই হয় ভগবানের ইচ্ছাতে।" আমি কিছু করিনা, তিনিই করেন আমার ভিতর দিয়ে। এই সকল ব'লে তারা খুশিমত কাজ করে। এমন লোক অনেক আছে। সেইজন্যই বলেছি, "ভগবানের আচ্ছাদন দিয়ে আপন ইচ্ছাকে ঢেকোনা।"

প্রশ্ন : পূর্বোক্ত কথাবার্তা থেকে—আপনি বলেছেন, "আসল কথা ঐকান্তিক হওয়া। যদি ঐকান্তিক না হতে পারো তাহলে যোগের পথে পা দিও না।"

উত্তর বোধ করি ঐকান্তিক হওয়াই সবচেয়ে কঠিন কথা, আর সম্ভবত এই ঐকান্তিকতাই সব চেয়ে বেশি ফলপ্রদ।

পুরোপুরি ঐকান্তিক হতে পারলে জয়লাভ একেবারে সুনিশ্চিত। কিন্তু সেটা খুবই কঠিন। তেমন ঐকান্তিক হওয়া মানে সত্তার সকল অংশের যাবতীয় ক্রিয়া (বাহ্য ও আভ্যন্তর), সত্তার যাবতীয় উপাদান একমাত্র এই ইচ্ছা করবে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের হয়ে যেতে, কেবল ভগবানের জন্যই বাঁচতে, ভগবৎ-ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোনো ইচ্ছা পোষণ না করতে, ভগবৎশক্তি ব্যতীত অন্য কোনো শক্তি না পেতে।

ঐকান্তিক হলে তখন দেখবে যে এমন কোনো দিন বা ঘন্টা বা মিনিট নেই যখন তোমার মনে হচ্ছে না যে তোমার ঐকান্তিকতা আরো বাড়ানো চাই, আরো তার সংশোধন চাই—যেন ভগবানকে কোনোমতেই প্রবঞ্চনা করা না হয়। প্রথম কথা হলো নিজেকেই না ঠকানো। কারণ এ তো জানা কথাই যে ভগবানকে কখনো ঠকানো যায়না, এমন কি অতি ধুরন্ধর অসুরেও তা পারেনা। কিন্তু জিনিসটা বুঝতে পেরেও তুমি দেখবে যে নিজের জীবনে অজ্ঞাতসারে নিজে বহুবার নিজেকেই তুমি

ঠকাচ্ছ, আপনা হতেই। তুমি যা-কিছু করো এবং বলো তার সমর্থনে একটা অনুকূল কৈফিয়ৎ খাড়া করো। প্রথমে এই রকম হতে থাকে। স্থূল জিনিসের কথা, যেমন ঝগড়া করা এবং বলা "দোষটা ওরই",—এ সব নিয়ে আমি বলছিনা। আমি বলছি দৈনন্দিন জীবনেরই নানা খুঁটিনাটির কথা।

একটি শিশুকে দেখেছি, দরজাতে যেমনি তার মাথা ঠুকে গেল অমনি সে দরজাটাকেই মারলে লাথি। এ হলো তাই। দোষটা আমার নয়, ওর, ভুলটা ওই করেছে। শৈশব পার হয়ে যখন কিছু বুদ্ধি পেয়েছ, তখনও তোমরা নির্বোধের মত বলো "ও যদি অমন না করত তাহ'লে তো আমি এমন করতাম না।" অথচ হওয়া উচিত এর ঠিক উল্টো কথা।

একেই বলছি ঐকান্তিক হওয়া। ঐকান্তিক হলে অপর কারো সঙ্গে যখন থাকবে তখন সে ঠিক কাজ না করলেও তার প্রতিক্রিয়াতে তৎক্ষণাৎ তুমি ঠিক কাজটাই করবে। মনে করো একজন খুবই চটে গেছে; তথাপি তাকে আঘাত দেবার মতো কিছুই তুমি বলবেনা, বরং কথা না বলে শান্তভাবে চুপ করে থাকবে, তোমাতে যেন রাগের ছোঁয়াচ না লাগে। নিজের মধ্যে চেয়ে দেখবে যে সহজে এটা করতে পারছ কিনা। ঐকান্তিক হয়েছ কিনা গোড়ার দিকে এই তার একটা প্রাথমিক পরীক্ষা। স্থূল রকমের ঠাট্টা-তামাসাতে যাদের ছোঁয়াচ লাগে কিংবা অপর কারো বোকামি দেখেও যাদের ছোঁয়াচ লাগে তাদের কথা আমি বলছি না।

আমি বলি তোমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিজের মধ্যে চাইলে দেখবে যে সাধারণ ভাবে ঐকান্তিক হবো মনে করলেও দিনের মধ্যে শত শত বার তার ব্যতিক্রম করছ। তখন বুঝবে যে ঐকান্তিক হওয়া কত কঠিন।

আমি বলি তোমাদের যদি বাস্তবিকই ঐকান্তিক হও সত্তার সকল অংশ এবং দেহের সমস্ত কোষগুলি পর্যন্ত দিয়ে, আর যদি একান্তভাবে তোমার সমগ্র সত্তা ভগবানকে পেতে চায়, তাহলে জয়লাভ তোমার হবেই হবে, কিন্তু তার কমে হবেনা। একেই আমি বলি ঐকান্তিক হও।

স্থূল ভাবের কথা আমি বলছি না, যেমন, নিজের ইচ্ছা ও খেয়াল নিচিয়ে নিয়ে তুমি বললে "আমি তো আমার নয়, আমি হচ্ছি ভগবানের, তিনিই যা কিছু করছেন আমার ভিতর থেকে।" এটা নিতান্তই স্থূল রকমের প্রবঞ্চনা। আমি বলছি আরো মার্জিত ব্যক্তিদের কথা, যাদের এটুকু উন্নতি হয়েছে যে, তারা নিজের ইচ্ছাকে সূক্ষ্ম আবরণ দিয়ে ঢাকতে পারে।

দিনের মধ্যে তুমি কতবার কয়টা জিনিস, কয়টা ভাবনা, কয়টা ক্রিয়া করে থাকো যা খাঁটি রকমে ভগবানের দিকে আত্মোদ্ঘাটনকারক? কতগুলি কাজ তেমন হয়? সারা

দিনের মধ্যে একটিও যদি তা হয়ে থাকে তাহলে সেটিকে সাদা চাপা দিয়ে বিশেষ চিহ্নিত করে রাখতে পারো।

যখন বলি যে ঐকান্তিক হলেই তুমি জয়ী হবে, তার মানে সে হলো খাঁটি ঐকান্তিকতা নিত্য তার নির্মল শিখা জ্বলতে থাকবে পূজার অর্ঘের মতো, ভগবানের মধ্যে থেকে ভগবানের জন্যই বেঁচে থাকার যে তীব্র আনন্দ, তাঁকে বাদ দিয়ে কোনো কিছুই নেই, কোনো কিছুরই দাম নেই, কোনো কিছুরই অর্থ নেই,—চাই এই প্রেরণা, এই আস্পৃহা, যে পরমতম সত্যকে আমরা ভগবান বলি তার দিকে এই আত্মোন্মীলন—কারণ বিশ্বজগতের মধ্যে তোমার অস্তিত্ব হবার তাই একমাত্র হেতু। এটিকে বাদ দিলে সব কিছুই বাদ হয়ে গেল।

এপ্রিল ১৫, ১৯৫৩

প্রশ্ন : পূর্বোক্ত কথাবার্তা থেকে—আপনি লিখেছেন, "ভগবৎশক্তিকে জোর ক'রে টেনে আনতে যেওনা।" ভগবৎশক্তিকে কি জোর করে টানা যায়?

উত্তর : হাঁ, যদি তুমি তাকে তীব্র প্রয়াসের সঙ্গে ডাকতে থাকো, তীব্রভাবে তার জন্য আস্পৃহা করতে থাকো, তাহলে হয়তো খানিকটা তার নামিয়ে আনবে, কিন্তু তাকে সহ্য ক'রে হজম ক'রে নিতে পারবে না। খাদ্যের বেলা যেমন হয় ঠিক তাই। হাতের কাছে যা পেলে তাই যদি গপ্ করে গিলে নাও তাহলে তাতে তোমার গরহজম হবে, কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভরে উঠবে। সে খাদ্য তোমার সহ্য হবে না। তেমনি যদি তুমি এ বিষয়ে তাড়াহুড়ো কর, যে শক্তি আসবে ধীরেসুস্থে তাকে যদি তাড়াতাড়ি জোরের সঙ্গে অনেকখানি টেনে আনো তাহলে ঐ দশাই হবে।

দুরাকাঙ্ক্ষা যদি অল্পও কোথাও লুকিয়ে থাকে, তাতেই যথেষ্ট।...অনেকে কেবল যোগের জন্য যোগ করেনা, যোগ করতে যায় কোনো কিছু ফল পাবার জন্য, কোনো শক্তিলাভের জন্য, এটা ওটা কিছু জেনে নেবার জন্য।

প্রশ্ন : তাদের তো ঐকান্তিক বলা যায় না? তবে ভগবান কেন তাতে সাড়া দেন?

উত্তর : তুমি কি ভাবো যে ভগবানের বিচার মানুষের মতো সংকীর্ণ? মানুষের মতো মনোভাব ভগবানের উপর চাপাতে যেওনা।

তুমি যদি অকপট না হও, তাতে এই হবে যে তোমার নিজের চেতনা নিজেরই আবরণে ঢাকা পড়বে। যেমন মনে করো, কেউ একজন মিথ্যা কথা বলে; ওর ফলে তার চেতনা এমনই ঢাকা পড়ে যায় যে কিছুকাল পরে সে আর সত্য মিথ্যার প্রভেদ বুঝতে পারেনা। ছায়া দেখেও তাকে বলে সত্য। যে অসৎ হয় সে তার নিজেরই আত্মগ্রাহ্যকে হারায়, তার উপলব্ধিশক্তি লোপ পায়, তার বোঝবার, জানবার, বোধ করবার সম্ভাবনাও চলে যায়। এই হয় তার শাস্তি।

এর দ্বারা তুমি নিজের মধ্যে একটা আড়াল গড়ে তোলো, ভগবান আর নিজের মধ্যে একটা প্রতিরোধের ব্যবধান গড়ে তোলো। এই ভাবে নিজেকে নিজেই তুমি শাস্তি দাও। ভগবান নিজেকে সরিয়ে নেন না, কিন্তু তুমিই তাঁকে গ্রহণ করতে অপারগ হও। ভগবান স্বয়ং যে কোনো শাস্তি বা পুরস্কার দেন ভাবো, তা মোটেই নয়।

যদি তুমি কপট হও, বদ ইচ্ছা পোষণ করো, বিশ্বাসঘাতক হও, তৎক্ষণাৎ তুমি নিজেই নিজেকে শাস্তি দিতে থাকলে। কপট লোকরা নিজেদের সেই সামান্য চেতনাটুকুও হারিয়ে ফেলে যার দ্বারা তারা নিজেদের দোষটা টের পেতে পারতো; তারা যেন চেতনাহারা হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আর কোনো কিছুই জানতে পারেনা।

প্রশ্ন পূর্বোক্ত কথাবার্তা থেকে—আপনি এখানে কাকে বলেছেন "যাহা সত্তায় সমতার ভিত্তি?

উত্তর তা হলো যতটুকু স্বাস্থ্য, মজবুত দেহ যখন তুমি সামান্য কিছুতেই কচি খুকির মতো স্নায়ুদৌর্বল্যে কাঁপতে শুরু করবেনা, যখন তুমি ভালো ক'রে খাবে, ভালো ক'রে ঘুমোবে; যখন তুমি শান্ত অবিচল হয়ে থাকতে পারবে, নিজের ভারসাম্য বজায় রাখবে, তখন তাই হবে তোমার নিরেট ভিত্তি যার উপরে তুমি প্রচুর পরিমাণ শক্তিকে গ্রহণ ও ধারণ করতে পারবে।

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কিছু আধ্যাত্মিক শক্তি বা ভগবৎশক্তি লাভ ক'রে থাকো, যেমন ধরো আনন্দ, তাহলে সে আপন অভিজ্ঞতা থেকেই জানবে যে স্বাস্থ্যটি ভালো না থাকলে ও-জিনিসকে ধারণ করে রাখা যায়না। পেয়ে সে তখন চেঁচামেচি শুরু করে, কেঁদে ককিয়ে যা পেয়েছে তাকে বাইরে বের ক'রে ফেলতে চায়। তাই হেসে কেঁদে নানা ভঙ্গী করে তাকে প্রকাশ ক'রে ফেলতে হয়, ধরে রাখতে পারেনা, তাতে তার দমবন্ধ হয়ে যায়। তাই কোনোমতে হেসে কেঁদে চেঁচিয়ে তাকে তা উদ্গীরণ করতে হয়।

ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে, যা পেয়েছ তা হজম ক'রে নিতে হলে খুবই প্রশান্ত সুস্থির হয়ে থাকা চাই, ভিত্তি নিরেট হওয়া চাই, স্বাস্থ্য ভালো থাকা চাই। তার জন্য এরূপ নিরেট ভিত্তি থাকা খুবই দরকার।

প্রশ্ন : বাহ্য সমতা আর আন্তিক সমতার মধ্যে কি পার্থক্য ?

উত্তর : আন্তর সমতা হলো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। ওতে তোমার ভালো বা মন্দ যা কিছুই ঘটুক সমস্তকে সহিয়ে নেবার মতো শক্তি থাকবে, কোনো কিছুতে আদৌ ক্লিষ্ট বা কাতর, হতাশ বা বিচলিত বা উত্তেজিত হয়ে উঠবে না। যাই কেন হোক, তুমি নিজে থাকবে শান্ত, সমাহিত।

আর অপরটি হলো দেহের সমতা, সেটা মনস্তাত্ত্বিক জিনিস নয়, বরং তা বাস্তব ; দেহের দিকে দিয়ে অচঞ্চল থাকা, বিচলিত না হয়ে সমাগত শক্তিকে গ্রহণ করা।

এ পথে অগ্রসর হতে হলে দুই প্রকার সমতাই দরকার। আরো কিছু দরকার। যেমন, মানসিক সমতা—কত রকমের উল্টাপাল্টা রকমের ভাবনা চারিদিক থেকে আসতে পারে, তাকে আদৌ গ্রাহ্য করবে না। শুধু একবার দেখে নেবে, যথাস্থানে তাকে সরিয়ে রাখবে। এই হলো মানসিক সমতা।

একজন জিজ্ঞাসা করলে "রূপান্তর ঘটাতে বিলম্ব ও মন্থরতা হয় কার তরফ থেকে, মানুষের না ভগবানের ?"

আমি তার উত্তরে বললাম :

"মানুষ দেখে যে ভগবান তার প্রার্থনা শুনতে বিলম্ব করছেন।
ভগবান দেখেন যে মানুষ তাঁর প্রেরণা নিতে বিলম্ব করছে।
কিন্তু সত্য-চেতনার দিক থেকে যা হবার তা ঠিকই হচ্ছে।"

সকল ধর্মই পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র না হয়ে সবগুলি মিলে এক হওয়া উচিত।

শ্রীমা

প্রসঙ্গত

মে ২৪, ১৯৬৭

কাল আমার কাছে একজন এক প্রশ্ন লিখে পাঠিয়েছে :

"মোট কথায়, ভগবান কী"?

আমি এর জবাব দিলাম। বললাম, তোমার জন্যে আমি একটি জবাব লিখে দিচ্ছি, কিন্তু এমনি আরো একশো জবাব আছে যার প্রত্যেকটি নির্ভুল—

"ভগবান তাই যা হওয়া যায়
তবে বলা যায় না।"

এর পরে আরো লিখলাম, "কিন্তু তোমার প্রশ্নটি অনুযায়ী বলব :

"ভগবান তাই যা পূর্ণ পরিণতির চরম,
তাবৎ সকল অস্তিত্বের শাশ্বত উৎস
যার সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই ক্রমে ক্রমে,
এবং শেষে শাশ্বত কালের জন্য তাতেই হই পরিণত।"

একবার একজন আমাকে বলেছিল যে তার পক্ষে ভগবান জিনিসটা নিতান্ত অকল্পনীয় অচিন্তনীয়। আমি তাকে বললাম, "না, ঐ রকম ক'রে ভাবতে গেলে চলবে না। কেবল এই দিক দিয়ে ভাবো যে ভগবান সকল কিছুই (চূড়ান্তরূপে), ভগবান তাই যা আমরা শেষ পর্যন্ত হতে চাই, আমাদের সর্বোচ্চ ও সর্বোজ্জ্বল আশ্পৃহার দ্বারা। চরমভাবে যা হতে চাই তাই ভগবান।" উত্তর শুনে সে খুব খুশি হয়ে গেল, বললে : "ওঃ, তা বটে, এদিক দিয়ে দেখলে সহজ হয় বটে!"

কিন্তু যখন তুমি দেখতে পাও—মনের তৎপরতা থেকে বেরিয়ে যে অনুভূতি নিমন তার দিকে যখন চাও, আর নিজে নিজে বলো : কেমন ক'রে এর কথা বলা যায়? কেমন ক'রে এটা বোঝা যায়? তখন সে কথা খুব কাছাকাছি তোমার আয়ত্তের মধ্যে আসে তা এই রকম : এ সেই "একটা কিছু" যা হবার জন্য আমরা আশ্পৃহা করি, সহজাত প্রবৃত্তিতে আপনা হতে যেতে চাই তারই মধ্যে, তীব্র আশ্পৃহার দ্বারা (তীব্র এবং অজ্ঞান) সর্বতোভাবে কামনা করি তারই জন্য যা পরমাশ্চর্য। এই ভাবেই এসে পড়া যায় সেই "একটা কিছুর" কাছে, আর...মূলতঃ, তোমার চিন্তার দ্বারা এ সংযোগ ঘটেনা ; সংযোগ হয় তোমার নিজের সত্তার মধ্যে যে তেমনি একটা-কিছু রয়েছে অরই দ্বারা, যা তীব্র আশ্পৃহা থেকেই জেগে ওঠে। তারপর যখন নিজের তরফ থেকে এই মিলন—এই সংযোগ—একবার ঘটে যায়, এমন কি এক মুহূর্তেরও জন্য, তখন আর ব্যাখ্যা করে

বোঝবার দরকার হয়না , এমন একটা জিনিস তখন পাকাপাকি হয়ে চেপে বসে যায় যা সকল কৈফিয়তের বাইরে।

কিন্তু এ অবস্থায় পৌঁছতে প্রত্যেকেই চলে নিজের সহজতম নির্দেশের পথে।

আর যখন সে অনুভূতি আসে, যে মুহূর্তে সে সংযোগ ঘটে যায়, তখন চেতনার কাছে এই কথাটাই প্রকাশ পায় যে স্বরূপই স্বরূপকে জানতে পারে, আর তাতেই প্রমাণ হয় যে এইখানেই তা রয়েছে (মা নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখালেন)। সে জিনিস আছে এখানেই, এই হলো প্রমাণ। তীব্র আশ্পৃহাতে এখানকার সেই জিনিসই জেগে ওঠে।

প্রশ্নটা যখন আমি পাই তখনই আমার মনে হলো সেই ব্যক্তি যেন বলছে "হাঁ, হাঁ, ও-সব ঠিক কথা, কিন্তু আসলে যাকে ভগবান বলি তা কী ?"

চিঠিটা তার পড়লাম, সঙ্গে সঙ্গে এলো একটা নীরব নিস্তব্ধতা, সমগ্র কিছুই নীরব হয়ে গেল, সব কিছু গুটিয়ে গিয়ে রইল কেবল একটিমাত্র দৃষ্টি যা দেখতে চায়...তারপর সেই ভাবে দেখতে দেখতে ঐ কথাগুলি এসে গেল, তাই আমি লিখে ফেললাম "এই একটা জবাব, এমনি আরো একশো জবাব আছে, সবই ঠিক।"

সেই সঙ্গে, যখন "একটা-কিছুর" সংজ্ঞা পেতে আরো চেয়ে আছি এবং গভীর নীরবতা বিরাজ করছে, তখন উঠল আশ্পৃহার শিখা (মা হাত নেড়ে অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠার মতো ভঙ্গী করলেন), আর সেই আশ্পৃহা সর্ববর আকার নিল। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার... পৃথিবীর আশ্পৃহার এই কাহিনী...সেই পরমাশ্চর্য পরমতম অন্বেষণের অভিমুখে, যা আমরা শেষ পর্যন্ত হতে চাই।

আর প্রত্যেকের বেলাতেই—অর্থাৎ যারই ভাগ্যে এরূপ সংযোগ ঘটেছে—সে সরল মনে সাব্যস্ত করে নিয়েছে যে তারই ভিতর থেকে যে সংযোগের সেতু নিলে গেছে সেটাই হলো একমাত্র সেতু। তারই ফলে এই সকল ব্যাপার নানা ধর্ম প্রতিষ্ঠা, নানা দর্শন, গোঁড়ামি, মতভেদ—আর লড়াই।

সমগ্রভাবে দেখলে চমৎকার জিনিস খুবই মনোরম, খুশি হয়ে হাসবার মতো, আহা। সে কী হাসি...যে দেখতে পাচ্ছে। সেই হাসি, সে যেন বলছে "তোমরাই একে জটিল করছ, অথচ জিনিসটা কতই সোজা।"

ভাষায় ব্যক্ত করতে গেলে বলতে হয় : "এমন সহজ কথাটাকে কতই জট পাকিয়ে দেওয়া শুধু নিজের থেকে নিজে হয়ে ওঠা।"

(নীরব থেকে)

আচ্ছা তুমি বলতো, ভগবানকে তুমি কী বলে ভাবো ?

শ্রোতা বলতে পারিনা, এ প্রশ্ন নিজেকে কখনো করিনি।

মা : আমিও না, আমিও কখনো করিনি। কারণ তা জানবার যখন দরকার হলো

তখন আপনা হতে উত্তরও তার মিলে গেল। সে উত্তর বাক্যের নয়, যা নিয়ে তর্ক চলে : সে উত্তর...এমনি একটা স্পন্দন-তরঙ্গের মতো। সে তরঙ্গ এখন নিতাই চলেছে।

স্বভাববশতই মানুষ বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করে (বোধ করি তারা সেটা পছন্দই করে), কারণ সকল ব্যাপারেই তাই, সামান্য কিছুতেও অসংখ্য রকম বিপত্তি। তাই সর্বদাই সকলকে বলতে হয় : স্থির হও, স্থির হও, সুস্থির হও—শান্ত হও"। দেহকেও সেই বিপত্তির মধ্যে জড়াতে হয় (সেও হয়তো তা পছন্দ করে।), কিন্তু হঠাৎ এক সময় দেহের কোষগুলো গেয়ে ওঠে তাদের ওঁ মন্ত্র...আপনা হতেই। তখন কোষগুলো যেন ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠে বলে (মা বিস্ময়ের সুর করে বললেন) "তাই তো। এ তো আমি করতেই পারি? আমার এতে অধিকার আছে তো!" মায়া লাগে।

আর তার ফল হয় তৎক্ষণাৎ : সেই বিশেষ স্পন্দন, শান্তিময়, শক্তিময়।

আমার নিজের বেলাতে, যদি চারদিক থেকে সকলের ইচ্ছার চাপ এসে না পড়তো তাহলে আমি বলতাম "ভগবান কী সে কথা জেনে তোমার কি হবে? তাতে তোমার কি আসে যায়? কেবল এই কথা যে তোমার তাই হতে হবে।" কিন্তু ওরা ঠাট্টা বোঝেনা।

—আমি তাই জানতে চাইছি যে ভগবান কী জিনিস।

—কিন্তু না, সে চেষ্টা একেবারে নিরর্থক।

—ওহো।

তারা তখন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে, "ও, তা জেনে কিছু লাভ নেই বুঝি?"

—জানা দরকার নয়; তাই হওয়া দরকার।

কিন্তু এই সব বুদ্ধিমানের দল ধারণা করতে পারেনা যে কেমন ক'রে না জেনে তাই হওয়া যায় বা কিছু করা যায়।

সেখানেও এমন কথা বলা যায়, ঠাট্টার ছলে :

"যখন জানবে যে, তুমি কিছুই জানোনা তখনই তুমি সবচেয়ে ভগবান হবে।"

(মা ধ্যানে মগ্ন হলেন)

যারা একটা কিছু সংজ্ঞা চাইছে, "ভগবান কী" এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—সে এক বিরাট বিশালতা যা হাস্যময় ও জ্যোতির্ময়।

এই তো সেই রয়েছে, নয় কি? ঐ তো সেই।

কিছুদিন পরে

সেদিন ভগবান সম্বন্ধে যা বলেছি তাতে আরো কিছু যোগ করতে চাই কেউ একজন প্রশ্ন করছে :

তাহলে ভগবান কী?

শ্রীঅরবিন্দের একটি লেখার মধ্যে তা রয়েছে:

"প্রেমই আমাদের স্বাতন্ত্র্যজনিত দুঃখকে পার করিয়ে নিয়ে যায় পরিপূর্ণ মিলনের পরমানন্দের মধ্যে, কিন্তু তাতে মিলনপ্রয়াসী হবার যে সুখ তার থেকে বঞ্চিত হতে হয়না; তাইই হলো আত্মার চরম আবিষ্কার, এই বিশ্বজীবন হলো তারই জন্য সুদীর্ঘ প্রস্তুতি। সুতরাং প্রেম দিয়ে ভগবানকে পেতে চাওয়া, তাই হলো সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভের জন্য একটা প্রস্তুতি।" ("যোগ সমন্বয়")

ঐ শেষের কথাটির প্রসঙ্গ ধরেই আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে "ভগবান কী?" তাই আমি বলেছি ("God", "ভগবান" শব্দটি উল্লেখ ক'রে)·

"ভগবান হলো একটি নাম যা মানুষ এমন সব-কিছুকে দিয়েছে যা তার চেয়ে অনেক বড়ো, যা তার নিয়ন্তা, যাকে সে জানেনা কিন্তু যার সে অধীনস্থ।"

এখানে "এমন সব-কিছুকে" বলার বদলে "এমন জিনিসকে" বলা চলে, কারণ "সব-কিছু" বলাতে যুক্তির দিক থেকে আপত্তি হতে পারে। আমি বলতে চাই সেই "একটা-কিছুর" কথা যা অবর্ণনীয় ও অনির্বচনীয়—আর মানুষ চিরদিনই বোধ ক'রে আসছে যে সেই একটা-কিছু তাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। সে জিনিস সকল রকমের সম্ভাব্য বোধশক্তির সীমার বাইরে এবং তাই হলো নিয়ন্তা। তখন ধর্মীয় সম্প্রদায়রা তাকে একটা নাম দিলে মানুষ বললে "ভগবান", ইংরেজরা বললে "God" অন্যান্য ভাষাতে অন্যান্য নাম দেওয়া হলো, কিন্তু জিনিস সেই একই।

আমি ইচ্ছা করেই এরূপ কোনো সংজ্ঞা দিইনা। কারণ জীবনভোরই আমি মনে করি যে ও একটা শব্দ মাত্র যার উপরে মানুষ বহু রকমের অবাঞ্ছনীয় জিনিস আরোপ করেছে। যেমন মনে করো, ভগবান সম্বন্ধে অনেকের ধারণা যে তিনি অদ্বিতীয় অনন্য হয়ে থাকতে চান, তারা মনে ভগবান একমাত্র ও একক। এই কথাই তারা বোঝে এবং বলে, যেমন আনাতোল ফ্রাঁস বলেছেন (বোধ করি "Revolte des Angesতে"), "এই ভগবান যিনি কেবল এক হয়ে একা থাকতে চান।" এই জিনিসটাই ছেলেবেলাতে বলতে গেলে আমাকে পুরো নিরীশ্বরবাদী ক'রে তুলেছিল। কেউ যে এমন ক'রে নিজেকে অনন্য ও সর্বশক্তিধারী বলে জাহির করছে এ কথা আমি মানতে চাইনি, যদি বা তিনি তাইই হন তথাপি সে কথা জাহির করবার কোনো অধিকার তাঁর নেই। তা তিনি যিনিই হোন। এই ভাবটাই আমার মনে হয়েছে। আমি এই নিয়ে ঝাড়া এক ঘন্টা বক্তৃতা দিতে পারতাম, যেকথা প্রত্যেক ধর্মেই বলে।

যাই হোক, তাই আমি ওরূপ সংজ্ঞা দিয়েছি, যা সব চেয়ে বাস্তব বলে আমার মনে হয়েছে। আর সেদিন "ভগবান কী" এই প্রশ্নের উত্তরটা বোঝাতে গিয়ে আমাকে ঐ

শব্দটির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে; ওরূপ একটা শব্দ আমার কাছে মায়াত্মক রকমে ফাঁকা বলেই মনে হয়।

"সাবিত্রী" কাব্যের একটা ছত্র আমার মনে পড়ে যাতে খুবই আশ্চর্য রকমে আর দৃঢ়তার সঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে। তাতে বলেছে, "যিনি নামগোত্রের অতীত তিনি দেখলেন ভগবান জন্মাতে..."

"নিরবয়ব ও নিরুপাধিত্ব দেখলে ভগবানের জন্ম,
মর্ত মানবের আত্মা ও মনের কাছ থেকে পেলে
একটা মৃত্যুহীন দেহরূপ ও দিব্য নামকরণ।"

শ্রীমা

পথের কথা

জুন ২৪, ১৯৬৭

অনেক কথাই তো বলতে হয়, কিন্তু...শেষের কথায় আসাই ভালো। এ হলো এক বাঁকানো রেখা। ওর প্রান্তে যাওয়াই ভালো। এখনও সব বলার সময় হয়নি।

(নীরব থেকে)

দেহের যা ক্রিয়াগতিক তা প্রায় সম্পূর্ণটাই অভ্যাসের ব্যাপার। পিছনে রয়েছে দেহগত মনের চেতনা (যাকে আমি বলি "কোষগত মানস"), যা ভগবৎ-উপস্থিতি সম্বন্ধে নিত্যই চেতন এবং তা ছাড়া অন্য কিছুকে মানতে চায়না : তাই কাজ চলেছে পরিবর্তনের অভিমুখে, ঐ সকল ক্রিয়ার মূলকে অপসারণের দিকে। অর্থাৎ কেবল অভ্যাসের অনুবৃত্তির বদলে সে ক্রিয়া আপনা হতে চলবে ভগবৎ উপস্থিতি ও চেতনার দ্বারা (না হাত নেড়ে দেহে চেতনা প্রবেশের ভঙ্গী করলেন)।

কিন্তু এ সব কথা বুঝিয়ে বলা একেবারেই অসম্ভব, চেষ্টা করতে গেলেই তা আর তাই থাকবে না, হয়ে যাবে মনের জিনিস। তাই ভাষাতে ব্যক্ত করা এত কঠিন। আমি বলতেই পারি না।

যাই হোক, বোধ করি কিছুদিন আগেই বলেছিলাম স্থূল বাস্তব চেতনার তরঙ্গের অভ্যাস ও নাটকীয়তা পছন্দের কথা। ঐখান থেকেই শুরু হলো। যেমনি এ বিষয়ে চেতন হওয়া গেল অমনি ওর অভ্যাসগুলোকে মনে হলো বিজাতীয় জিনিস যা আসল চেতনার নিজস্ব কিছু নয়, আর তখন থেকেই পরিবর্তনের ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেল।

এ কাজ খুব সূক্ষ্ম আর খুবই কঠিন।

তার মানে হাজার বছরের পুরোনো অভ্যাসের সঙ্গে লড়াই। স্থূল চেতনার যত অভ্যস্ত স্বতঃক্রিয়া, হাঁ, তাই তো নাটকীয় প্রায় বিপজ্জনক বলা যায়। কখনো আবার নাটকীয় হলেও কল্পনার দরবারে তার নাটকীয়তা ঘুচে যায়। কিন্তু এ কথা বললেই আরো কঠিন হয়ে ওঠে। না বলাই ভালো।

যেমনি বলতে যাবো অমনি সে কথা কৃত্রিম হয়ে পড়বে।

ব্যাপারটা যেন এই যে এ সব অভ্যাসের স্থলে অন্য কিছুকে আনবার প্রয়াস চলেছে· যা অভ্যাসেরই কাছাকাছি (!) কিছু। এমন যে চেতনার অবস্থা, সত্তার এবং অস্তিত্বের গতিধারা, এই যে এমন প্রতিক্রিয়া ও বিকাশলক্ষণ, এ কি দিব্য অভিব্যক্তির দিকে যাবার নির্দেশ করে? দিব্য অভিব্যক্তির জন্য যে আকূতি তার সঙ্গে কি এর কিছু মিল আছে? ...চিন্তা এখানে শুদ্ধ নীরব কল্পনাও কিছু কাজ করেনা (ইচ্ছা করেই), ক্রিয়া বেটি

হয় তা স্বতঃস্ফূর্ত ও ঐকান্তিকভাবে, ভগবৎ-উপস্থিতির প্রভাবে...কিন্তু বাক্য এখানে সব-কিছুকে বিকৃত করে দেয়।

সময় সময়—মাঝে মধ্যে, হঠাৎ এসে পড়ে: নিরেট অনুভূতি, বিদ্যুৎ চমকের মতো; ভগবৎ-উপস্থিতির প্রত্যক্ষ অনুভূতি, পূর্ণ একত্ববোধ। কিন্তু তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য, পরেই আবার যেমন ছিল তেমনি।

এ জিনিস ঠিক প্রকাশ করা যায় না।

(এর পরে মা শ্রীঅরবিন্দের দু'টি লেখার দিকে মনোযোগ দিলেন তার অনুবাদ করতে, যা তিনি বুলেটিনে প্রকাশ করতে চান।)

"সাধনার এই এক মহা গুহ্য তত্ত্ব, কেমন করে মনের চেষ্টার দ্বারা সব-কিছু করতে যাওয়ার পরিবর্তে অন্তরালবর্তী ভগবৎ শক্তির দ্বারাই তা করিয়ে নেওয়া যায় তার কৌশল জানা।"

ঠিকই তাই বটে।

"দেহের প্রয়োজনীয়তা তো সুপ্রত্যক্ষ; মানুষকে এমন দেহ ও মস্তিষ্ক দেওয়া হয়েছে যা সে পেয়েছে, যাতে ওর সাহায্যে সে উত্তরোত্তর মানসিক বিকাশ ও জ্ঞানদীপ্তি লাভ করতে পারে, আর এই কারণেই পশুদের চেয়ে মানুষ উঁচু হতে পেরেছে। তেমনি আবার এই দেহেরই আরো বেশি উৎকর্ষ ঘটিয়ে কিংবা ভিতরকার যন্ত্রপাতিকে এমন সক্ষম করে তুলতে পারে যাতে আরো অধিকতর জ্ঞানদীপ্তি ও বিকাশ পেয়ে সে নিজেকেও উত্তরণ করবে, এবং কেবল চিন্তাতে ও আভ্যন্তরীণ সত্তাতেও নয় কিন্তু নিজের জীবনেও সে পূর্ণ দিব্যমানবত্ব অর্জন করবে। নতুবা জীবন সম্বন্ধে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা ব্যর্থ হবে, জীবনের প্রকৃত অর্থই লোপ পাবে, কেবল যদি মর্ত জীব নিজেকে ও নিজের মন-প্রাণ-দেহকে বর্জন করে দিয়ে অনন্তের কৈবল্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে তবেই সে সচ্চিদানন্দের অধিকারী হবে; কিংবা মানুষ হয়তো তেমন দিব্য যন্ত্রই হয়নি, কেবল কিছু উন্নততর শক্তি পেয়ে অন্যান্য পার্থিব জীব অপেক্ষা তাকে আপাতদৃষ্টিতে বিশিষ্ট দেখালেও সে শক্তি তার সীমায়িত, আর সেই শক্তি-সম্পদকে আরো বাড়াতে হলে অনুরূপভাবে এদের অন্য কোনোরূপ উত্তরাধিকারীর অবতারণা হওয়া দরকার।"

বুঝলাম। এই জিনিস নিয়েই আমি এতকাল ব্যস্ত ছিলাম।

(নীরব থেকে)

কিন্তু, শ্রীঅরবিন্দের নিজের সিদ্ধান্ত এই যে এই জিনিসই (দেহ) তার জন্য তেমনভাবে বদলাবে না; সে হবে নতুন রকমের সত্তা।

শ্রোতা তা তো নয়। তিনি বলছেন, এই দেহে যদি তাই না হতে পারে তবেই নতুন কোনো সত্তা হবে।

মা না, আমি এ লেখার কথা বলছি না ; আমি বলছি পরে যা তিনি লিখেছিলেন তাই নিয়ে।

?....

তা ছাড়া, ও একই কথা, কারণ...দেহের কি অদলবদল হয়?...তথাপি তা খুবই কঠিন। কিন্তু অসম্ভব নয়? অসম্ভব না হলেও...তার জন্য চাই প্রচুর মেহনত, আর জীবনকাল তো খুবই অল্প ; তথাপি বদলাবার জিনিস এতে আছে, কিন্তু এভাবে এর ক্ষয় হতে থাকা একটা মারাত্মক ব্যাপার।

শ্রোতা হাঁ, কিন্তু "নতুন সত্তা" আসবে কোথা থেকে? সে কি আকাশ থেকে পড়বে?

মা নিশ্চয়ই না, তাই কি হতে পারে? ভেবে দেখতে গেলে ঐভাবে নিশ্চয়ই নয় (মা হাসলেন), যেমনভাবে পশু থেকে মানুষ এসেছে তেমনিভাবে আসবে। কিন্তু পশু থেকে মানুষ কি কি স্তরের ভিতর দিয়ে এসেছিল তা জানা নেই। আমরা চিন্তা করি, কল্পনা করি, আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা তো কেউই সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম না। ঠিক বলতে পারিনা কেমন ভাবে তা হলো। তবে তাতে কিছু যায় আসেনা...কেউ কেউ বলে যে আমরা চেতন প্রচেষ্টাতে নিজেদের মধ্যে ওরূপ রূপান্তর আনতে পারি, শৈশব থেকে গঠন শুরু ক'রে। সেটা সম্ভব, আমি তাতে না বলছি না। এবার থেকে শুরু ক'রে পরের বারে কিছু রূপান্তর, তার পরের বারে আরো রূপান্তর, এইভাবে স্তরের পর স্তর হয়ে যেতে থাকবে, তার পরে মধ্যবর্তী স্তরগুলি লোপ পাবে, যেমন বানর ও মানুষের মাঝামাঝি স্তরগুলি এখন লোপ পেয়েছে?

শ্রোতা হাঁ, মানুষের শেষ পরিণতির কাহিনী ঐ রকমই হবে বটে।

মা সে কথা যেমন খুশি তুমি বলতে পারো। কিন্তু নতুন রকম সত্তার আবির্ভাবের বিষয়ে...তুমি যেমন বলছিলে তেমনই আমরা ভেবে থাকি, আগের থেকে গড়ে পিটে তৈরি হয়ে নেবে আসবে। খাঁটি কাল্পনিক উপাখ্যান।

শ্রোতা : শ্রীঅরবিন্দও তাই বলেছেন, তাকে গড়ে তুলতে হবে।

মা : বলতে পারি না, হয়তো দুই, তিন, চার, দশ, বিশ দফা মধ্যবর্তী রকমের সৃষ্টি হবার পরে আসবে সেই অতিমানসিক ধরণের সৃষ্টি...কিন্তু তখন কি আর

ছেলেপুলে হবার দরকার হবে? যারা চলে যাচ্ছে তাদের স্থান নতুন ছেলেমেয়েরা দখল করছে, এটা কি ঘুচবে না? কারণ যারা থাকবে তারা তো চিরদিনই থাকবে? দরকার মতো তারা নিজেদের মধ্যেই রূপান্তর করে নেবে।

শ্রোতা: বহুকাল দূরে এমন জিনিসের কল্পনা করা যায়।

মা হাঁ, এ সব অনেক দূরের কথা।

শ্রোতা কিন্তু আপনি নিজে তো তারই মধ্যে, সুতরাং অল্প দূরও হতে পারে।

মা না, শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে তা অল্প দূরের কথা নয়।

শ্রোতা তবু আপনি নিজে নিশ্চয় তাই। অল্প দূর কিংবা বেশি দূর, যাই হোক তা আপনারই দ্বারা হবে, এই জীবনে এবং এই দেহে।

মা কিন্তু আমি দেখি...

আমি চেষ্টা করি তাই করতে—নিজের জোরে নয়, আদৌ তা নয়, কিন্তু নিছক সেই "একটা-কিছু" বা মহাসত্তা বা মহাচেতনা বা যাই হোক (তার কথা বলতে চাইনা), সেই এটাকে নিয়ে (মায়ের দেহ) কিছু একটা করতে চাইছে। অর্থাৎ বলতে গেলে আমি একসঙ্গে করেও যাচ্ছি আর সাক্ষী হয়ে দেখেও যাচ্ছি, আর আমার এই "আমি"টা যে কোনখানে তা জানি না এর ভিতরেও তা নেই, উপরেও নেই, অন্য কোথাও... ভাষার খাতিরে বলতে হয় জানিনা কোথায় রয়েছে। তবে "কিছু একটা" কাজ ক'রে যাচ্ছে, সাক্ষী হয়ে দেখেও যাচ্ছে, আবার ক্রিয়াটিও সেইই হচ্ছে তিনই একসঙ্গে।

কারণ দেহটা নিজেই এখন প্রকৃত সহযোগিতা করছে—যতখানি তার পক্ষে সম্ভব—পূর্ণ শুভেচ্ছা ও উত্তরোত্তর বর্ধমান সহ্যশক্তি নিয়ে এবং তার পিছিয়ে যাওয়া খুবই কমে গেছে (আছে যদিও, মাঝে মাঝে সে ভাব ছুঁয়ে যায়, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডও স্থায়ী হয় না) সে ভাবটা রয়েছে আবহাওয়ার মধ্যেই, তাই তা এত বিরক্তিকর, বিতৃষ্ণাজনক, যন্ত্রণাদায়ক। তেমনই বোধ হতে থাকে। আর তা উত্তরোত্তর অসম্ভবও হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি।...কিন্তু তবুও রয়েছে হাজার বছরের পুরানো বদ অভ্যাসের গুরুভার, যেটা নিরাশাবাদী, অর্থাৎ যা ক্ষয়ের অনুমান করে, ভেঙে যাবার আশংকা করে...বস্তুত এই সকলের জন্যই কাজটা কঠিন হয়—আঃ। এই বিশুদ্ধি রাখা, নির্মুক্ত করা, আবহাওয়া থেকে ওগুলিকে তাড়ানো। এই ভিতরদিকেই সে কাজ আপনাআপনি হতে থাকে। কেবল ওই হলো প্রচণ্ড অন্তরায়, এই অপরিহার্য ক্ষয়মানের ভাব।

অবশ্য মনের দিক থেকে দেখলে সমগ্র পৃথিবীর আবহাওয়াটাই ঐরূপ ধরণের, কিন্তু মনের কাছে তার গুরুত্ব খুব কম : একটু ঝিলিক দিয়ে তখনই চলে যায়। কিন্তু এর মধ্যে (দেহ দেখিয়ে) সেই অভ্যাস—সেই যান্ত্রিক অভ্যাস—তাকে প্রতিরোধ করাই দুরূহ। অথচ তাকে দূর করতেই হবে, তা অপরিহার্য, তবেই অন্য জিনিসটি আসবে।

অতএব এ হলো প্রতি মিনিটের, প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম, নিরন্তর, সর্বক্ষণের জন্য।

আর তোমরা তো জানো, এই সত্তা, এই দেহটা তো একাকী হয়ে আলাদা হয়ে নেই, অল্পবিস্তর অনেকের সঙ্গেই থাকে, যদিও নৈকট্যের ইতরবিশেষ আছে : যারা খুব কাছের তাদের নিয়েও সেই একই প্রশ্ন, একই সমস্যা। কারণ এ দেহের চেতনাতে যা আসছে, অন্যদের চেতনাতে তা আসছে না। এতেও মেহনত বেড়ে যাচ্ছে।

যদিও মনের ও এমন কি প্রাণের দিকের সংক্রামকতার প্রশ্নের কিনারা হয়ে গেছে, কিন্তু স্থূল দিকের সংক্রমণের প্রশ্নটা রয়েই গেছে।

আর এই বস্তুচেতনার মধ্যে রয়েছে বাস্তব মন (যা এই বাইরের মধ্যে চমৎকার ভাবেই সাড়া দেয়), কিন্তু বাইরের থেকে যা আসে তার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত আধিপত্য করার ক্ষমতা তার নেই, যা নিত্য প্রতি মুহূর্তেই তার সংক্রমণ এনে দিচ্ছে।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে)

যখন সেই নিত্য সংস্পর্শ সম্বন্ধে হঠাৎ চেতন হয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য আসে ঐক্য-বোধ, যখন তা এসে পড়ে...তখন সমস্ত দেহকোষগুলি একসঙ্গে স্তবগান করে বলতে থাকে "হাঁ, হাঁ, তবে এই তো সত্তা, এইই তো সত্তা!"

দিনের মধ্যে শত শত বার এটা আসে, কিন্তু স্থায়ী হয় না।*

শ্রীমা

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

কঠিন ডানায় ওড়া

(পূর্বানুবৃত্তি)

বীরবাহু

নূতন ব্যবস্থা মত কাজ সুরু করিতে না করিতেই, বি ফ্লাইট অর্থাৎ গোলান রব্বানীর ফ্লাইট হইতে সংবাদ আসিল যে, একটি বিমান সম্পূর্ণ নূতন ধরণের অসুস্থতায় ভুগিতেছে। মাটির উপর ঐ বিমানের এঞ্জিন পরীক্ষার জন্য চালু করা মাত্র সম্পূর্ণ বিমানটি, বিশেষ করিয়া ঐ বিমানের এঞ্জিন, এমন ভয়ানকভাবে কাঁপিতে সুরু করে যে মনে হয় তখনই এঞ্জিন বিমানের সাথে বাধন ছিঁড়িয়া নিচে পড়িয়া যাইবে। বিমানের এঞ্জিন সব সময় চালু করা হয় ধীর গতিতে। গণিতের হিসাবে বলিলে বলিতে হয় প্রতি মিনিটে পাঁচ বা ছয় শত পাক ঘূর্ণন। আর যখন এঞ্জিনের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করা হয় তখন ঘূর্ণন হয় মিনিটে প্রায় তিন হাজার পাক। ঘূর্ণনের গতিবেগ গণনা করা হয় এঞ্জিনের মধ্যস্থিত ক্রাঙ্কসাফ্টের ঘূর্ণনের গতিবেগে।

বিমানের এঞ্জিনের কাজ শুধু শক্তি উৎপাদন করা। কিন্তু সেই শক্তির ব্যবহার হয় এঞ্জিনের সম্মুখস্থিত প্রপেলার দ্বারা।

এঞ্জিনের শক্তিতে ঘূর্ণমান প্রপেলার হাওয়া কাটিয়া সম্মুখে অগ্রসর হয়। একটা সাধারণ উদাহরণে এই ব্যাপার বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি। একখণ্ড কাঠের উপর কোন স্ক্রু ঘুরাইয়া যদি আরও শক্ত করিয়া বসাইবার চেষ্টা করা যায়, তখন প্রত্যেক বার ঘুরাইলেই দেখা যায় যে কাঠের মধ্যে স্ক্রু ধীরে ধীরে ঢুকিয়া যাইতেছে. অর্থাৎ কাষ্ঠ খণ্ডের মধ্যে অগ্রসর হইতেছে। ঠিক সেইভাবেই, প্রপেলার যখন হাওয়ার মধ্যে ঘুরিতেছে, তখন প্রপেলার হাওয়া কাটিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়। আর প্রপেলার থাকে এঞ্জিনের সম্মুখে, শক্ত নাট্‌বোল্ট দিয়া এঞ্জিনের সাথে বাঁধা। আবার এঞ্জিন থাকে বিমানের খোলের সাথে শক্ত নাটবোল্ট দিয়া বাঁধা। সেইজন্য ঘূর্ণমান প্রপেলারের অগ্রগতিতে সারা বিমানই হাওয়া কাটিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। শক্ত থিওরী ও অঙ্ক বাদ দিয়া যদি সাধারণভাবে বুঝাইতে হয় বিমান কেমন করিয়া হাওয়ার মধ্যে অগ্রগতি লাভ করে, তবে এই ব্যাখ্যাই যথেষ্ট। বিমান-এঞ্জিনীয়ারগণ কিন্তু হাওয়ার মধ্যে বিমানের অগ্রগতির কারণ অন্য উপায়ে বুঝাইবেন; সেই বুঝানতে অঙ্ক ও আরও থিওরী জানা প্রয়োজন। আমাদের এ গল্পে তার প্রয়োজন নাই।

অসুস্থ বিমানের কথায় ফিরিয়া যাওয়া যাউক। এঞ্জিনের গতিবেগ বৃদ্ধি করিলে

এই সাংঘাতিক অস্বাস্থ্যকর কাঁপুনি ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইত। ক্রমে বি ফ্ল্যাইটের সকল এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকরাই এই বিমানের এঞ্জিন চালু করিয়া পরীক্ষা করিতে নারাজ হইলেন। সকলেই, তাহার মধ্যে এঞ্জিনীয়াররা এবং পাইলটরা সকলেই, মত প্রকাশ করিলেন যে বিমানের এঞ্জিনে কোন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে এবং বিমানটিকে উড়াইবার কাজে লাগাইতে হইলে অসুস্থ এঞ্জিন খুলিয়া ফেলিয়া, নূতন ভাল এঞ্জিন অবিলম্বে লাগান প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত বিমানের এঞ্জিন বদল করিয়া নূতন এঞ্জিন লাগাইবার নির্দেশ দিয়া, বিমানটিকে সার্ভিসিং সেক্‌শনে পাঠান হইল।

যে দুই তিন দিন ধরিয়া বি ফ্ল্যাইটে ঐ বিমান লইয়া এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকদের এঞ্জিনীয়ারিং ব্যস্তাব্যস্তি ও নানারূপ পরীক্ষার কাজ হইতেছিল, সে কয়দিন সার্ভিসিং সেক্‌শনের আমরা কয়কেজন খুবই সজাগ হইয়া সমস্ত কাজ পর্যাবেক্ষণ করিতেছিলাম। পর্যাবেক্ষণ করার ফলে, আমাদের স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে বি ফ্ল্যাইটে ঐ বিমানের অসুস্থতার কারণ ধরা না পড়ারই সম্ভাবনা বেশী।

বিমান সার্ভিসিং সেক্‌শনে আসামাত্র, বিমানটিকে একেবারে আলাদা করিয়া লোকচক্ষুর অর্থাৎ কৌতূহলী বৈমানিকদের চক্ষুর অন্তরালে রাখার ব্যবস্থা করা হইল। লোকচক্ষুর অন্তরাল করিলেও, বিমানের পীড়া অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার কথা মনের চিন্তাধারা হইতে কখনও অন্তরাল হইল না। অনেকটা যোগীদের ঈশ্বরচিন্তার মতই সর্বক্ষণ এই বিমানের পীড়ার কথা মনের কোণায় সব সময়ের জন্য গাঁথিয়া রহিল। একটু অন্য মনস্ক হইলেই এঞ্জিনের কাঁপুনি চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও এঞ্জিনের কাঁপুনি স্বপ্নে দেখা যাইতে লাগিল। মন কখনই এই নূতন প্রকার অসাধারণ পীড়ার কারণ অনুসন্ধানে বিরত হইল না। ইতিমধ্যে নানা পুস্তকে এই অসুস্থতার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিল। স্কোয়াড্রন এঞ্জিনীয়ারিং অফিসার ওয়ারান্ট অফিসার মিত্রর সাথেও এই পীড়ার কথা এবং কোন পন্থায় এই পীড়ার কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে আলাপ করা হইল।

দ্বিতীয় দিন বি ফ্ল্যাইটে গিয়া সার্জেন্ট গোলাম রব্বানীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সাংঘাতিক অসুস্থতার পূর্ব্বে কোন পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল কিনা, এই সমস্ত তথ্য উপস্থাপিত হওয়াতে সার্জেন্ট গোলাম রব্বানী একটু তাচ্ছিল্য করিয়া বলিলেন, "হাম সব দেখ লিয়া ; এঞ্জিন বদল দেও, সব ঠিক হো যায়গা। নেই ত টাইম খুটখুট বরবেলাপ করোগে।" সার্জেন্ট গোলাম রব্বানী সিনিয়র, কাজেই বিনীতভাবে তাঁহার কথাই মানিব বলিয়া স্বীকার করিলাম। শুধু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার নিমিত্ত ঐ বিমানে প্রথম হইতে কি কি কাজ হইয়াছে তাহার তালিকার জন্য অনুরোধ করলাম। প্রশ্নোত্তর ও কথায় কথায় জানা গেল যে অস্বাস্থ্যকর কাঁপুনি সুরু হওয়ার পূর্ব্বে

প্রপেলারের সম্মুখস্থ হাঁড়ি (Dome) হইতে এঞ্জিনের লুব্রিকেশন তৈল কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া যাইতেছিল এবং সেই তৈলপাত বন্ধ করার জন্য প্রপেলারের সম্মুখস্থ হাঁড়ি খুলিয়া, হাঁড়ি ও প্রপেলারের মধ্যস্থিত রবারের তৈরারী গাস্কেট বদলান হইয়াছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র অসুস্থতার কারণ সম্বন্ধে একটা ধারণা আমার মনের মধ্যে আসিল।

পরদিন ছুটি ছিল। কি কারণে মনে নাই। খুব সম্ভব রবিবার ছিল। কাজেই স্কোয়াড্রনে বিমান উড়াইবার কাজ ছুটি। সকালবেলা আহারের পর কাহাকেও সাথে না লইয়া অসুস্থ বিমানের নিকট পৌঁছাইলাম। এবং প্রপেলারের সম্মুখে স্থিত ডোম খুলিয়া নীচে নামাইয়া রাখিলাম। ডোম খুলিতেই অসুস্থতার কারণ নজরে পড়িল। সার্জেন্ট খোলার রব্বানী ডোম খোলা হইয়াছে বলার সময় হইতেই অসুস্থতার কারণ সম্বন্ধে যে ধারণা মনে আসিয়াছিল, সমস্ত সময় ঐ চিন্তা মনে থাকায়, অসুস্থতার কারণ সম্বন্ধে একেবারে স্থির নিশ্চয় হইয়া গিয়াছিলাম। সেই কারণে, আশ্চর্য্য হইলাম না এবং কোন হৈ-চৈও করিলাম না। যত শীঘ্র সম্ভব প্রপেলারের তিনটি পাখাকে একইভাবে সন্নিবেশ করিয়া ডোম লাগাইবার পর সমস্ত প্রপেলার পরিষ্কার করিয়া তৈলমুক্ত করা গেল। তার পর ছাউনিতে নিজের কামরায় ফিরিয়া আসিলাম। সেদিন এ বিষয়ে আর কাহারও সহিত আলাপ করা হইতে নিবৃত্ত রহিলাম। এ কাজের সময় সার্ভিসিং সেকশনের পাহারায় নিযুক্ত বৈমানিক একজন ছাড়া আর কাহারও সাহায্য লওয়া হয় না। এবং তাহাকেও এই কাজের ব্যাপারে নির্বাক থাকার উপদেশ দিলাম।

পরদিন সকালে, স্কোয়াড্রন এঞ্জিনীয়ার অফিসার ওয়ারান্ট অফিসার মিত্রকে, অসুস্থ বিমানের এঞ্জিন চালু করিয়া পরীক্ষা করিতেছি, কাজেই তাঁহার উপস্থিতির প্রয়োজন আছে প্রার্থনা করিয়া, ক্ষুদ্র পত্র পাঠাইলাম। তিনি আসিলে পর তাঁহাকে সাথে লইয়া ককপিটে আসিয়া বসিলাম। ওয়ারান্ট অফিসার মিত্র আসার পর যাহাতে বিলম্ব না করিয়া এঞ্জিন চালু করা যায় সে ব্যবস্থা পত্র পাঠাইবার পূর্বেই করিয়া রাখা ছিল। এবার এঞ্জিন চালু করা গেল এবং উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে বিমানের এঞ্জিনে কোন প্রকার অসুস্থতার লক্ষণই আর নাই। রবিবার সকালে আসিয়া কাজ করার কথা এক পাহারায় নিযুক্ত বৈমানিক ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও জানা ছিল না। কাজেই এঞ্জিনের কম্পন সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হওয়ার কারণ কেহই জ্ঞাত ছিল না। সার্ভিসিং সেকশনের বৈমানিকরাও আশ্চর্য্য হইয়া বিমানের কম্পন হইতে নিরাময় হওয়ার কথাটা ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া মনে করিল।

এর পর বিমানের টেষ্ট ফ্লাইট সমাপ্ত করিয়া সার্জেন্ট রব্বানীর কাছে, বি ফ্লাইটে পাঠান হইল। বিমানটিকে তাঁহারা সেখানে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়াও আর অসুস্থতার কোন লক্ষণ প্রকাশ হইতে দেখিলেন না।

কয়েকদিন চুপ করিয়া থাকার পর স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী ও স্কোয়াড্রন এঞ্জিনীয়ার অফিসার ওয়ারান্ট অফিসার মিত্রকে এই অদ্ভুত অসুস্থতার কারণ এবং সেই সাথে পীড়া নিরাময় করার চিকিৎসা বুঝাইলাম। তাঁহারা দুইজনেই খুব আগ্রহের সাথে শুনিয়া লইলেন। এরপর হইতে এ এবং বি ফ্লাইটের সমস্ত বৈমানিকরাই সার্ভিসিং সেক্‌শনকে খুব সমীহ করিয়া চলিতে সুরু করিল।

এই ঘটনার পর সপ্তাহ খানেক পার হওয়ার পূর্বেই আর একটা ঘটনার সূচনা হইল। পূর্বে বলিয়াছি কয়েকজন নূতন এঞ্জিনীয়ার বৈমানিক আমাদের স্কোয়াড্রনে বদলি হইয়া আসিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন গোরা ওয়ারান্ট অফিসার ছিলেন। তিনি ছিলেন বিজলী-এঞ্জিনীয়ার। স্কোয়াড্রনের সমস্ত বিজলীর কাজ তাঁহার তত্ত্বাবধানে দেওয়া হইয়াছিল।

প্রত্যেক বিমানই বিজলীর দিক হইতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। প্রত্যেক বিমানেই বিজলী উৎপাদনের জন্য পাওয়ার হাউস—অর্থাৎ জেনারেটর ও সেই জেনারেটর হইতে উৎপন্ন বিজলী নানা কাজে, যেমন আলো জ্বালান, বেতার বার্তা ও রেডিও চালান, এমন কি বন্দুক ছোঁড়া ও বোমা নিক্ষেপ করা সমস্ত প্রকার কাজেই ব্যবহার করার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থাগুলি খুব নিখুঁতভাবে রক্ষা করিতে হয়। কোন ত্রুটিই বরদাস্ত করা হয় না, দুই কারণে। প্রথম কারণ, ত্রুটি মানে সেই অংশের কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল; যদি বিমান উড়াইবার প্রয়োজন হয়, তবু ঐ ত্রুটির জন্য বিমান সর্বতোভাবে যুদ্ধের কাজে অনুপযোগী হইয়া রহিল। আর দ্বিতীয় কারণ আরও সাংঘাতিক। কারণ বিজলীস্থানে ত্রুটি শেষ পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডে পর্যবসিত হইতে পারে। উড়িবার কালে বিমানে অগ্নিকাণ্ড যে কত মারাত্মক তাহা আম্বালায় শিক্ষার সময় থাকা-কালে দেখিয়াছি। অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, সেই উড়ন্ত বিমান পরিত্যাগ করিয়া বিপদ হইতে জীবন উদ্ধার করা যে কত কঠিন, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। এই সব কারণে প্রত্যেক বিমান যখন সার্ভিসিং সেক্‌শনে পরীক্ষা ও ত্রুটি নিরাময়ের জন্য আসে, তখন বিজলীর কাজ খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা হয়।

ফ্লাইট দুইটি হইতে আগত অন্ততঃ একটি বিমানের পরীক্ষা ও ত্রুটি নিরাময়ের কাজ প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা শেষ করিয়া ফ্লাইটে পুনরায় ফিরত পাঠাইব বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছিল। এই কথা সাব্যস্ত করার সময় স্কোয়াড্রন এঞ্জিনীয়ারিং অফিসার, ওয়ারান্ট অফিসার মিত্র ও গোরা ওয়ারান্ট অফিসার ও (বৈমানিকদের ভাষায় "বিজলী-ওয়ালা") উপস্থিত ছিলেন। সেই জন্য ফ্লাইটের একটি বিমানের বিজলীর সমস্ত কাজ ও পরীক্ষা শনিবারের পূর্বেই শেষ করিয়া ফেলার অনুরোধ করিয়া, তাঁহার নিকট ক্ষুদ্র পত্র পাঠান হইয়াছিল। তিনি ছিলেন ওয়ারান্ট অফিসার। ওয়ারান্ট অফিসার সার্জেন্ট হইতে

দুইবাপ সিনিয়র। তারপর তিনি ছিলেন গোরা। কাজেই আমার পত্রে বোধহয় তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়া থাকিবে। হৃদয়ে আঘাত না লাগিয়া থাকিলেও মানে নিশ্চয়ই চোট লাগিয়াছিল। তিনি ক্ষুদ্র পত্র দেখিয়াও দেখেন না এবং শনিবার বৈকাল ৩৫ বিমানের বিজলীর তরফের কোন কাজই সুরু করেন না। রবিবার সার্জেন্ট মেসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর, বিজলী ইন্‌স্পেক্‌শনের কাজ কবে শেষ হইবে এই প্রশ্ন খুব সলীহের সহিত তাঁহাকে করিলাম। একজন সার্জেন্টকে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করিলেন না। তাঁহাকে আর ঘাঁটান নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ স্কোয়াড্রনে দুর্নাম রটিয়াছিল যে, কয়েকজন সিনিয়র বৈমানিক গোরাদের অপছন্দ করে এবং সকলে মনে করিত যে আমিও সেই দলভুক্ত। কথা কাটাকাটি হইলে হয়ত দুর্নাম আরও বাড়িয়া যাইবে। এছাড়া আরও একটা কারণ বর্তমান ছিল। তাহাও বলা প্রয়োজন। সিনিয়র ও জুনিয়র ননকমিশনড্-অফিসারদের মধ্যে কয়েকজন কেবল করিয়া গোরাদের অপদস্থ করা যায় তাহার জন্য সব সময় নৌকা বুঁজিয়া ফিরিত। বচসা সুরু হওয়া মাত্র, ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা না করিয়া তাহারা নিশ্চয়ই আমার সহিত মিলিত হইত, এবং তাহা গোরা ওয়ারেন্ট অফিসারের পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর হইত না। সেইজন্য এইবার অন্য উপায় অবলম্বন করিব বলিয়া স্থির করিলাম। সোমবার দিন প্রাতঃকালে আহারের পর সার্ভিসিং সেক্‌শনে উপস্থিত হইলাম না। বৈকালেও অনুপস্থিত রহিলাম। দুপুরে আহারের পর সোজা ব্যারাকে নিজের ঘরে আসিয়া গল্প-পুস্তক মনোযোগ দিয়া পড়িতে লাগিলাম। সেদিন কাজ শেষ হওয়ার পূর্বে ওয়ারেন্ট অফিসার মিত্র সার্ভিসিং সেক্‌শনে আসিয়া শুনিলেন যে আমি সকাল হইতে অনুপস্থিত রহিয়াছি। মেসে দুইবারই সাক্ষাৎ হইয়াছে। সেখানে অসুস্থ শরীরের কোন লক্ষণই তাঁহার চক্ষুতে ধরা পড়ে নাই। তিনি চিন্তিত হইয়া ব্যারাকে আসিলেন এবং আমাকে দিব্য আরামে বসিয়া গল্প পুস্তক পড়িতে দেখিলেন। আমাকে একটু পর্যবেক্ষণ করিয়াই তিনি বুঝিলেন, কাজে অনুপস্থিত হওয়ার কারণ শরীরের অসুস্থতার জন্য নয়। দুই একটা প্রশ্নেই সঠিক কারণ বুঝিয়া লইলেন। আমিও অকপটে তাঁহাকে সব কথা জানাইলাম। তিনি ইচ্ছা করিলেই কাজে অনুপস্থিতির জন্য আমাকে চার্জ সীট দিয়া উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। সে পথে না গিয়া, তিনি আমাকে সমস্ত কথা স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারকে জানাইতে বলিলেন। এবং সেইদিনই, আর দেরী না করিয়া, আমার তরফ হইয়া, সমস্ত কথা তিনি স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীকে জানাইলেন। পরদিন সকালেও কাজে অনুপস্থিত রহিলাম। বেলা দশটা নাগাদ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য অরুরী তলব আসিল। তাঁহার দপ্তরে পৌঁছাইয়া যতদূর সম্ভব একটা চৌকশ সেলাম ঠুকিয়া এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তিনি আমার চেহারা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আবার কি হল?"

সব কথা তাঁহাকে জানাইবার পর, ধীরে ধীরে বলিলাম, আমাদের সব কাজেই যদি গোরারা এমন করিয়া বাধার সৃষ্টি করে, তাহা হইলে আমাদের স্কোয়াড্রনে উড়িবার উপযুক্ত বিমানের সংখ্যা একেবারে কমিয়া যাইবে। তাহাতে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় বৈমানিকদের উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। এখন সব ভারতীয় বৈমানিকরাই খুব তেজের সাথে কাজ করিতেছে, কিন্তু যেই দেখিবে যে গোরারা তাহাদের সমস্ত ব্যাপারেই বাধা দিয়া কাজ পণ্ড করিয়া দিতেছে আর আমরা সেই সমস্ত বাধা-সৃষ্টি সহ্য করিয়া চুপ করিয়া দেখিতেছি, তখন সত্য সত্যই ভারতীয়দের কাজ করিবার মনোবল ও উদ্যম নষ্ট হইয়া যাইবে। এর একটা বিহিত এখনই হওয়া প্রয়োজন। বিহিতের কোন ইঙ্গিত পাই নাই বলিয়া নিজের কোঠায় চুপচাপ বসিয়াছিলাম।

বিহিত হইতে বিশেষ দেরী হইল না। পেশাওয়ারে গ্রুপ হেড্ কোয়ার্টার। সেখানে তখনই টেলিফোন করিয়া বিজলী-ওয়ালা গোরা ওয়ারান্ট অফিসারের বদলির হুকুম আনিয়া লইলেন। আর গোরা ওয়ারান্ট অফিসারের পরিবর্তে ভারতীয় এক নম্বর স্কোয়াড্রন হইতে সদ্য প্রমোশন-প্রাপ্ত সার্জেন্ট হাণ্ডনি আমাদের স্কোয়াড্রনে বিজলীকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। তখনকার মত সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল। পুরা উদ্যমে কাজ চলিল। ফ্যাইটে প্রত্যহ দিনে এবং কোন কোন দিন রাত্রে উড়িবার মহড়া চলিল, যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের স্কোয়াড্রনকে প্রস্তুত হইতে হইবে। বর্ষা অভিযানের সময় প্রায় আগত কিন্তু প্রস্তুতির পথে এখনও আমাদের অনেক বাধা কাটাইয়া আগাইতে হইবে।

স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের নিকট পুনরায় টেলিগ্রাম আসিল দাদার পীড়া বৃদ্ধির কথা। এবার টেলিগ্রাম আসিল যামসেদপুর এরিয়া আর্মি কমাণ্ডারের নিকট হইতে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে পুনরায় অনির্দ্দিষ্ট দিনের জন্য ছুটি মঞ্জুরি লইয়া সেইদিনই ট্রেনে যামসেদপুর রওনা হইলাম এবং মাসাধিক কাল পরে দাদার পীড়া কিছু উপসম হইলে কাম্বেলপুর অভিমুখে রওনা হইলাম।

এবার কাম্বেলপুর অভিমুখে রওনা হওয়ার সময় একটা বিশেষ কাজ লইয়া রওনা হইলাম। কাম্বেলপুরে একটা সাব জেল ছিল। সেই সময় সাব জেলে জন দুই বঙ্গভাষী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বীর যোদ্ধার ভ্রাতুষ্পুত্র। এই ভ্রাতুষ্পুত্র নিজেও কিছু কম ছিলেন না। কাম্বেলপুরে খুব শীত পড়ে। জেলের ভিতর রাত্রে শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অগ্নি প্রজ্বলনের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। সেইজন্য জেলে বন্দী ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য যামসেদপুর হইতে কোন বন্ধু একটা বিজলী দ্বারা গরম হওয়ার যন্ত্র একখানা দিলেন। আর কলিকাতা

হইতে কোন বস্তু দুই পক্ষেরই, ভ্রাতুষ্পুত্রের এবং আমারও, দিলেন একটা প্যাকেট। প্যাকেট বেশ পরিপাটি করিয়া বাঁধা। দেখিতে যেন একটা সাধারণ আকারের অভিধান পুস্তক। প্যাকেটের আকার পুস্তকের হইলেও প্যাকেটের অভ্যন্তরে অন্য বস্তু লুক্কায়িত ছিল। বিমান বিভাগের একজন কর্মচারীর পক্ষে প্যাকেটের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত বস্তুর সাথে রাখা কোন অন্যায়ের কাজ হইত না। কিন্তু সেই বস্তু জেলে কোন রাজবন্দীর নিকট পৌঁছান শুধু অন্যায় নয়, ধরা পড়িলে ঘোরতর শাস্তিতে জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। গরম হওয়ার যন্ত্র এবং অভিধান দুইটি বস্তুই পরিপাটি করিয়া প্যাকেট করা ছিল।

কায়েনপুরে পুনরায় পৌঁছাইলাম। তখনকার দিনে জেলে রাজবন্দীর নিকট কোন বস্তু পৌঁছান এমন গর্হিত কাজ ছিল যে তাহা কোন সামরিক কর্মচারীর পক্ষেই সমীচীন ছিল না। কর্তৃপক্ষের কানে একথা উঠিলে সেই কর্মচারীর সমূহ বিপদ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা। কয়েকদিন চুপ করিয়া রহিলাম। কেননা এসব বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে একা কাজ করাই শ্রেয়। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে একথা জানান মানে তৃতীয় ব্যক্তির এ গোপন সংবাদ জানিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। তারপর সকলেই যখন এ গোপন সংবাদ জানিল তখন গোপনতা আর রহিল না। দিন দশেকের মধ্যে জেলখানা, পথ, পথের পাশে গমের ক্ষেত সব ভাল করিয়া দেখার পর একদিন তিনটা প্যাকেট লইয়া বিচক্রযানে রওনা হইলাম। প্রথম প্যাকেট দুইটির কথা বলা হইয়াছে। তৃতীয় প্যাকেটে ধুতি পাঞ্জাবী চাদর চপ্‌পল ও এক জোড়া কাল রংএর প্রজাপতি গোঁফ ছিল। নির্জন স্থান দেখিয়া প্রায় পাচ ছয় ফিট উঁচু গমের ক্ষেতে ঢুকিয়া পড়িলাম। তারপর প্রজাপতি গোঁফ সমন্বিত ধুতি-পাঞ্জাবী চাদরে ভূষিত, পায়ে চপ্‌পল ভদ্রলোক গমক্ষেত হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে দুইটি প্যাকেট। জেলে পৌঁছাইয়া ভদ্রলোক ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে দেখা করিতে চাহিলেন। বলিলেন তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট আত্মীয়, কলিকাতা হইতে সেই দিনই কায়েনপুর পৌঁছিয়াছেন, এবং তাঁহার সময়ের অভাবের জন্য সেইদিনই কলিকাতা অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করিবেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য দুইটি প্যাকেট সাথে করিয়া আনিয়াছেন। জেল কর্তৃপক্ষ প্যাকেট দুইটা পরীক্ষা করার পর ভ্রাতুষ্পুত্রকে দিলে বাধিত হইবেন। ইত্যাদি। আরও বলিলেন কলিকাতা হইতে তাঁহার আসার কথা তিনি পূর্ব্বাহ্নেই পত্রযোগে জানাইয়াছেন। জেল কর্তৃপক্ষ পত্র না পাওয়ার উল্লেখ করিলে ডাকঘর সম্বন্ধে নানা অভিযোগ করতে ভুলিলেন না। পূর্ব্বে সংবাদ না পাওয়ায় জেল কর্তৃপক্ষ সেইদিনই সাক্ষাতের অনুমতি দিতে রাজি হইলেন না। এতদূর আসার পর ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, ভদ্রলোক সেইজন্য দুঃখিত হইয়া প্যাকেট দুইটি জেল কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়া বাহির হইয়া আসিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বুক দুরুদুরু হয় নাই। বাহিরে আসার পর বুক দুরুদুরু করিতে লাগিল। গমক্ষেত পর্য্যন্ত পথ আর ফুরাইতে চায় না।

শেষ পর্য্যন্ত গন কেত হইতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একজন সার্জেন্ট, তাহার সুন্দর পোষাকে বাহির হইয়া আসিয়া ঘিচক্রযানে চড়িয়া ছাউনিতে আসিয়া পৌঁছিল। ঘিচক্রযানের সম্মুখের দিকে আলোর নিচে একটা বেতের ঝুড়ি ছিল। সেই ঝুড়ি হইতে একটা প্যাকেট বাহির করিয়া লইয়া অহার ফিটব্যাগে রাখিয়া দিল।

কয়েকদিন পর্য্যন্ত একটা আশঙ্কা তাহার মনে উঁকি দিত। ধরা পড়ার আশঙ্কা। একদিন স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী তাহাকে দপ্তরে ডাকিয়া গোপনে বলিলেন কায়েলপুর বা নিকটে কোথাও কোন বঙ্গবাসীকে পুলিশ খুজিয়া ফিরিতেছে। পুলিশ একবার সন্দেহ করিয়াছিল সে আমাদের স্কোয়াড্রনেরই কেহ হইবে। কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাহারা অর্থাৎ পুলিশ আমাদের স্কোয়াড্রনের সমস্ত বঙ্গবাসীদের উপরই নজর রাখিয়াছিল,—কিন্তু প্রজাপতি গোপে সমুজ্জ্বল কোন বৈমানিকই পুলিশের নজরে আসে নাই। সেই কারণে তাহারা নি:সন্দেহ হইয়াছে যে এই স্কোয়াড্রনে সেই ব্যক্তি নাই। কিন্তু সে ব্যক্তি রেল গাড়ীতে আসে নাই বা রেলগাড়ীতে ফিরতও যায় নাই। তাহা হইলে বিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যে সে কোথাও লুকাইয়া আছে।

স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর সব কথায় যেন খুব আশ্চর্য্য হইয়াছি, এই ভান করিয়া শুনিলাম—বলিলাম বঙ্গ-সন্তানেরা সত্যই ডাকাততুল্য—না হইলে এত দূরে আসিয়া হিন্দুপ্রায় বর্জিত পাঠানদেশে এই সব গর্হিত কাজ করে। তখন একথা বুঝি নাই যে স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী বুঝিয়াছিলেন, বিজাতীয় গবর্ণমেন্টের বিপক্ষে এই কাজ কাহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। যাহাতে অসতর্ক না হই, সেইজন্য গোপনে ডাকিয়া না-জানার ভানে সব কথা জানাইয়া দিলেন।

দ্বিতীয়ত: আর একটা তখন হইতেই বুঝিতে আরম্ভ করিলাম। কি কারণে কাকানউতে আচক্ষু বিস্তৃত দীর্ঘ সুচলো গুম্ফ কাটিয়া ফেলার জন্য ব্যবস্থা হইল। সে গোঁপ থাকিলে এ কাজ সম্পন্ন হইত না। বা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিলে নির্ঘাৎ ধরা পড়িতে হইত। সব সময় কোন অদৃশ্য শক্তি পশ্চাৎ হইতে কল-কাঠি নড়ায়। কল-কাঠি নড়িবার কারণ বুঝি না বলিয়াই মান, অভিমান, ক্রোধ, অভিযোগে সময় বৃথা ক্ষেপণ করি। পরে যখন বুঝিতে পারি, তখন আপনা হইতেই অদৃশ্যের পদে মাথা নোয়াইয়া আসে।

The value of our actions lies not so much in their apparent nature and outward result as in their help towards the growth of the Divine within us.

—*Sri Aurobindo*

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone . 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

KULJIAN-INDIA
in the service of

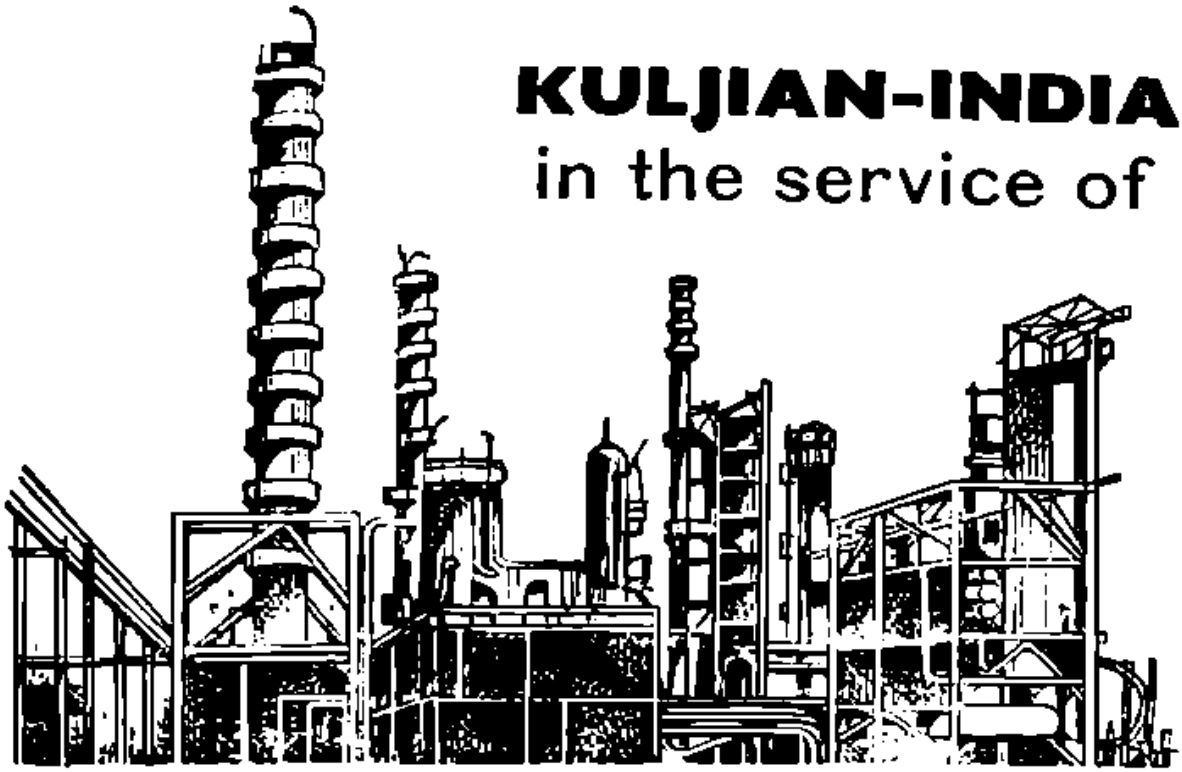

CHEMICAL
INDUSTRY

Kuljian's Chemical Engineering Department is equipped to take charge of complete engineering work for chemical manufacturing facilities Kuljian can develop the selected process into a single-line flow diagram, prepare specifications for process equipment, handle the detail engineering, and undertake complete field engineering services. Project engineering is performed in conjunction with Kuljian's other engineering departments—mechanical, civil, electrical, architectural, and structural services. Equipment and material procurement, construction supervision, training of owner's personnel and start-up complete the picture.

Kuljian-India serves the industry—serves the nation

The Kuljian Corporation (India) Private Ltd.

CONSULTING ENGINEERS

24-B, PARK STREET CALCUTTA-16.

God is infinite possibility. Therefore Truth is never at rest; therefore, also, Error is justified of her children.

—Sri Aurobindo

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

PHONE : 34-2665 GRAM : Boxboard

With Compliments of : —

INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,
57, Radhabazar Street,
CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA-33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

OFFICE PHONE:
22-4972.

!! নূতন প্রকাশিত !!

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের

কবিমনীষী (দুই খণ্ড)

বেদমন্ত্র

উপনিষদ-কাহিনী

রবীন্দ্রনাথ

অনির্বাণের

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

সমীরকান্ত গুপ্তের

মনের মন মুকুর

দাম ৩.৫০ টাকা

[দার্শনিক, কবি, চিত্রকর, সুরশিল্পী, বৈজ্ঞানিক, কর্মবীরের
জীবন থেকে অসামান্য কাহিনীমালা]

Eliminate egoism in all its form; eliminate it from every movement of your consciousness.

—Sri Aurobindo

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

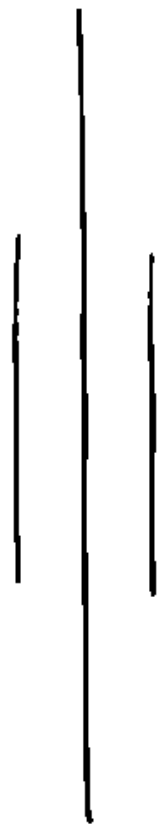

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

Very often it so happens that the things a man does not really need are just the things that cause him most harm.

—The Mother

BENGAL IMMUNITY

COMPANY LIMITED

CALCUTTA-13

Telegrams: 'Vessel' Cal
Codes { Scotts 10th. Ed., A. B. C. 5th. Ed., Bentley's

Telephones { Office : 23-1393 Dock Office: Residence: { 55-6464 55-3724 55- 503

SARAT CHATTERJ & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS

3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Regular Services:

AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of:

LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO., LTD.
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম জীবন-কথা

[শ্রীনারায়ণপ্রসাদ লিখিত "Life in Sri Aurobindo Ashram এর অনুবাদ]

পশুপতি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনূদিত

দাম ছয় টাকা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই সাত টাকা

হাবড়া "মাতৃমন্দির" হইতে প্রকাশিত এবং
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে (পণ্ডিচেরী) ও
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে (১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২) প্রাপ্তব্য।

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির প্রকাশনা

যোগ সাধনার ভিত্তি		শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
যোগ সমন্বয় প্রসঙ্গ		অনির্বাণ	১৫·০০
স্মৃতির পাতা (১ম পর্যায়)		শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪·৫০
ঐ (২য়)		ঐ	৪·০০
কবির্মনীষী (১ম খণ্ড)		ঐ	৩·০০
ঐ (২য়)		ঐ	৪·৫০
রবীন্দ্রনাথ		ঐ	১.৫০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও কর্ম		পশুপতি ভট্টাচার্য (অনুবাদক)	৫·০০
Talks with Sri Aurobindo		by Nirodbaran	৮·০০
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	বহুমান প্রসঙ্গ	অনিলবরণ রায়	২·০০
সাধনার জীবন		সরীসৃপাস্ত গুপ্ত	১·৫০

মাতৃমন্দির প্রকাশনা

বিবিধ রচনা	শ্রীঅরবিন্দ	১·০০	উত্তম রহস্য	শ্রীমা	১·০০
ভারতের পুনরুত্থান		১·৫০	গোলাপের রূপক		১·০০
কর্মযোগী		১·৫০	পুরাণো লেখা		১·০০
জগন্নাথের রথ		১·০০	শিক্ষা		১·০০
গীতার ভূমিকা		২.০০	মায়ের আলাপ		২·৫০
শ্রীঅরবিন্দের পত্র		১·০০	সর্বোত্তম আবির্ভাব		৩·৫০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীঅরবিন্দ বুকস্ ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

ফোন—৩৪-২৩৭৬